প্রবাস বন্ধু

কেসা চ্যাটার্জী (বয়স ১৩)

শারদীয়া সংখ্যা ২০২৩

১৪৩০ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : শারদীয়া সংখ্যা : 2023

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
গদ্য		
মহাযোগীর যোগসাধনা	সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	4
বিজ্ঞাপন সরণিতে সত্যজিৎ ফিরে দেখা	চিত্ত ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	6
নজরুলের অসুখ	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	20
ওয়াহ জিন্দগি	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	23
ব্যতিক্রমী	দেবব্রত তরফদার (কলকাতা, ভারত)	26
অপাহিজ	নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	31
৪৫ নং বাড়ি	প্রভাস দাস (কলকাতা, ভারত)	36
আমার দুর্গাপুজো	রূপসা সরকার (বয়স ১৩) (হিউস্টন, টেক্সাস)	37
পরী (ছোটদের শ্রুতি নাটক)	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	38
কোল্যাটারাল	বিষ্ণুপ্রিয়া (নর্থ ব্রান্সউইক্, নিউ জার্সি)	50
অসমাপ্তি	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	52
রনিকার লক্ষ্যভেদ	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	57
ইতি প্রিয়দর্শিনী	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	64
জন্মদিন	জয়শ্রী বাগচী (দিল্লী, ভারত)	69
বাংলা ভাষাটা অনেকটা ইংরেজির মতন	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	71
বড়দি	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	73
ফিশটেল বার্নার	বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	75
আশীর্বাদ	আনন্দিতা চৌধুরী (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	79
ভূমধ্যসাগরে কলকাতা	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	82
নারী ও লিপস্টিক	রিমি পতি (স্পার্টানবার্গ, সাউথ ক্যারোলাইনা)	89
লাল সর্দারের মুক্তিপণ	নূপুর রায়চৌধুরী (অ্যান আরবার, মিশিগান)	91
মায়ের কোলে প্রথম যেদিন	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	98
সম্পর্ক	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	101
দাদাভাইয়ের ভূত হওয়া	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	104
বাবার গরু	রুমকি দাশগুপ্ত (হিউস্টন, টেক্সাস)	106
বাবা, তোমার জন্য...	অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস (চ্যান্ডলার, অ্যারিজোনা)	109
N - পাঞ্চাল	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	110
প্লিজ আমাকে একটা পাপি এনে দাও	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	112
রীল কী বাত	কল্যাণী মিত্র ঘোষ (স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া)	113

ছোটদের আঁকা ছবি

প্রচ্ছদ ছবি	কেসা চ্যাটার্জী (বয়স ১৩) (ম্যারিয়েটা, জর্জিয়া)	
ছবি	রিয়া দাস (বয়স ৮) (হিউস্টন, টেক্সাস)	3
ছবি	অনাহিতা রায় (বয়স ৬) (হিউস্টন, টেক্সাস)	3
দুটি ছবি	ঈশায়ু মণ্ডল (বয়স ৬) (হিউস্টন, টেক্সাস)	37, 49
ছবি	ঋষিক গাঙ্গুলী (বয়স ৭) (হিউস্টন, টেক্সাস)	40
ছবি	শ্রেয়ান চক্রবর্তী (বয়স ৮) (হিউস্টন, টেক্সাস)	40
ছবি	রায়ান দাস (বয়স ৬) (হিউস্টন, টেক্সাস)	49
দুটি ছবি	শিরিন মিত্র (বয়স ১১) (হিউস্টন, টেক্সাস)	56, 108

কবিতা

ঈশ্বর বর্ণনা, জলকণা	শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	41
শরৎ প্রভাতে	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	42
পুনর্বাসন	অনসূয়া চন্দ্র (লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া)	42
জীবন যেমন	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	43
পাখি	অজয় সাহা (কলকাতা, ভারত)	43
নার্সিশাস	সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা,ভারত)	44
মনসঙ্গীত ১, ২	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	44, 48
অর্থ, বসে আছি	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	45
নির্যাস	সৌরভ মুখার্জী (কলকাতা,ভারত)	46
জন্মস্থান, আমি এক নগণ্য বিন্দু, চোর	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	47, 48

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

কার্তিক ১৪৩০, অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র:

কেসা চ্যাটার্জী (বয়স ১৩)

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

দুর্গাপুজো এসে গেল। মনে কেবল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান বেজে উঠছে বারবার।

"সকলকলুষতামসহর, জয় হোক তব জয় –
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিলভুবনময় –
মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম॥
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাতি –
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর' ভয়॥
মোহমলিন অতি-দুর্দিন-শঙ্কিত-চিত পান্থ
জটিল-গহন-পথসঙ্কট-সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ – দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়॥"

পৃথিবীর সংকট অবস্থায় এর থেকে প্রাসঙ্গিক প্রার্থনা আর কী হতে পারে!
সেই কবে (১৯৩১ সালে) গুরুদেব এই মিনতি জানিয়েছিলেন পরমব্রহ্মের কাছে। তখন কোন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই আকুতি ছিল জানা নেই; কিন্তু বর্তমানে আমরা এই দুঃসহ হিংসা-বৈরিতার কালিমালিপ্ত জগতে বিনম্রচিত্তে পরমব্রহ্মের কাছে আবার সেই অমৃতবারি সিঞ্চনের ভিক্ষা করি। জলবায়ু পরিবর্তনও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমস্যা।

মা দুর্গা সন্তানদের নিয়ে মর্ত্যে আসেন প্রতি বছর। আমরা মেতে উঠি উৎসবে-পূজা-আরাধনায়। মায়ের পায়ের নীচে অসুর নিধনের যে দৃশ্যটি থাকে, সেটি জগতের দুর্দশা দূরীভূত করার প্রতীক হিসাবে মানা হয়। যুদ্ধ-হানাহানিতে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত; কোথায় অসুররূপ, কোথায় নয়, সে বিচার অনাবশ্যক। ভাল-মন্দ পরস্পর বিরোধী হলেও তারা পাশাপাশিই থাকে, কিন্তু মন্দ যখন ভালকে ছাপিয়ে যেতে চায় তখনই বিপন্ন অবস্থার ছায়া ঘনিয়ে আসে। মানুষ একা একা ভাল থাকতে পারে না। সামাজিক জীব আমরা, আমাদের সমাজে সুখ-শান্তি না থাকলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তির অভাব ঘটে।
তাই জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা মন্দ-ভাল নির্বিশেষে "বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি"...

এই সংখ্যায় প্রচ্ছদ চিত্রটির শিল্পী আমার নাতনি, কেসা চ্যাটার্জী (বয়স ১৩)। অন্যান্য চিত্রশিল্পীরা অনাহিতা রায়, ঈশায়ু মণ্ডল ও রায়ান দাস (বয়স ৬), ঋষিক গাঙ্গুলী (বয়স ৭), রিয়া দাস ও শ্রেয়ান চক্রবর্তী (বয়স ৮) এবং শিরিন মিত্র (বয়স ১১)।
আছে রূপসা সরকার (বয়স ১৩)-এর বাংলা রচনা। পত্রিকায় সকল অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা রইল।
সকলকে প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে পূজা অভিনন্দন জানাই।
মালবিকা চ্যাটার্জী

{এই সংখ্যায় অনুল্লিখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে}

শিল্পী: রিয়া দাস (বয়স ৮)

শিল্পী: অনাহিতা রায় (বয়স ৬)

মহাযোগীর যোগসাধনা

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দৈত্যাকার প্রাচীর ঘেরা বন্দীশালা। লোহার শিকলের পশ্চাতে বসে আছেন এক সৌম্য মূর্তি। অটল, অচল, নেত্রদ্বয় স্থির এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা জয়ী। মুখমণ্ডলে ভয়ের লেশমাত্র নেই। মুখমন্ডলে প্রশান্তি বিরাজমান। যেন সহস্র বছর ধরে এই কারাগারে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। ব্যক্তিটির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হচ্ছে, স্বাধীনতার মন্ত্র। যে স্বাধীনতা নরপিশাচ ব্রিটিশদের করাল গ্রাস থেকেই শুধু মুক্তি নয়, এ স্বাধীনতা জীবের বোধিপ্রাপ্তের স্বাধীনতা। তাঁর দেহ শান্ত হলেও এক অদ্ভুত তেজে পূর্ণ, যে তেজে আছে ক্ষাত্র বল এবং অধ্যাত্মশক্তি। ব্যক্তিটির কারাগার যেন সাধনক্ষেত্র। ক্রমাগত এই সাধনক্ষেত্রে তিনি ভারত তথা বিশ্বের মুক্তি সাধনের প্রচেষ্টায় রত।

মহান সাধকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পুলিশের রুজু করা 'আলিপুর বোমার মামলা' চলা সত্ত্বেও তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্ধকার কারাগারে ধ্যানমগ্ন সাধক হঠাৎ শুনতে পেলেন এক কণ্ঠস্বর। না, এ কোনো সাধারণ কণ্ঠস্বর নয়, এ কণ্ঠস্বর ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বিশ্ববাসীকে মোহিত করে দেওয়া সেই কণ্ঠস্বর। সাধকের সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। ভাবতে থাকলেন কী করে সম্ভব! কারণ, সালটা তখন ১৯০৯-এর আশেপাশে। সাধকের হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হ'ল, 'সব সম্ভব'। শুরু হ'ল মহান কণ্ঠস্বরের সাথে সাধকের কথোপকথন। মহান কণ্ঠস্বরের কাছে সাধকের আরেক বিপ্লবের শিক্ষাদানের সূচনা হ'ল।

এই বিপ্লব কোনো শাসনযন্ত্রকে উচ্ছেদ করার বিপ্লব নয়, এই বিপ্লব অন্তর্জগতের বিপ্লব। যার অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে দিব্য আলোর জাগরণ ঘটানো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০২ সালে এই মহান কণ্ঠস্বরের পার্থিব দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এই শিক্ষাদান পদ্ধতি হয়েছিল সূক্ষ্ম দেহে।

বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আধ্যাত্মিক প্রেরণা' গ্রন্থে সাধকের কারাযাপন সম্পর্কে লিখছেন, "আপনি কি স্নান করার সময় মাথায় তেল দেন?" তাঁর উত্তর শুনে চমকে গেলাম। তিনি বললেন, "আমি তো স্নান করি না।" জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার চুল তবে অত চকচক করে কী করে?"... বললেন, "সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কয়েকটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আমার শরীর থেকে চুল চর্বি টেনে নেয়।"

এইভাবে সাধকের সাধনে তাঁর সহকর্মীরাও হতবাক হয়ে যান। কিন্তু তাঁরা অল্প অল্প ধারণা করতে পারেন সাধকের সাধনার।

সাধক কারাগারে থাকার সময় এক বাণী শুনতে পেলেন, "ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর।" এরপর কোর্টকক্ষ লোকে লোকারণ্য। বিচারকের আসনে বিচারপতি, অন্যদিকে সরকারী উকিল আর সাধক দাঁড়িয়ে আছেন কাঠগড়ায়। কিন্তু তিনি হঠাৎ পুনর্বার শুনতে পেলেন, "যখন তোমায় জেলখানায় আনা হ'ল, তখন ভগ্নহৃদয়ে তুমি কি বলে ওঠনি, কোথায় তোমার সুরক্ষা? এখন তাকিয়ে দেখ ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারী কৌন্সলীর দিকে।" সাধক দেখলেন ম্যাজিস্ট্রেট তথা বিচারপতির আসনে স্বয়ং নারায়ণ বিরাজ করছেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সরকারী উকিলের ওপর। তিনি চমকে উঠলেন, তাঁর মনে হতে লাগল, ইনি তো উকিল নন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। এরপর তিনি দেখলেন নারায়ণ বলছেন, "এখনও ভয় পাচ্ছ... আমার সুরক্ষা তোমাকে ঘিরে আছে, তুমি ভয় পেয়ো না।" সাধক উপলব্ধি করলেন, "বাসুদেবঃ সর্বমিতি।"

কারাগারের মধ্যেই তাঁর এই সাধনা তাঁকে সাধক থেকে মহাযোগীতে রূপান্তরিত করল। তারপরও তিনি ব্রিটিশ বিরোধী প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এরপর ১৯১০-এর ৪ঠা এপ্রিল তিনি চলে যান পন্ডিচেরির পুণ্যভূমিতে। সেখানে শুরু হ'ল মহাযোগীর সাধনার আরও একটি অধ্যায়।

পন্ডিচেরি যাত্রা প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দ নিজেই বলেছেন, "আমি পন্ডিচেরিতে এসেছি স্বাধীন, শান্তিপূর্ণভাবে এক বিশেষ বিষয়ের সমাধানের জন্য।... পন্ডিচেরি আমার নিভৃত বাসস্থান, আমার তপস্যার গুহা – সন্ন্যাসীদের গুহা নয় – এ আমার নিজের আবিষ্কৃত এক নতুন ধরনের তপোভূমি।" তাঁর এই কথাটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য হ'ল, "আমার তপস্যার গুহা – সন্ন্যাসীদের গুহা নয় – এ আমার নিজের আবিষ্কৃত এক নতুন ধরনের তপোভূমি" অর্থাৎ, তিনি প্রচলিত সাধনরত সন্ন্যাসীদের সাধনক্ষেত্র রূপে পন্ডিচেরিকে চিহ্নিত করতে চাননি; কারণ তাঁর সাধন প্রণালীর পন্থা ভিন্নতর এবং মানুষদের কাছে নতুনতর। এ সম্পর্কে কবি সুরেশ চন্দ্র লিখলেন,

"দূর-দূর-বহুদূর
উন্মাদ এ পৃথিবীর মত্ত জন-কলরোল হতে
দূর-দূর যেন বহুদূরে তার স্থিতি –
নাহি ওঠে কলরোল হেথা
সঞ্চারিয়া বিষ যত আকাশে বাতাসে
হৃদয়ের বহ্নি-দাহে দহি,
মানুষের লোভ মোহ মদ
অন্তরে তার যত অদম্য ও অজস্র লালসা
কোন মন্ত্রবলে যেন হেথা সব পড়েছে ঘুমায়ে।"

চার বছর ধরে গভীর সাধনার পর ১৯১৪ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁর জন্মদিনের দিন 'আর্য' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকায় নিজের দার্শনিক চিন্তাকে প্রবন্ধাকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করলেন। সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, 'দিব্য জীবন', 'যোগ-সমন্বয়ে', 'গীতা নিবন্ধ' প্রভৃতি। এইসব প্রবন্ধের মূল বিষয় হিসেবে তিনি উত্থাপন করেছেন, "মনুষ্যত্বের উচ্চতম অংশ সব যে পূর্ণতার দাবি তুলেছে তা লাভ করা সম্ভব একমাত্র এক দিব্য চেতনার দিকে আত্ম-উন্মোচনের দ্বারা এই আলোক ও আনন্দের সামর্থ্যের মধ্যে উঠে যাওয়া, আপন সত্য-সত্তাকে আবিষ্কার করা এবং সর্বদা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকা। মন, প্রাণ ও দেহের রূপান্তরের জন্য অতিমানস শক্তিকে এখানে নামিয়ে আনা সম্ভবপর।" এইভাবে মহাযোগী 'অতি মানস' স্তরে উন্নীত হওয়ার পথের সন্ধান করলেন এবং তিনি প্রমাণ করলেন 'অতি মানস' স্তরে পৌঁছানো সম্ভব। এই পর্যায়ে মানুষ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। পূর্বেকার সাধকগণ ব্রহ্মের সাথে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ দিয়ে গেছেন, আর মহাযোগী দেখালেন ব্রহ্মকে নিজ দেহের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। বিজ্ঞান যেখানে থেমেছে, শ্রী অরবিন্দ সেখান থেকে শুরু করেছেন। বিজ্ঞান বলে জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মনের ক্রমধারার কথা। শ্রী অরবিন্দ আরো এগিয়ে বলেছেন, মন থেকে অতিমানস বিবর্তনের কথা। এই অতিমানস চেতনা থেকে সৃষ্টি হবে অতি মানবজগত। এই অতিমানস স্তরের মূল ভিত্তি হ'ল, ভাগবত চেতনা, যা সর্বব্যাপী, ব্যাপক ও উচ্চতর।

শ্রী অরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে আলো নিয়ে আসা। পাঠকগণ! প্রশ্ন জাগছে কীসের আলো? আমরা তো আলোতেই আছি। এই আলো শান্তির আলো, এই আলো বন্ধন মুক্তির আলো। এই আলো পশু থেকে মানুষে, মানুষ থেকে অতিমানস চেতনায় রূপান্তরিত করার আলো। এ প্রসঙ্গে ১৯১১ সালের জুলাই মাসে এক চিঠিতে শ্রী অরবিন্দ লিখছেন, "আমি জড়ের স্তরে আধ্যাত্মিকতা নামিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ব্রতী আছি, আমি মানুষের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতেও সচেষ্ট, যাতে করে তার মধ্যে অন্ধকার ঘুচে যায়, পায় আলোকের সন্ধান, মন ও বুদ্ধির জগতে আনে পরিবর্তন।... আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার যোগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার ভ্রান্তি ও ব্যর্থতার মূল দূরীকরণ – ভ্রম এইজন্য অপসারিত করা প্রয়োজন যাতে আমার প্রদর্শিত সত্য হয় পূর্ণ সংসাধিত। ব্যর্থতা – তাকেও ত্যাগ করতে হবে, না হলে পৃথিবীর রূপান্তরের কাজ সম্পূর্ণরূপে সার্থক ও অপ্রতিরোধ্য করে তোলা সম্ভব নয়। এই রূপান্তরের সাধনায় আমি এ যাবৎ রত আছি – আর এই যোগের এই সকল অত্যুজ্জ্বল শক্তিশালী পরিণতি সংসাধিত হতে চলেছে। আমি এই কার্যের ভিত্তি স্থাপনায় ব্রতী, যা একাধারে কঠিন ও কষ্টসাধ্য। যে নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ ভিত্তি স্থাপনা করা হয়েছে, এখন তারই উপর শুরু হয়েছে সৌধ নির্মাণের কর্মধারা।" তিনি এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সহজ সরলভাবে তাঁর যোগের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন।

শ্রী অরবিন্দের পন্ডিচেরি জীবন পূর্বেকার বিপ্লবী জীবনের কার্য থেকে ভিন্নতর ছিল না, শুধুমাত্র কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই শ্রী অরবিন্দের সমালোচকরা বিপ্লববাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার যে তত্ত্ব তুলে ধরেন, তা ভ্রান্তিকর। পরবর্তীকালে তিনি 'সাবিত্রী'তে লিখেছেন,

"Escape, however high, redeems not life,
Life that is left behind on a fallen earth.
Escape cannot uplift the abandoned race
Or bring to it victory and the reign of God.
A greater power must come, a larger light."

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর রাত ১টা ২৬ মিনিটে মহাযোগী পন্ডিচেরির সমুদ্র ঘেরা বৃক্ষরাজির পদতলে দেহ রাখলেন।

মহাযোগীর উদ্দেশ্যে রবিঠাকুর লিখেছিলেন,

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণী মূর্ত্তি তুমি।"

****

তথ্যসূত্র:-

১) শ্রী অরবিন্দ চিন্তন – সুমন ভৌমিক (সংকলন)
২) কারাকাহিনী – শ্রী অরবিন্দ
৩) শ্রী অরবিন্দ জীবন ও যোগ – প্রমোদকুমার সেন
৪) সর্বকালের সার্বজনীন শ্রী অরবিন্দ – নীরদ বরণ
৫) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আধ্যাত্মিক প্রেরণা – উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

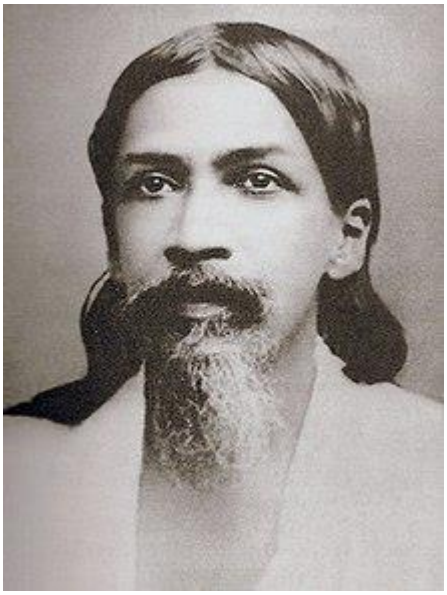

শ্রী অরবিন্দ ঘোষ

জন্ম: ১৫ই অগাস্ট, ১৮৭২

মহাপ্রয়াণ: ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০ (বয়স ৭৮)

বিজ্ঞাপন সরণিতে সত্যজিৎ ফিরে দেখা

চিত্ত ঘোষ

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যে অতিবরেণ্য সত্যজিৎ জীবনে একবার চাকরি করেছিলেন। তাও নেহাত খুব কম সময়ের জন্য নয়; নয় নয় করে চোদ্দ বছর। সত্যজিতের নাড়িনক্ষত্র জানা বৃত্তের বাইরে থাকা অনুগামীদের জন্য তথ্যটি একবার উল্লেখ করে প্রায় অনালোচিত এক ইতিহাসের পথে ঘুরে আসা যাক।

তাঁর চাকরিটি ছিল এক বিজ্ঞাপন সংস্থায়, শিল্প নির্দেশকের। সংস্থার নাম ডি জে কীমার। চাকরি জীবন ১৯৪৩-১৯৫৬, নিরবচ্ছিন্ন ১৪ বছরের। ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মুদ্রণশিল্পে আধুনিকতার ভগীরথ 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স', বাবা সুকুমারের অকাল মৃত্যুর পর কাকা সুবিনয়ের দিশাহীন পরিচালনায় ঋণে ডুবে বন্ধ হয়ে যায়। সাল ১৯২৫, সত্যজিৎ তখন বছর চারেকের শিশু। কয়েক মাস পর আর্থিক অসহায়তা মা সুপ্রভাকে বাধ্য করে সদ্য শৈশব উত্তীর্ণ পুত্রকে নিয়ে মধ্য কলকাতার ভবানীপুরে এক দাদার বাড়িতে শরণার্থী হয়ে উঠে আসতে। প্রখর আত্মমর্যাদায় দীপ্ত ও শান্ত প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের সুকুমারজায়া চাকরি নেন রাজাবাজারে লেডি অবলা বসু পরিচালিত মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সম্বলহীন বিধবা নারীদের স্বাবলম্বী করার দায়িত্ব ভাগ করে নেন। মায়ের এই দৈনন্দিন সংগ্রাম সত্যজিৎকে আলোড়িত করেছিল। বালক মন চেয়েছিল তাড়াতাড়ি সাবালক হয়ে একটি চাকরি জুটিয়ে মাকে নিয়ে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে; শিল্পী-লেখক-চলচ্চিত্রকার হবার ভাবনা তাঁর দূরতম কল্পনাতেও ছিল না। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল শেষ করে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। পিতৃবন্ধু কিংবদন্তি রাশিবিজ্ঞানী প্রশান্ত মহালনবীশের পরামর্শে বিজ্ঞান ছেড়ে অর্থনীতির পাঠ শুরু। খুব পছন্দের বিষয় ছিল না; স্নাতক হলেই তহবিল সামলানোর চাকরি মিলবে এই আশ্বাসেই পড়া। প্রেসিডেন্সির প্রবাদপ্রতিম জলহাওয়ায় প্রণোদিত হলেন ভিনদেশী হলিউড ছবি ও ইউরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের আঁচ নিতে। অবচেতনে এক আলোকদীপ্ত উত্তরাধিকারের প্রভাব এই দুই কলা ও কলা সম্পর্কিত তত্ত্ব সাহিত্যকে করে তুলল তাঁর

বৌদ্ধিক আসক্তির রসদ | সাহিত্যপাঠ থেকেও দূরে ছিলেন না, যদিও মূলত বিদেশী | যথাসময়ে স্নাতক হলেন | জন লেনন নামের জনৈক তুফানী সঙ্গীত প্রতিভার চার দশক পরে তাঁর লেখা ও গাওয়া 'ডার্লিং বয়' গানে ১৯৫৭ সালে রিডার্স ডাইজেস্ট ম্যাগাজিনে আমেরিকান লেখক কার্টুনিস্ট অ্যালেন স্যান্ডার্সের একটি প্রবন্ধের লাইন, 'লাইফ ইজ হোয়াট হ্যাপেনস টু আস হোয়াইল উই আর মেকিং আদার প্ল্যানস'কে যৎসামান্য বদলে যেমনটি টুকে দিয়েছিলেন, হুবহু তারই পূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে বাঁক নিল সত্যজিতের পরবর্তী গতিপথ |

ঊনআশি ছোঁয়া রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে তাঁর প্রিয় সুকুমারের মনোবাসনা জেনে সুপ্রভাকে বার্তা পাঠালেন সত্যজিৎকে শান্তিনিকেতনে পাঠানোর জন্য | সুকুমারের আত্মা নাকি কবির প্ল্যানচেট টেবিলে রাখা কাগজে লিখেছিলেন "মাণিককে আপনার কাছে নিয়ে আসুন"| প্ল্যানচেট হোক বা এক অবিনাশী প্রতিভার অধীশ্বরের আকস্মিক খেয়ালই হোক, সুপ্রভার কাছে এই ডাক ছিল অপ্রত্যাশিত এক উপহারের মতো; ছেলে প্রথমে অরাজী হলেও মায়ের জেদের কাছে হার মানলেন | শুধু শর্ত দিলেন তিনি তালিম নেবেন শিল্পকলার | পরের আড়াই বছর তাঁর ঠিকানা হ'ল শান্তিনিকেতনের কলাভবন | আবার বোধহয় সেই উত্তরাধিকারের প্রণোদনা | শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নীরব প্রশ্রয়ে নাড়া বাঁধলেন বিনোদবিহারীর কাছে | পেলেন পৃথ্বীশ নিয়োগী, দিনকর কৌশিক, মুখুস্বামীর মতো সহপাঠী | এঁদের নিয়ে নন্দলাল বসুর ব্যবস্থাপনায় গেলেন অজন্তা ইলোরা ও কোনার্ক সফরে এবং এই সুযোগে বন্ধু পৃথ্বীশের সাথে আড্ডা আলোচনায় বুঝে নিলেন প্রাচ্য ও ভারতীয় শিল্পকলার অনুপুঙ্খ | পশ্চিমী সংস্কৃতিমনস্ক সত্যজিতের কাছে এ ছিল এক উজ্জ্বল উদ্ধার | এই পর্বে আরও যে দুটি প্রাপ্তির কথা তিনি বলে গেছেন তার একটি হ'ল বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে দুই ইংরেজ চলচিত্র পরিচালক ও তাত্ত্বিক পল রোথার 'ফিল্ম টিল নাও' ও রেমন্ড স্পটিশউডের 'গ্রামার অফ দ্য ফিল্ম – অ্যান অ্যানালেসিস অফ ফিল্ম টেকনিক' বইদুটিকে আত্মস্থ করা এবং অন্যটি ইংরেজি সাহিত্যের জার্মান ইহুদি অধ্যাপক অ্যালেক্স অ্যারোনসনের সঙ্গলাভ | অ্যারোনসন পরে অবিচলিত নিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রথম সংরক্ষণাগার তৈরী করেছিলেন | তিনি চমৎকার পিয়ানো বাজিয়ে সত্যজিতের সাথে মোর্জাট, বাখ, বেটোভেনসহ পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওস্তাদদের কাজ নিয়ে আড্ডা দিতেন | কিন্তু এখানেই রয়ে যায় একটি বেশ অবাক করা ধাঁধা | যে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উঠে আসা নানা উদ্যোগপতিদের তৈরী পণ্যের জন্য একনাগাড়ে বিজ্ঞাপনের মূল লেখক হয়ে থেকেছিলেন দীর্ঘদিন, নিজের কয়েকটি গল্প উপন্যাসেও বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বুঝিয়েছিলেন যে তিনি বিষয়টি নিয়ে নিরুৎসাহী নন, সেই তিনি তাঁর বিশ্বভারতীতে এই বিষয়ে চর্চার কোন ব্যবস্থা রাখেননি, এমনকি কোন প্রতীকী উপস্থিতিও নয়! তাহলে কি সম্ভব যে বিশ্বপর্যটক এই অসামান্য প্রতিভার প্রায় সর্বব্যাপী কৌতূহল সীমার বাইরে থেকে গিয়েছিল পাশ্চাত্য, বিশেষত আমেরিকা ও ব্রিটিশ বিজ্ঞাপনের তুমুল উত্থান! আপাতভাবে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই ঘটেছিল |

১৯৪২ সালের শেষদিকে কলাভবনে শিক্ষাক্রমের আড়াই বছরের মাথায় সত্যজিৎ মাকে চিঠি লিখে জানালেন যে তাঁর যতটুকু শেখার ছিল তা হয়ে গিয়েছে, তিনি এবার কলকাতায় ফিরতে চান | ইতিমধ্যে 'দিবসের শেষ সূর্য'-র কাছে জীবনের 'শেষ প্রশ্ন' রেখে রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' ও 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'র ত্রিফলা চাপে ক্রমশ আলগা হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের ভিত | সুপ্রভা দেবী আপত্তি করলেন না | সত্যজিৎ আবার চাকরি সন্ধানী | তিনি ইত্যবসরে জেনেছেন যে বিজ্ঞাপন সংস্থায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আঁকিয়েদের চাকরি ও সমাদর আছে | অচিরেই সুযোগ এল | ইংরেজি 'দ্য স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে চোখে পড়ল ব্রিটিশ মালিকানাধীন নামী বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কীমারের বিজ্ঞাপন – চাইছে জুনিয়র ভিস্যুয়ালাইজার | আবেদন করে ডাকও এল | সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলা হ'ল একটি কল্পিত সুগন্ধী পণ্যের উপর বিজ্ঞাপনের খসড়া নকসা করে আনতে | নিহিত প্রতিভাবলে নির্ভুল অনুমানে স্থির করে নিলেন তাঁর কাছে যা চাওয়া হয়েছে তিনি পেশ করবেন তার থেকে কিছু বেশী | করলেনও তাই | সংস্থার দুই বরিষ্ঠ কর্তা, যথাক্রমে প্রধান শিল্প নির্দেশক অন্নদা মুন্সী এবং ডি কে গুপ্ত, যাঁরা পরবর্তীকালে নিজেরাই কিংবদন্তি, সত্যজিতের পেশ করা পণ্যের নাম ও লোগোসহ ছ'টি লেআউট, হ্যান্ডবিল ও পোস্টারে নিশ্চয় খুঁজে পেয়েছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যাম্পেন থট | তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেননি |

সালটা ১৯৪৩ | সত্যজিৎ এখানে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নেবেন ১৯৫৬-য় 'পথের পাঁচালী' নামক একটি চিরস্থায়ী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে | সে আরেক ইতিহাস, যা নিয়ে চর্চা অব্যাহত; বরং ফিরে দেখা যাক বিজ্ঞাপনে তাঁর যোগদান নেহাতই চাকরির তাগিদে না মানসিক প্রস্তুতিসহ এক সচেতন সিদ্ধান্ত | 'মাই ইয়ার্স উইথ অপু' নামের আংশিক আত্মজীবনীতে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন দ্বিতীয়টির | তিনি লিখছেন, "আমি তখন খবর-কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতাম | কিছু বিজ্ঞাপনের দৃশ্যবিন্যাসে এক ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করতাম, কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম কাজগুলো কোন এক বিশেষ বিজ্ঞাপন সংস্থার তৈরী |"

এটুকুতেই কি সীমিত ছিল তাঁর প্রস্তুতিপর্ব! যে সত্যজিতের জ্ঞানক্ষুধা ছিল তাঁরই কল্পিত চরিত্র সেপ্টোপাসের ক্ষিধেরও হাজারগুণ বেশী, তিনি এই সামান্য প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন? এই জিজ্ঞাসার কোন প্রামাণ্য উত্তর নেই | তাঁর নিজের লেখায়, দেশবিদেশের নামী জীবনীকারদের দেওয়া বৃত্তান্তে ও অসংখ্য সাক্ষাৎকারে বিষয়টি অবহেলিত থেকে গেছে | কিন্তু জ্ঞানান্বেষণে যে সত্যজিৎ অক্লান্ত এবং দ্বারখোলা পশ্চিমের আনা উপহারগুলো থেকে বেছে নিচ্ছেন শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, সঙ্গীত ও বিজ্ঞান তিনি বিজ্ঞাপনকে ব্রাত্য করে রাখবেন, এই ভাবনাটাই ঠোক্কর খায় | ঠোক্কর খায় প্রথমত তিনি সত্যজিৎ বলে এবং দ্বিতীয়ত আধুনিক বিজ্ঞাপনের উৎসভূমি আমেরিকা নিয়ে তাঁর আগ্রহের আধিক্য ছিল বলে | ভারতবর্ষ ও বাংলায় বিজ্ঞাপনের উন্মেষের দশকগুলিতে পেশাদারী চিহ্ন না থাকলেও ৫০-তারাওয়ালা পতাকার দেশে বাণিজ্যিক জনসংযোগের এই শাখাটি বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর এবং তা পেশাদারী সত্ত্বগুণসহ |

১৯০১ সালে নিজের নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন সংস্থার সৃষ্টিকর্তা জে ওয়াল্টার টমসন প্রকাশ করেছিলেন বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রাগ্রসর পেশাদারী ভাবনাসমৃদ্ধ দু'খন্ডের বই – 'দ্য রেড বুক অন অ্যাডভার্টাইজিং' ও 'দ্য ব্লু বুক অন অ্যাডভার্টাইজিং'-এ | বিজ্ঞাপনের দায়দায়িত্ব ও লক্ষ্য নিয়ে অত্যন্ত সুচিন্তিত ডিসকোর্স হয়ে উঠেছিল প্রথম দুই দশকের বিজ্ঞাপনের পথনির্দেশক | তিনিই সর্বপ্রথম পণ্য বা সংস্থার ট্রেডমার্কের ব্যবহার বিজ্ঞাপনে অপরিহার্য করলেন | ব্রিটিশ সাহেব টমাস ব্যারেট অবশ্য তার আগেই পিয়ার্স সাবানের বিজ্ঞাপনে নতুন যুগ এনে দিয়েছেন, যা শুধু 'গুড মর্নিং! হ্যাভ ইউ ইউজড পিয়ার্স টুডে'-তে থেমে নেই | লন্ডনের এক জনপ্রিয় হোটেল-গায়িকা লিলি ল্যাংট্রিকে নিয়ে 'সেলেব্রিটি এনডোর্সমেন্ট'-এর আদিরূপ দেওয়া ছাড়াও বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও উচ্চকোটির গ্ল্যামার জগতের বাসিন্দাদের দিয়ে পিয়ার্স সাবানের প্রশংসা প্রকাশ, ইলাস্ট্রেশন ও রঙিন হস্তচিত্র নিয়ে প্রতি বছর পিয়ার্স অ্যানুয়াল করা এবং 'পিয়ার্স এনসাইক্লোপিডিয়া' নামে পুস্তক তৈরী করা ইত্যাদিতে প্রসারিত করে গেছেন |

'লোগো' শব্দটি তখনও আগামীর গর্ভে অপেক্ষারত | কিছু বছর পরে ১৯১৪-য় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত যখন মার্কিন অর্থনীতিতে ৪৪ মাসব্যাপী বৃদ্ধির জোয়ার এনেছিল, তখন সেই সঙ্গে বেড়েছিল প্রতিযোগিতা | নতুন আবহে বিজ্ঞাপনকে আরো প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর করে তুলতে টমসনের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক থেকে সূত্রপাত হ'ল ক্রেতা মনস্তত্ত্বচর্চা, যা ক্রমশ বাজার সমীক্ষায় সর্বত্রগামী বিজ্ঞাপন সংস্কৃতিতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে | তাঁর এই উদ্ভাবন ছিল অপ্রত্যক্ষ বা সফট সেলিং বিজ্ঞাপনপন্থা | যুদ্ধোত্তর অর্থনীতিতে হ'ল উলট পুরাণ | এল মন্দা, তবে তীব্রতার রকমফের নিয়ে | পাশাপাশি কুড়ির দশকেই মুক্ত বাণিজ্যের মক্কাতে রেডিওর আবিষ্কার সংবাদপত্র নির্ভর মিডিয়া জগৎকে বাড়তি অক্সিজেন দিল এবং তার সংযোগ সীমার ভূগোলকে এক ধাক্কায় অনেকটাই প্রসারিত করে দিল | এর ফলে মিডিয়ার ভূমিকা হয়ে উঠল সেই সময়ে বিজ্ঞাপনের বাঁক বদলের অনুঘটক | বিজ্ঞাপনের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক চেহারা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে শুরু করল | প্রকাশ পেল আধুনিক ব্র্যান্ড কম্যুনিকেশনের আদি রূপ | আমেরিকান বিজ্ঞাপন লেখক জন কেনেডি (জন এফ কেনেডি নন) অ্যালবার্ট ল্যাস্কর নামক এক বিজ্ঞাপনকর্তার সাথে আড্ডা দিতে দিতে তাঁদের কাজের মূল উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে ব্র্যান্ড-কম অভিধাটিকে পাত্তা না দিয়ে নিদান দিলেন, "অ্যাডভার্টাইজিং ইজ সেলসম্যানশিপ ইন প্রিন্ট"| পরে পঞ্চাশ দশকের শেষে ম্যাকগিল প্রকাশনী তাদের ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপনে এই নিদান নির্ভুলভাবে ব্যবহার করেছিল প্রিন্ট বিজ্ঞাপনের প্রভাব সৃষ্টিকারী ক্ষমতা প্রচারের কাজে | সংজ্ঞাটি আসলে বিজ্ঞাপনকে হার্ড সেলিং বা প্রত্যক্ষ বিপণনমুখী করার জন্যই বাক্যবন্দী করা | ওয়াল্টার টমসনের সমীক্ষাতত্ত্ব এই

ভাবনাকে যেমন একদিকে শক্তি জোগাল, তেমনি অন্যদিকে কুড়ির দশকে অঙ্কুরিত সৃজনশীল বিজ্ঞাপনে নতুন ঘরানার সঙ্গে শুরু করল এমন এক দ্বৈরথ যা এখনও বিদ্যমান; যদিও ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসার এই দ্বৈরথকে খানিকটা হলেও স্তিমিত করেছে। অনেক ইতিহাসবেত্তার মতে গত শতাব্দীর বিশের দশক আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞাপনের স্বর্ণযুগ। ব্রিটিশ বিজ্ঞাপনও এই সময় আমেরিকান 'ট্রেন্ড'কে প্রতিহত করতে গিয়ে জাতে ওঠে। আমেরিকান সরকারের কমার্স সেক্রেটারি হার্বার্ট হুভার ১৯২৫-এ অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাব অফ ওয়ার্ল্ডের সভায় কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে বলে দিলেন, "অ্যাডভার্টাইজিং ইজ এ ভাইটাল ফোর্স ইন আওয়ার ইকনমি"। ১৯২৯-এ এই ভাষ্যকে আরও উচ্চগ্রামে তুলে আমেরিকান ব্যুরো, ফরেন অ্যান্ড ডোমেস্টিক কমার্সের প্রধান জুলিয়াস ক্লেইন বললেন, "বিজ্ঞাপন হ'ল বিশ্ব-সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি"। বিজ্ঞাপন নিয়ে উদ্দীপনার কারণও ছিল। মুনাফাবাদী পুঁজিবাদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক-শক্তি হয়েও বিজ্ঞাপন ততদিনে একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক আত্মীকরণের আধার এবং বাহক হয়ে উঠেছে। সুনিপুণ ক্ষিপ্রতায় নগরপ্রধান আমেরিকার সমাজজীবনের এমন এক ভোগবাদী কাঠামো গড়ে উঠতে শুরু করল যার খাঁচায় নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে দিতে ঢুকে পড়ল বিপুল অভিবাসী মানুষজন। আবার এই বিজ্ঞাপনই নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করল। পেশা হিসাবে এটি তাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। পাশাপাশি তৈরী হ'ল আর একটি সম্ভাবনার চিত্রপট। এখানে যেহেতু মেধা, সৃজন ক্ষমতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা এবং অতি অবশ্যই ভাষাজ্ঞান যোগ্যতার মাপকাঠি, সেই কারণে জাত, ধর্ম, গাত্রবর্ণ প্রভৃতি বিভেদমূলক ঝোঁক ও সংস্কারগুলো বাতিল হ'ল। সিনেক্রটিক বা সমন্বয়ী আবহের আদর্শ কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল বিজ্ঞাপন।

এর পরেই এহেন স্বর্ণযুগের কাঞ্চনপ্রভাকে ম্লান করে নামবে এক অদ্ভুত আঁধার। সে আলোচনায় যাবার আগে এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক সেই সময়ের এই দেশ, বলা ভাল এই প্রদেশকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে ধীর লয়ে গড়িয়ে চলা দেশীয় বাণিজ্যের পালে জোরালো হাওয়া এনে দেয় বিংশ শতাব্দীর স্বদেশী আন্দোলন। মোহনবাগানের আই এফ এ শিল্ড জয় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকাও এক্ষত্রে অনস্বীকার্য। নব্য দেশী বাণিজ্য সংস্থা ও তাদের উৎপাদিত পণ্য তালিকা চাহিদা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে দীর্ঘতর হ'ল। ১৮৭৮ সালে চন্দ্রকান্ত সেন প্রতিষ্ঠিত সি কে সেনের জবাকুসুম থেকে এম এল বোসের কুন্তলীন, আচার্য পি সি রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যালসের কালো ফিনাইল, অ্যাকোয়াটাইকোটিস, ক্যান্থারাইডিনসহ একগুচ্ছ অত্যন্ত উঁচু মানের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য, বেঙ্গল এনামেল, বেঙ্গল পটারি, সুলেখা কালি, লক্ষ্মী ঘি, লক্ষ্মী চা, গোদরেজ, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, আকজা রুহ্ শরবৎ, মাইসোর স্যান্ডেল সাবান দেশের বাজারে সৃষ্টি করল তাদের দৃশ্যমান উপস্থিতি। সাহেবী সংস্থা আই টি সি, স্পেনসার্স, আর্ম অ্যান্ড নেভি ও হোয়াইট অ্যান্ড ল্যাডলেদের সাথে সহাবস্থান করে তাদের অনেকেই বাংলার বাইরে বাজার তৈরী করে যাচ্ছিল। চতুর ইংরেজদের বিনা বাধায় স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের প্রয়াস জোর কদমে বিস্তার পেল দেশের পশ্চিম উপকূল ও দক্ষিণ ভারতেও। বাণিজ্যের নিজস্ব চাহিদায় প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে বিজ্ঞাপন। ১৯০৫ সালে দেশীয় মালিকানাধীন প্রথম অ্যাড এজেন্সি স্থাপিত হয় তখনকার বম্বে শহরে, 'বি দত্তারাম অ্যান্ড কম্পানি'। দু'বছর পর ১৯০৭ সালে গঠিত হ'ল ইন্ডিয়া অ্যাডভার্টাইজিং এবং ১৯০৯-এ ক্যালকাটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি। বর্ধিষ্ণু সাহেবী এজেন্সিগুলোর মধ্যে ছিল অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাসোসিয়েটস, পাবলিসিটি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, এল এ স্ট্রোনাক ইত্যাদি। প্রিন্টিং বা মুদ্রণ শিল্পে ততদিনে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন ব্লকমেকিং ও হাফ টোন প্রসেসিংয়ের পথিকৃৎ সত্যজিতের পিতামহ শিশুসাহিত্যিক ও প্রযুক্তিবিদ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যিনি তাঁর সংস্থার জন্য উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯০৭ সাল নাগাদ কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় বসালেন দেশের প্রথম লাইনোটাইপ মেসিন। ১৯১২-য় সি কে সেনের জন্য প্রথম বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের উপেক্ষিত প্রথম পুরুষ হীরালাল সেন। তখন এজেন্সিদের কাজ সীমিত ছিল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে কাগজের স্পেস বিক্রি ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা। তাদের সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা। কুড়ির দশকে ১৯২৪-এ আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাখনলাল সেনের উদ্যোগে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণিলাল সেন সুরেন্দ্রনাথ বোসের

ডাকব্যাক, কে সি দাস, বি এন মৈত্র আর এন সেন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গো সাবান ও এন সি দত্তের কুমিল্লা ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব নিয়ে শুরু করেন ন্যাশনাল অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি | বিশ দশকের শেষের দিকে ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত এজেন্সি এস এইচ বেনসন তাদের ভারতীয় সংস্করণ ডি জে কীমারকে প্রতিষ্ঠা করে | এই সেই বেনসন যারা এক তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কসম্পন্ন চিন্তকের নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিজ্ঞাপনে আমেরিকানাইজেশনের আগ্রাসী প্রভাবকে রুখে দিয়েছিল; অন্তত বেশ কয়েকটি বছর | মস্তিষ্কটির মালিক ছিলেন রবার্ট ওরফে ববি বেভান, যাঁকে অকুণ্ঠ কুর্নিশ জানিয়েছিলেন তাঁর একলব্য শিষ্য ডেভিড ওগিলভি স্বয়ং | বেভান ছিলেন গীনিজ, বোভরিল, জনি ওয়াকার, মাস্টার্ড ইত্যাদির অবিস্মরণীয় বিজ্ঞাপনগুলির একমেবাদ্বিতীয়ম স্রষ্টা | ডি ক্লমফিল্ড ওঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ব্রিটিশ বিজ্ঞাপনের সেরা যুগের ব্যক্তিরূপ"| বেভানের অমর কীর্তিগুলির একটি নমুনা ছিল, 'গীনিজ ইজ গুড ফর ইউ'| ভারতীয় বিজ্ঞাপনের নাবালকত্বের কালে কীমার তার ডিএনএ বাহিত এই স্বরকে প্রয়োগ করতে সময় নিয়েছিল সত্যজিতের আবির্ভাব পর্যন্ত | সে সময় প্রিন্ট মিডিয়া ভিত্তিক যাবতীয় বিজ্ঞাপনের টিজি বা টার্গেট গ্রুপ নির্ধারিত হতো ক্রেতাদের আর্থ সামাজিক স্তর বুঝে| তাও তাদের দুটি বন্ধনিতে রাখা হতো | একদিকে সংখ্যালঘু সাহেব-মেম সম্প্রদায়, অন্যদিকে মেকলে শিক্ষানীতিজাত দেশী শিক্ষক, সরকারী চাকুরে, সওদাগরী অফিসের কর্মীকুল, আইনজীবী-মুন্সেফ, স্বদেশী মন্ত্রে উদীপ্ত অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষজন ও তাদের সাথে কবি, লেখক, সাংবাদিক, চিকিৎসকরা | প্রথমোক্ত টিজির জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন স্পেনসার্স, হোয়াইট অ্যান্ড ল্যাডলে, আর্মি অ্যান্ড নেভি, হরলিক্স ও আই টি সি ইত্যাদি | ভাষা যথারীতি ইংরেজি; মাধ্যম ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থক ইংরেজি সংবাদপত্র | দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তরা ছিলেন স্বদেশী উদ্যোগ-পতিদের উৎপাদিত পণ্যের উপভোক্তা, এবং এই শ্রেণীর অনেকেই ইংরেজিতে পারদর্শী হলেও স্বজাত্যাভিমানে বাংলা সংবাদপত্র ও পত্রিকার পাঠক | বাংলা পঞ্জিকাও ছিল এই তালিকায় | অন্য প্রদেশেও এ মানসিকতার ব্যত্যয় ছিল না | সম্ভবত এহেন প্রশ্রয়ের বাতাবরণে দেশীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন নিয়ে পণ্যনির্মাতারা এক সহজ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন – হয় নিজেরাই চিন্তাভাবনা করে একটা বক্তব্য খাড়া করতেন অথবা রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, শিবরাম চক্রবর্তীদের মতো স্বনামখ্যাতদের দিয়ে পণ্যের গুণগান দু'চার শব্দ থেকে দু'পাঁচ লাইনে লিখিয়ে চেনাশোনা শিল্পীদের ধরে বিজ্ঞাপনের খাঁচা তৈরী করে এজেন্সির মারফত ছাপাতেন | তাঁদের এই প্রয়াসগুলিতে নোবেল মালিক কবির চাহিদা ছিল তুঙ্গস্পর্শী | সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ আশিটির মতো বিজ্ঞাপনের জন্য কলম চালিয়েছেন বা মন্তব্য রেখেছেন | সংখ্যার এই বিপুলত্বের কারণ ছিল বিশ্বভারতী বিদ্যাশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহের তাগিদ; বলেও গেছেন সে কথা | রেট্রো নস্ট্যালজিয়ার চশমা খুলে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও বিজ্ঞাপনগুলি শ্রীহীন বা নান্দনিক বৈশিষ্ট্যহীন ছিল | ছন্দমেলানো কুন্তলীন বা সুখী গৃহকোণের গ্রামোফোনের লাইনগুলো লোকমুখে ফিরলেও তাদের বিজ্ঞাপনের নান্দনিক কৌলীন্য সমকালীন পাশ্চাত্য চিত্রের তুলনায় ফিকে | এটা ভাবার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই যে এক দশক পরে নব্য যুবক সত্যজিৎ দেশজ বিজ্ঞাপনের এই চেহারা ফিরে দেখার জন্য অনাগ্রহী ছিলেন এবং এটাও ভাবতে আটকায় না যে সেই সময়ের এই প্রচারশিল্প নিয়ে তিনি মূল্যায়ন করে থাকলেও তা ছিল রেটিং-এ শূন্য; ঠিক যেমন তিনি তাঁর মত পোষণ করতেন সমসাময়িক ভারতীয় সিনেমাশিল্প নিয়ে |

এল ৩০ দশক | তখন বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা ও জার্মানিতে হিটলার – এই দুই মহাত্রাস জাঁকিয়ে রাজত্ব চালু করার আগে জে ওয়াল্টার টমসন তাদের ভারত পর্ব শুরু করল ১৯৩১-এ; কলকাতায় | ওদিকে শুরু হ'ল আগুনে সমালোচনার তপ্ত কড়াইয়ে বিজ্ঞাপনকে সাড়ে বত্রিশ ভাজা করার কাজ | ভোগবাদের খুল্লমখুল্লা টেম্পপ্লেট বলে দেগে দিয়ে যখন এই কলাকে আঁস্তাকুড়ে প্রায় ফেলে দেওয়ার উপক্রম, তখন বিরুদ্ধস্রোতে সাঁতার কেটে উঠে এলেন রেমন্ড রুবিকাম | তটভূমি যথারীতি শ্যামচাচার দেশ | উচ্চকিত হার্ডসেলিং বা সরাসরি 'কেন কিনবেন' ভাবনা থেকে বিজ্ঞাপনকে সরিয়ে নিয়ে অপ্রত্যক্ষ চালে বিজ্ঞাপন পাঠক ও ক্রেতার হৃদমাঝারে নিহিত সূক্ষ্ম রুচি ও আবেগকে প্রভাবিত করার পথ ধরলেন তিনি | তাঁর প্রতিভার ঝাঁকুনিতে বিজ্ঞাপন ঘুরে দাঁড়াল এবং দেখাল 'এভাবেও ফিরে আসা যায়'| এই ঐতিহাসিক বাঁক বুঝতে দুটি

অব্যর্থ দৃষ্টান্ত হ'ল পটাশিয়ামের জন্য মি. কফি নার্ভস ও গ্রেপ নাটসের জন্য লিটল অ্যালাবাই – পৃথিবীর সর্বপ্রথম কমিক স্ট্রিপে তৈরী বিজ্ঞাপন, উডবেরি ফেসিয়াল সোপের জন্য 'এ স্কিন ইউ লাভ টু টাচ' বা স্টেনওয়ে পিয়ানোর জন্য 'দ্য ইন্সট্রুমেন্ট অফ দ্য ইমমর্টাল' ইত্যাদি কাজের চিরস্থায়ী মোহজাল | অসাধারণ লেখক রুবিকাম বিজ্ঞাপনকে পাঠকের মনের দর্পণ করার প্রথম চিন্তক ও ঘোষক | আমেরিকান বিজ্ঞাপন নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষার এই বহতা ধারায় আরও একজন কাল্ট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয় সেই সময় | নাটকীয় বাস্তবতাবাদ দিয়ে সফট সেলিং পদ্ধতিকে তীক্ষ্ণতর করে তোলার কারিগর লিও বার্নেট | ১৯৪১ সাল বিজ্ঞাপনের আরো একটি জলবিভাজিকা – বিশ্বে প্রথম টেলিভিশনে প্রচারের জন্য তৈরী হয় মাত্র ৯ সেকেন্ডের বুলোভা ঘড়ির বিজ্ঞাপন ফিল্ম – পাঁচ শব্দের 'আমেরিকা রানস অন বুলোভা ওয়াচ' ভয়েস ওভারসহ | সেই বছরে এ দেশে জে ডক্লু টির কীর্তি হিন্দীছবির অভিনেত্রী লীলা চিটনিসকে নিয়ে 'চিত্রতারকাদের সাবান', লাক্সের চমক জাগানো পজিশনিং | সূচনা হ'ল সেলিব্রিটিদের নিয়ে বিজ্ঞাপনের নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করা লম্বা দৌড় |

বলিষ্ঠ মেধা ও প্রত্যয়ী প্রতিভাবানদের নেতৃত্বে দশক থেকে দশকে ক্রমশ বাঁক নিয়ে চলা বিজ্ঞাপন সরণিতে সত্যজিৎ পা রাখছেন ন্যূনতম সচেতনচর্চা ছাড়াই, এ ধারণা পোক্ত হতে পারে না ডি জে কীমারের স্টুডিওতে তাঁর কাজগুলির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য, যাতে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল আধুনিকতার যুগচিহ্ন | বলাই বাহুল্য এক ও অদ্বিতীয় অন্নদা মুন্সীর বিদগ্ধ সঙ্গ ও পেশাদারী অভিভাবকত্ব তাঁকে নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করেছিল, মূলধন জুগিয়েছিল তাঁর টেকনিক বা প্রকরণ শৈলীকে স্বতন্ত্র করে তুলতে এবং বিজ্ঞাপনের বিবর্তনশীল পশ্চিমী ঘরানায় স্থিত মূল ভাবনাগুলির নির্যাস বুঝে নিতে | এই পেশার অন্দরমহলের খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা জানেন বিরলতম কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কোন বিজ্ঞাপনই কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয় | এটি হ'ল মক্কেল সংযোগের কার্যনির্বাহী, কপি লেখক, শিল্প নির্দেশক, ভিস্যুয়ালাইজার-ইলাস্ট্রেটর, ফিনিশিং আর্টিস্ট প্রভৃতিদের সম্মিলিত এক অর্কেস্ট্রা; অন্তত পেশাদারী শুরুয়াত থেকে সাম্প্রতিক ডিজিটাল যুগ উদয়ের আগে পর্যন্ত তেমনই ছিল | চল্লিশ দশকে অবশ্য কপি লেখকদের পদটা এদেশে ছিল না | ভাল ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন কার্যনির্বাহীরা হয় নিজেরা বা মক্কেলদের সঙ্গে যৌথভাবে লেখার কাজটি করতেন |

সত্যজিতের ভাষাজ্ঞান, বিশেষ করে ইংরেজিতে ছিল উঁচু মানের | এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সময়ে দ্য স্টেটসম্যানে চলচ্চিত্র নিয়ে তাঁর লেখায় | সুতরাং কিছু বিজ্ঞাপনের কপি লেখার কাজটি নিজের ভিস্যুয়াল ভাবনার সাথে তাল মিলিয়ে লিখে থাকতেও পারেন | কীমারে তখন মক্কেলের প্রাচুর্য – আই সি আই, ফিলিপস, লিপটন, টি বোর্ড, আই টি সি, ডানলপ, সি কে সেন, বাটা ইত্যাদি | স্টুডিওতে সত্যজিৎ ছাড়াও ছিলেন ও সি গাঙ্গুলী, মাখন দত্তগুপ্তের মতো গুণী ও দক্ষ শিল্পীরা | এঁরা এবং আরো কিছু বিজ্ঞাপনী শিল্প ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রায় চার দশক পরে এক শারদীয় শনিবারের বৈকালিক আড্ডায় সুখ্যাত ভাস্কর শ্রী শংকর ঘোষ, যিনি সত্তর ও আশি দশকের দুটি সফল বাণিজ্য বিজ্ঞাপন এজেন্সির স্থপতি ছিলেন, তিনি একটি চমৎকার বিশ্লেষণী মনোলগের দাঁড়ি টানার আগে সখেদে বলেছিলেন, "বিজ্ঞাপনের সত্যজিতের ওপর তাঁর চলচ্চিত্র-খ্যাতির আলো পড়ে গরিমা বাড়িয়েছিল, তাই তিনি আলোচনার বৃত্তে তবু মাঝে মাঝে আসেন, কিন্তু বাকিরা ক্রমশ বিস্মৃতির ছায়ায় মিলিয়ে যাচ্ছেন | একটা আর্কাইভ ভীষণভাবে দরকার | অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাবের উদ্যোগ নেওয়া উচিত, বিফোর ইট গেটস টু লেট" | এখনও জানা নেই সেই ক্লাবের এমন কোনো উদ্যোগের কথা | সেই আড্ডাটি ছিল নিখাদ এক মাস্টার ক্লাস; যার সুবাদে সত্যজিতের শতবর্ষে এসে তাঁর বিজ্ঞাপন জীবনকে ফিরে দেখার সময় অসুবিধা হয় না তাঁর বিজ্ঞাপন চিন্তা ও শৈল্পিক দক্ষতার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে | সম্ভবতঃ তিনি এটা দ্রুত বুঝে নিয়েছিলেন যে সফল বিজ্ঞাপনের প্রাণভোমরা হ'ল গল্পকথন | বিজ্ঞাপিত পণ্যকে করে তুলতে হবে পাঠক-ক্রেতাদের মনে ধরার মতো গল্পের উপাদান এবং তা অবশ্যই হতে হবে ক্রেতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ | এই অর্জিত বোধের দলিল হয়ে উঠল তাঁর বিজ্ঞাপনের অলঙ্করণ ও লে-আউট | অলঙ্করণে ফোটো রিয়্যালিজম আর দৃশ্যগঠনে ফটোগ্রাফিক কাঠামো বা কম্পোজিশন বিজ্ঞাপনগুলিকে বাস্তবতার খুব কাছাকাছি এনে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলল | আবার যেখানে দরকার মনে করেছেন পাল্টে ফেলছেন ড্রয়িং ও কম্পোজিশন | স্ট্রীট ফোটোগ্রাফির জনক অঁরি কার্তিয়ার

ব্রেঁসোর গুণগ্রাহী সত্যজিতের কাজ নজর কাড়তে সময় নেয়নি কীমার কর্তাদের। স্বীকৃতিস্বরূপ নিয়ম করে পদোন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি মিলছিল বাড়তি প্রশ্রয়। জুনিয়র আর্টিস্ট থেকে পরের পাঁচ ধাপ পার হয়ে আর্ট ডিরেক্টরের চেয়ার অর্জন করতে লেগেছিল মাত্র ছ'বছর। কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন সেরে নিয়েছিলেন ডি কে গুপ্ত। কীমারে কর্মরত থাকাকালীন চালু করলেন সিগনেট প্রেস যা অপ্রত্যাশিত গতিতে ভারতে বই প্রকাশনার ভোল বদলে দিয়েছিল। দূরদর্শী ডি কে বইয়ের মলাট অঙ্কন ও পাতা অলঙ্করণ করার কাজটি ন্যস্ত করলেন সত্যজিতের হাতে, ভারতীয় কর্মসংস্কৃতিতে আজও যা অকল্পনীয়। কীমারের তাতে যথেষ্ট প্রশ্রয় ছিল। সত্যজিতেরই স্মরণ নেওয়া যাক। মাই 'ইয়ার্স উইথ অপু'তে লিখছেন, "কীমারের স্টুডিওতে বসেই সিগনেট প্রেসের প্রচ্ছদ আঁকার কাজগুলো করতাম, সাহেবদের সামনেই। ওরা কিছু না বললেও আমার অস্বস্তি হতো"। রবিনসন সাহেব বোধহয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, নাহলে এই সাহেবই কেন দশক খানেক পরে পথের পাঁচালী তৈরী হলে ক্যালকাটা ক্লাবে আয়োজিত প্রথম বিশেষ প্রদর্শনীতে কীমারের দলবল নিয়ে হাজির হয়ে ছবিটি দেখবেন এবং নির্মাতার পিঠও চাপড়ে দেবেন!

বিজ্ঞাপনে রপ্ত করা সমকালীন মুদ্রণ প্রযুক্তির সঙ্গতিপূর্ণ টেকনিক নিজের শিল্প প্রতিভায় জারিত করে তরুণ সত্যজিৎ সৃষ্টি করলেন তাঁর নিজস্ব স্বাক্ষর চিহ্ন। রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতায় আধুনিকতার স্লোগান 'লেস ইজ মোর'-এর দাবী মেনে তিনি যাবতীয় আলঙ্কারিক বাহুল্য বিসর্জন দিয়ে প্রয়োজনমতো বিবিধ ভারতীয় মোটিফের সংশ্লেষ ঘটিয়ে তৈরী করলেন মিনিম্যালিজমের নিজস্ব ঘরানা। ভারতীয় বিজ্ঞাপনের এক কিংবদন্তি, সুভাষ ঘোষাল এই ঝরঝরে স্টাইলকে সংজ্ঞায়িত করলেন 'সিনেমাটোগ্রাফিক'-এর তকমায়। দ্বিমত হবার অবকাশ নেই; কারণও নেই। বিজ্ঞাপন ও বই অলঙ্করণ, এই দুই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের ও সারা দেশের অজান্তে অবতারণ করলেন কমার্শিয়াল আর্টের এক নতুন শৃঙ্খলা – গ্রাফিক ডিজাইন। এর প্রয়োগ অনেক পরে হলেও দেশীয় বাণিজ্যিক কলায় তিনিই হলেন এই শৃঙ্খলার প্রথম সাগ্নিক। সমসাময়িক আর একজনকে ইতিহাস তাঁর পাশে রাখে, তিনি নিউ ইয়র্কের মিল্টন গ্লেসার; বয়সের মাপে যদিও গ্লেসার ছিলেন বছর আটেক ছোট।

এই আলোচনায় সত্যজিতের সিগনেট পর্ব গরহাজির থাকছে; কারণ, পর্বটি বহু আলোচিত। বিজ্ঞাপনের কাজ নিয়ে লেখাপত্র থাকলেও, তা ভারতীয় বিজ্ঞাপনের উন্মেষ পর্বের প্রেক্ষিতে দেখা হয়নি; বিশেষত বাংলায় তাঁর তৈরী বিজ্ঞাপনগুলির ক্রমিক পরিবর্তন বোঝার চেষ্টা হয়নি। বিরল দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আলোচকরা তাঁদের লেখায় বিজ্ঞাপনশিল্প ও তার নিজস্ব বিজ্ঞানকে এড়িয়ে গেছেন মূলত সম্যক জ্ঞানের অভাবে। পক্ষান্তরে ইংরেজি ভাষায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই এই পেশার মানুষ, যে কারণে স্বাভাবিক অভ্যাসে সবদিক বিবেচনার মধ্যে রাখার আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছেন। তবুও একটি ত্রুটি থেকে গেছে, যার থেকে এই লেখাও মুক্ত থাকছে না। ত্রুটিটি অনিবার্য হয়েছে, কারণ অধুনা অ্যাডস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আর্কাইভ, অ্যাডভার্টাইজিং এজ বা ক্যাম্পেনের মতো প্রকাশনা, যাঁরা বিজ্ঞাপনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির সৃষ্টিতে জড়িত সবার নাম ডকুমেন্টেড করে থাকে, তেমন নজির তখন ছিল না। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আছে ইতিহাসের সংরক্ষণ নিয়ে শিথিল ভারতীয় মানসিকতা। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এই রোগটি ছিল আরও গুরুতর, অমার্জনীয় নিস্পৃহতার শিকার হয়েছেন বহু প্রতিভা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত সত্যজিতের কিছু কাজ থাকলেও তা যৎসামান্য। চোদ্দ বছরের পেশাদারী জীবনে সংখ্যাটা অনেক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো না হলেও সরোবর দর্শনের চেষ্টা করা যাক। প্রাপ্ত কাজগুলির তালিকায় প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'সানডে ইজ পলুড্রিন ডে' – আই সি আইয়ের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক বড়ির বিজ্ঞাপন সিরিজ; চার শব্দের ক্যাচ-লাইন বা হেডলাইনে ধ্বনিত ববি বীভানের স্বর। অতি সহজ বাক্যবন্ধ, কিন্তু আসল বার্তাটি অনায়াসে স্মরণযোগ্য করে তোলে। অনেকের মতে স্নেহশীল অভিভাবকের আদেশের মতো করে বলা কথাটির লেখক সত্যজিৎ স্বয়ং। সম্ভাবনার নিরিখে তাঁর দিকেই পাল্লা ভারী। কিন্তু যা নিয়ে বিন্দুবৎ সংশয় নেই তা হ'ল তিন বিজ্ঞাপনের এই সিরিজের অভিনবত্ব। তখনকার বাণিজ্যিক অঙ্কনকলায় আলঙ্কারিক আধিক্যের চলতি ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নির্ভার ছিমছাম রেখাচিত্রে গল্পের মেজাজ নিয়ে এলেন। তৎকালীন সমাজের তিন শ্রেণীর

পরিবারের রবিবাসরীয় চিত্রগুলি অনুপুঙ্খ প্রাসঙ্গিক ডিটেলসসহ লে-আউটে বুনে দিলেন সম-মাপে, ডিজাইনের তিলমাত্র বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। ঠিক যেন হাতে আঁকা চলচ্চিত্রের ফ্রিজ করে রাখা তিনটি দৃশ্য। প্রথমটি গ্রামোফোন শোভিত স্বচ্ছল ও প্রাণোচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্দরমহল, দ্বিতীয়টি বিলাসী বাদামী সাহেব পরিবারের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যপরিবৃত মেকি আভিজাত্যের টুকরো ছবি এবং তৃতীয়টিতে তিনি তুলে ধরলেন সমকালীন কলকাতার ইউরোপীয় পরিবারকে। অন্দরমহল থেকে এবার পটপরিবর্তন করে চলে এলেন বহির্দৃশ্যে, বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত সাহেব কর্তা ঘাড় ঘুরিয়ে হাসিমুখে দেখছে মেম গিন্নীর খাবার ডাকে ছুট লাগিয়েছে একরত্তি কন্যা। যে দাবী করলে অত্যুক্তি হবে না, তা হ'ল শহুরে মধ্যবিত্ত, ধনী ও ভারতীয় ইঙ্গ পরিবারের খন্ড খন্ড ছবি দিয়ে সত্যজিৎ কীমার ও আই সি আইয়ের হয়ে বিজ্ঞাপনকে সর্বপ্রথম সচেতনভাবে গল্প বলার মাধ্যম করে তুললেন। এই দেশ এমনকি এই মহাদেশেও এই রীতি আগে দেখা যায়নি। স্টোরি-টেলিং-এর চমৎকার বিজ্ঞাপনী আত্তীকরণে চিরস্থায়ী দৃষ্টান্ত হয়ে রইল এই সিরিজ এবং কিংবদন্তি জার্মান স্থপতি লুডউইগ মিস ভ্যানডারোনের অমর উবাচ 'গড ইজ ইন ডিটেল'-এর শৈল্পিক প্রয়োগেরও। তাঁর চলচ্চিত্র রচনায় ডিটেলের প্রতি এই বিশেষ অর্থবোধক নজর তিনি চূড়ান্ত উৎকর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন চিত্রনাট্য, সিনেমাটোগ্রাফি, সম্পাদনা, সঙ্গীত, সেট নির্মাণ ও অভিনয়ের ন্যারেটিভে সাংকেতিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

ওঁর বিজ্ঞাপন যাপনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিলে তাঁর সৃজনী দক্ষতার বিবর্তনের এক পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৫০ সালে শিল্প নির্দেশকের পদে উন্নীত হবার পরই এজেন্সির কর্তারা তাঁকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনের আধুনিক ভাবনা ও প্রকরণের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে আরো শাণিত করে তোলার উদ্দেশ্যে লন্ডনের মূল দপ্তর বেনসনে পাঠায়। এর বছর খানেক আগেই ফরাসী তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রভাবশালী পরিচালক জঁ রেনোয়ার সঙ্গে কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাঁর পরিচয়পর্ব সারা হয়েছে এবং তাঁর প্রশ্রয় ও সখ্যতালাভও ঘটে গেছে। এই সাক্ষাৎ ও তার অভিঘাত যে তাঁর মানসিক রসায়নে পরিবর্তন এনেছিল ছ'মাসের লন্ডনবাস তারই সাক্ষী। আবার সেই 'মাই ডেজ উইথ' অপুতে ফেরা যাক। সোজাসাপ্টা বলে দিলেন বিদেশে তিনি বিজ্ঞাপন নিয়ে নতুন কিছু শেখার মতো পাননি। বরং ঐ ছ'মাসকে কাজে লাগিয়েছেন ৯৯টা সিনেমা দেখে। ইঙ্গিত স্পষ্ট। বিজ্ঞাপন নিয়ে নানা ধরনের বাঁক বদল সাগরপারে ঘটে চললেও তাতে তিনি উৎসাহ পাননি। তাঁর আগ্রহের ভুবন জুড়ে তখন সিনেমার পদধ্বনি। এ সত্ত্বেও বিলেত-ফেরৎ সত্যজিৎ কিন্তু তাঁর বিজ্ঞাপন ভাবনা ও তার প্রয়োগে কোন শৈথিল্যের স্থান দেননি। পক্ষান্তরে তিনি নিজেকে আরো পরিণত করে তুলেছিলেন। যেমন ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গো সাবানের বিজ্ঞাপন – সাবানের নাম পেলব টানে বড় বলিষ্ঠ ক্যালিগ্রাফিতে লিখে বা এঁকে লে-আউটের বাঁদিকে নীচ থেকে আড়াআড়িভাবে উপর পর্যন্ত উলম্ব করে বসালেন। সব মিলিয়ে চোখে পড়ার মতো উপস্থাপনা, যা বিজ্ঞাপনের অপারচুনিটি টু সি প্রায় এক'শ শতাংশ নিশ্চিত করে দেয়। ডানদিকের ওপরে প্রান্তরেখার কাছে ক্রোকুইল নিবের

কলমে আঁকা এক মা তার শিশু সন্তানকে যত্ন ও আদর ঢেলে স্নান করানোর ছবি। শিশুটিও খুশীতে থৈ থৈ। গল্প যা বলার ছিল ছবিতেই প্রকাশ পেল। এরপর অনুক্রমিক বিন্যাসে এল ঈষৎ বড় তির্যক অক্ষরে লেখা কেজো হেড লাইন – হেলিয়ে রাখা মার্গো সাবানের দ্বিমাত্রিক ফোটোগ্রাফ এবং তার নীচে সাবানের সংক্ষিপ্ত গুণবর্ণনা। এই বিজ্ঞাপন যদি আটপৌরে মধ্যবিত্ত ঘরোয়া জীবনের একখন্ড প্রতিফলন হয়, তবে তাঁর তৈরী চেলসি সিগারেটের কাজটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। অনায়াস সাবলীলতায় বিজ্ঞাপনে আনলেন অন্য ভঙ্গিতে অন্য মেজাজ। কার্টুন আঙ্গিকে কমিক স্ট্রিপের খাঁচায় চারটি ফ্রেমে বন্দী করলেন চারটি পরিচিত মুহূর্ত। তৈরী করলেন গল্প। প্রথম গল্প একজন ক্রিকেট বোলারের। দেহভঙ্গিমায় বুঝতে অসুবিধে নেই চরিত্রটি ফাস্ট বোলার; খুব চেষ্টা করেও উইকেট পেতে ব্যর্থ। এল লাঞ্চ বিরতি। দিল সিগারেটে টান। তারপর মাঠে নেমেই পেল সাফল্য। মনে রাখা দরকার সিগারেট ও খেলাধূলার মধ্যে

তখনও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আড়ি করায়নি | এবং সরকার সিগারেট বিজ্ঞাপনকে কালো তালিকায় চালান করেনি| সত্যজিতের হাতে চেলসির পজিশনিং হ'ল ক্রিকেটপ্রেমী শিক্ষিত নাগরিকদের এনার্জিবর্ধক সিগারেট হিসাবে | তামাক সেবনের উপকারিতার এই মিথ তখন স্বমহিমায় সত্যি হয়ে বিরাজ করছে | লে-আউটের নীচে দৃষ্টিগ্রাহ্য জায়গা তৈরী করে সিগারেটের টিন ও প্যাকেটদুটি বসিয়ে দিলেন | কাঠামো এক রেখে এই সিরিজের দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে হাজির করলেন ঘোড়-দৌড়ের মাঠে এক রেসুরের বাজী হেরে জয়ে ফেরা | এরকমভাবেই চার ফ্রেমের কাহিনী এবং তৃতীয় ফ্রেমে ধূমপান; প্যাকশটও আগের মতো একই স্থানে | সিক্যুয়েলটি প্রথমটির স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার প্রেক্ষিতে দুর্বল, ঈষৎ আরোপিত | অঙ্কনরীতিতে তখনকার নামজাদা ব্রিটিশ কার্টুনিস্ট জেমস হোয়াইটফিল্ড টেলরের ছাপ নিয়ে সত্যজিতের মস্তিষ্কজাত এই ক্যাম্পেনেরও ভিত্তি ছিল 'ব্র্যান্ডের' ক্রেতাদের আর্থসামাজিক অবস্থান | তাঁর করা চেলসির আর একটি বিজ্ঞাপনের সন্ধান পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ পণ্যকেন্দ্রিক, তথ্যভিত্তিক ও সরাসরি বিক্রয়মুখী | ইংরেজিতে

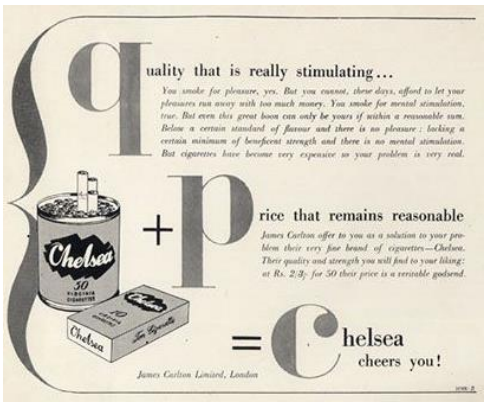

কোয়ালিটির 'Q', প্রাইসের 'P' ও চেলসির 'C' নিয়ে টাইপোগ্রাফিক দৃশ্যায়নে সিঁড়িভাঙ্গা সমীকরণ | শেষ করছেন 'চেলসি চিয়ার্স ইউ' স্লোগান দিয়ে| কপি সাজিয়েছেন বোডোনি ফন্টে | প্যাকেটের ছবিকে অন্যদুটি বিজ্ঞাপনে যেখানে রেখেছিলেন, সেখানেই রেখে ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন; যা রীতিমত আধুনিকই নয়, সময়ের থেকে অনেকটাই প্রাগ্রসর | টেনরস নামের আরেকটি বিদেশী সিগারেটের বিজ্ঞাপন করেছিলেন যার কথনটি ছিল শহুরে উপকথার ঢংয়ে – এক সিগারেটের তিন নাম ও তার কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা | শুরু হয়েছিল 'Which of Three' এই প্রশ্নবোধক মোচড়টি দিয়ে| সব মিলিয়ে আধুনিকতা ও সংরক্ষণশীল আভিজাত্যের মিশেল| পণ্য ও তার ক্রেতা বুঝে বিজ্ঞাপনকে গল্পের আধারে গড়ে তোলার এই শৃঙ্খলার উৎসস্থান নিঃসন্দেহে বিদেশ হলেও ভারতীয় বিজ্ঞাপনে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় অনেকটাই সত্যজিতের হাতে | কিন্তু সেই সময়ের দেশীয় বিজ্ঞাপনের জায়মান জগৎ, বিশেষ করে ভারতীয় বিজ্ঞাপনের মক্কার শিরোপা পেতে চলা মুম্বাই পূবের দিকে তাকায়নি | তাকালে জানতে পারত কয়েক বছরের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ইংরেজি বিজ্ঞাপনে ঝড় তুলে তিন মহাগুরুর আবির্ভাব ঘটবে, যথাক্রমে রজার রিভ, ডেভিড ওগিলভি এবং বিল বার্নব্যাক – তাঁরা তাঁদের তিন ভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগে প্রধান ভূমিকায় রাখবেন এই গল্পকথন | রিভসের ইউ এস পি – ইউনিক সেলস প্রোপোজিসন বা পণ্যের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যকে পাখির চোখ করার জন্য এই তত্ত্বকেন্দ্রিক বিজ্ঞাপনগুলি প্রায় গল্প বিবর্জিত সোজাসাপ্টা তথ্য পরিবেশন | ডেভিড ওগিলভি, যিনি বেনসনকে কিনে নিয়েছিলেন, তিনি বললেন "মেক দ্য প্রোডাক্ট হিরো"| পণ্যই নায়ক | এই নায়ককে নিয়ে বুনতে হবে এমনই আকর্ষণী ভাষ্য যা ক্রেতাকে প্ররোচিত করবে নায়কোচিত পণ্যের দিকে, কিন্তু প্ররোচনা যেন কোনভাবেই প্রতারণা না করে সেদিকে রাখতে হবে শ্যেনদৃষ্টি | বলা হবে ততটুকুই, যতটুকু ক্রেতা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে পরখ করে নিতে পারবে ও অনুভবে ধারণ করতে পারবে | বলাই বাহুল্য, ওগিলভি সাহেব স্টোরি-টেলিংকেই বেছে নিয়েছিলেন পণ্যকে বিজ্ঞাপনে 'নায়ক' রূপে হাজির করতে | ত্রয়ীর কনিষ্ঠতম বার্নব্যাক সৃজনশীলতাকে প্রায় পিকাসোর ক্ষমতায় যে ফ্রন্টিয়ারে নিয়ে গেলেন তা এই একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল অভ্যুদয়কালেও বিস্মিত করে চলেছে | তিনি বিজ্ঞাপনকে ক্রেতার মনোজগতে প্রবেশ করিয়ে তার নিজস্ব নান্দনিক বোধকে প্ররোচিত করালেন বিজ্ঞাপন নিয়ে চর্চা করতে | পণ্যকে করে তুললেন ত্রিমাত্রিক ব্র্যান্ড, যা শুধু পরখ করে দেখে কেনার জন্য নয়, তার সাথে বৌদ্ধিক সম্পর্ক স্থাপনেরও | তাঁর বিজ্ঞাপনী ন্যারেটিভে গল্পকে এতটাই প্রবল ইঙ্গিতময় করে তুললেন যে পাঠকও হয়ে উঠল এর অপরিহার্য অংশীদার; একইসঙ্গে গল্পের পুনর্নির্মাণকারী ও ক্রেতা | বিজ্ঞাপন জগতের সুলুক সন্ধানীরা জানেন এই ত্রয়ীর মধ্যে রিভ দ্রুত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছিলেন, তার অন্যতম কারণ তাঁর বিজ্ঞাপনতত্ত্বে গল্পহীন একঘেয়েমি |

সত্যজিতের 'শাওয়ার ফ্রাইট', স্নানের ভয় ও 'কোম্ব ফ্রাইট', চিরুনিভীতি চুল পড়ার সমস্যা ও তার সমাধানে জবাকুসুম তেলের আশ্বাসসহ বিজ্ঞাপনদুটি মূল ভাবনায় চেলসি সিগারেটের নারীকেন্দ্রিক সংস্করণ। সমস্যা ও সমাধানকে বিষয় করে অন্য অঙ্কন টেকনিক ও ভিন্ন উপস্থাপনের মাধ্যমে ১৮০° তফাতে সরে গেছেন। অঙ্কন রেখার হেরফের ঘটিয়ে দুই নারীর শরীরী বিভঙ্গকে আলাদা করে দিয়েছেন; তুলি দিয়ে কালো রঙে

ভরাট ছবিদুটি দর্শনীয়ভাবে দ্বিমাত্রিক হয়ে ওঠার পাশাপাশি ভয়ের সাংকেতিক দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। অলঙ্করণের ঠিক নীচে, পরিভাষায় সাব হেডলাইনে এই ভয়ের ঘোষণা বহু নারীর মনে বসত করে। বড়ি কপি বা ব্যাখ্যান দুটি

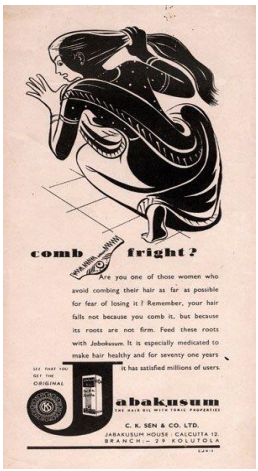

বিজ্ঞাপনে দুভাবে সাজিয়েছেন লাইনগুলির মধ্যে জায়গা রেখে। এই রিলিফ পাঠককে স্বস্তি দেয়, চোখের আরামে লেখাগুলি পড়ার জন্য আগ্রহী করে তোলে। নীচে জবাকুসুমের ইংরেজি 'জে' অক্ষরকে বড় করে এঁকে কালো রঙ দিয়ে ভরাট করে জবাকুসুম তেলের শিশির প্যাকশটকে বসালেন রিভার্স অর্থাৎ সাদা আউটলাইন দিয়ে পরিস্ফুট করে। যেন ভয়ের আঁধার ভেদ করে হাজির হচ্ছে জবাকুসুম। সারা বিজ্ঞাপনে পণ্যের ছবিকে জায়গা দিলেন মেরেকেটে দুই শতাংশ। আমরা যেন মনে রাখি এই দুঃসাহসিক কাজটি যে সময় তিনি করছেন, বিল বার্নব্যাক নামক নতুন যুগের কারিগর তখনও ভবিষ্যতে অপেক্ষারত।

১৯৫২ সালে জবাকুসুম ও বসন্তমালতীর নির্মাতা স্বদেশী শিল্পোদ্যোগের প্রথম যুগের কম্পানি সি কে সেন ৭৫ বছরে পা রাখেন। প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপন তৈরীর দায়িত্ব বর্তায় সত্যজিতের ওপর। এই ঐতিহাসিক মাইল ফলক অর্জন উপলক্ষ্যে যে টপিক্যাল বিজ্ঞাপনটি (সম্ভবত দৈনিক সংবাদপত্রের আধপাতার মাপে) সৃষ্টি করলেন, তার অঙ্কন স্টাইলে তাঁর অন্যতম শিক্ষক শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর ছাপ ছিল। হয়তো জবাকুসুমের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ফিরে দেখানোর সুযোগে গুরুপ্রণাম। বিজ্ঞাপনের অলঙ্করণে রেখার চলন ও পেলবতাকে পাল্টে দিলেন পাথুরে খোদাইচিত্রের মতো

করে। লে-আউটের মাঝবরাবর ওপরের দিকে আলপনার অনুষঙ্গে আঁকা ৭৫ সংখ্যাটিকে রেখে তার সামান্য নীচে দু'প্রান্তে দুটি ডিম্বাকার ঘেরাটোপে রাখলেন দুটি মানব শরীর, পুরুষ ও নারী। ডানদিকে পুরুষটি আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে তেল তৈরীতে রত এবং বাঁপ্রান্তের নারীটি কেশচর্চায় মগ্ন। ৭৫-এর ৫-এর ওপর দিকটাকে উড়ন্ত নিশান বানিয়ে কলম ও তুলির টানে চিরায়ত ভারতীয় সাবেকিয়ানার বিশ্বস্ত বাহকরূপে সি কে সেনের ধারাবাহিকতাকে প্রত্যাশিত প্রতিপাদ্য বিষয় করলেন। ৭৫-এর নীচ থেকে সেন্টার সেটে সাজিয়ে শেষ করলেন সি কে সেন নামের ঠিক উপরে। নামের ঠিক নীচে সংস্থার তিন পণ্যের নাম দিয়ে তরঙ্গের আভাস। সারা বিজ্ঞাপনটাই হয়ে উঠছে ৭৫ উদ্‌যাপনের দ্যোতক, অথচ কোথাও কোন বাড়তি অলঙ্করণের চিহ্ন নেই। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্নের অবকাশ তৈরী হয়; সত্যজিৎকে নিয়ে নয়, বিজ্ঞাপনের ভাষা নিয়ে। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে ভারতের স্বাক্ষরতার হার যেখানে ১৮.৩২ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২৪ শতাংশ (নারী ১২.৭৪%, পুরুষ ৩৪.২৪%) এবং ইংরেজি জ্ঞানসম্পন্ন পাঠক সংখ্যা খুব

উদারতার সঙ্গে ধরলে স্বাক্ষর জনসংখ্যার অর্ধেক; সেখানে জবাকুসুম তেল, যার টিজি আংশিক উচ্চবিত্ত থেকে পুরো মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তার বিজ্ঞাপনের ভাষা শুধু ইংরেজি কেন? স্থানীয় কোন ভাষা – বাংলা, অহমিয়া, ওড়িয়া বা হিন্দিতে কি হয়নি? অথচ সত্যজিৎ পরবর্তী জবাকুসুমের বিজ্ঞাপন ভাষান্তরিত হয়েছে। সিধু জ্যাঠার শরণাপন্ন হবার সুযোগ থাকলে সত্য ও তথ্য উদ্ঘাটন হতে পারত।

সত্যজিতের চর্চিত মেধা ও মনন তাঁর বিপুল প্রতিভার জমিকে যে বহু ফলনের উপযোগী করেছিল তার প্রথম প্রমাণ তাঁর বিজ্ঞাপনের কাজ। এবং অবশ্যই বইয়ের প্রচ্ছদ অঙ্কন। পণ্য ও তার ক্রেতার শ্রেণী চরিত্র বুঝে বিজ্ঞাপনে নিজের আঙ্গিক বদলেছেন; কখনও রেখার সূক্ষ্ম হেরফের ঘটিয়ে, কখনও দৃশ্যত নতুন স্টাইলে আবহ তৈরী করে। একদিকে ফিলিপস লাইটের মনোযোগী সুশ্রী পাঠিকাকে সামান্য কয়েকটি রেখায় আলোকিত করে বুঝিয়েছেন পণ্য মাহাত্ম্য, অন্যদিকে টি-মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ডের জন্য ভাল চা তৈরীর পাঁচ ধাপ নিয়ে ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধির বিজ্ঞাপনে সমন্বয় ঘটিয়েছেন হালকা রেখার পাঁচটি সিচ্যুয়েশনাল ড্রয়িং ও পাঁচটি স্পাইকওলা লম্বাটে ঘন কালো তারার গ্রাফিক্সের। কালো স্টারবার্স্টের মধ্যে সাদাতে লেখা The 5 Golden Rules এবং বার্স্টের বাইরে Follow the Rule of 5 to make a perfect cup of tea. এরও কোন বাংলা সংস্করণ চোখে পড়েনি। এই উপেক্ষা তখন থেকেই শুরু, এবং নাগরিক ক্রেতাদের উদাসীন প্রশ্রয়ে বিজ্ঞাপন পেশায় ইংরেজিয়ানা জাঁকিয়ে বসে। হাতে গোনা কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া সত্যজিতেরও মাতৃভাষাকে এই কাজে স্বমহিমায় দেখার জন্য আরেক রায় রাজত্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছিল ললাট লিখন!

দ্বিমত নেই যে রাম রায় ও তাঁর বিজ্ঞাপন এজেন্সি রেসপন্সের হাতে ঘটেছিল এই ঐতিহাসিক উপেক্ষার সাময়িক অবসান।

বিজ্ঞাপন যাপনকালেই রেঁনোয়ার সাথে পরিচয় ও তাঁর 'রিভার' ছবির শুটিং দেখার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা ছাড়াও সত্যজিৎ ভারতের প্রথম ফিল্ম সোসাইটি (যদি অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর বছরে ব্রিটিশরাজের যুদ্ধমহিমার প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক ঘরানার ডক্যুমেন্টারি ছবি তৈরীর তালিম নিতে জন গ্রিয়ারসন, বেসিল রাইট, হামফ্রে জেনিংস ও অন্যান্য তথ্যচিত্র নির্মাতাদের কাজ নিয়ে চর্চার কেন্দ্র হিসেবে বম্বে ফিল্ম ক্লাবকে তালিকাভুক্ত না করা হয়) প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালেখি ও চিত্রনাট্য রচনার কাজ নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছেন। হরিসাধন দাশগুপ্ত, বংশীচন্দ্র গুপ্ত, আশিস বর্মন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্তদের মতো তুখোড় মস্তিষ্কদের সাথে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর কফি হাউসে নিয়মিত মগজাস্ত্রে শানও দিচ্ছেন। আই টি সির হরাইজন সিগারেটের বিজ্ঞাপনী ফিল্ম 'ডিসার্নিং আই' এবং 'এ পারফেক্ট ডে'-র চিত্রনাট্য করছেন। নিজের চলচ্চিত্র প্রযোজনার জন্য গঠন করা 'কনক পিকচার্স' নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছেন। তাঁর সময়কাল পরবর্তীতে বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে ফ্যাকচুয়াল বা তথ্য পরিবেশনার যুগ (১৯৪৭-১৯৬০) নামে চিহ্নিত। কিন্তু সত্যজিতের কাজ যে এই তকমার প্রতিস্পর্ধী, তা ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই উপেক্ষা কোনভাবেই তাঁর প্রাপ্য ছিল না, তবুও ঘটেছে বোধহয় ভাস্কর ও বিজ্ঞাপন শিল্পী শঙ্কর ঘোষের মৌখিক বিশ্লেষণে উল্লিখিত তাঁর সাইক্লোনিক চলচ্চিত্র খ্যাতির কারণেই। কেমন ছিল সে যুগের চলচ্চিত্র? দাঙ্গা ও দেশভাগের দুরারোগ্য ক্ষত ও ছিন্নমূল জনস্রোতের বিপুল চাপ নিয়ে স্বাধীন ভারত নেহেরু নামক মহীরুহের কিছু ভ্রান্ত ও কিছু সুদূরপ্রসারী নীতিকে কেন্দ্র করে দেশ গঠনের রোম্যান্টিকতায় আচ্ছন্ন। অর্থনীতি পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পাবলিক সেক্টরের উত্থান ঘটছে, বিশেষত ভারী শিল্পক্ষেত্রে। কোন এক অজ্ঞাত ও ব্যাখ্যাতীত কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাধান্য না দিয়ে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে। প্রাইভেট সেক্টর বা ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগ কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। সরকারী ছত্রছায়ায় প্রায় প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে তাদের

সুখের মনোপলি, জন মামফোর্ড কেইনস কথিত 'অ্যানিম্যাল স্পিরিট' তাদের ডিএনএ-তে ঢোকার পথ পায়নি | এই উপসর্গগুলো ধারণ ও বহন করে উপভোক্তাদের বাজার তখন ষোলআনা বিক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণে| পরিভাষায় 'সেলার্স মার্কেট', যা প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপনের স্বরূপ প্রকাশের অন্তরায় | সত্যজিৎ চেষ্টা করেছিলেন এই দৃশ্যপটেও সৃজনশীল হয়ে ওঠার, পেরেছিলেনও | তাঁর করা বিজ্ঞাপনগুলি মেধাগুণে শুধু স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি, পাঠক ও ক্রেতার তারিফও কুড়িয়েছিল | এই দাবীর প্রমাণে লিখিত তথ্য বিরল হলেও, সেই সময়ের বিজ্ঞাপন জগতের বেশ কয়েকজন নামী মানুষ – যেমন কানু বসু, শ্যাম গুহ, রঘুনাথ গোস্বামী, পূর্ণেন্দু পত্রী ও অব্যবহিত পরে সমীর সরকার ও দিগীন মুখার্জিদের সঙ্গে আলোচনায় জেনেছি কাজগুলির সমাদর লাভের কথা | তাঁর পেশাদারী বিজ্ঞাপন জীবনে যে কাজটির অনুপস্থিতি ঈষৎ বিস্ময় উদ্রেক করে তা হ'ল লোগো নির্মাণ | মার্গো বা জবাকুসুম নিয়ে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফন্ট ব্যবহার করলেও লোগোর চেহারা দেননি| বোধহয় তেমনভাবে ভাবাও হয়নি| এই শূন্যতা পূর্ণ করেছেন পরে| তাঁর হাতেই তৈরী হয়েছিল সাহিত্য অ্যাকাডেমি, রূপা প্রকাশনী, আইজেনস্টাইন সিনে ক্লাব, নন্দন, দেশ পত্রিকা ইত্যাদির অসাধারণ ক্যালিগ্রাফিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোগোগুলি | সবই ১৯৫৬ সালের পরে| ততদিনে তিনি নিজের অজান্তেই ভারতে বিজ্ঞাপন থেকে চলচ্চিত্র যাত্রার সরণি তৈরী করে ফেলেছেন, যে পথে পরের দশকে রাজেন তরফদার ও সত্তরে শ্যাম বেনেগল দিয়ে শুরু করে অবিরত মাইগ্রেশন চলতে থাকবে | ১৯৫৬-তে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন ও ডি জে কীমারও বন্ধ হয়ে যায় | যদিও ঘটনাদুটি সম্পর্কহীন | কীমার কর্তারা অবশ্য পাততাড়ি গোটানোর আগে ক্যালকাটা ক্লাবের বিশেষ প্রদর্শনীতে পথের পাঁচালী দেখে অকুণ্ঠ তারিফ করে গিয়েছিলেন | সত্যজিৎ এবার সৃষ্টি করতে শুরু করেন সত্যযুগ এবং বন্ধ কীমার থেকে তৈরী হয় কলকাতায় ক্ল্যারিয়ন ও বম্বেতে বোমাস হয়ে ওগিলভি বেনসন যারা ১৯৬১ থেকে ভারতীয় বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় যুগে দ্রুত সর্বভারতীয় চেহারা নেয় এবং সেরা এজেন্সি তালিকায় স্থায়ী হয়ে থাকে, কমপক্ষে পরবর্তী পঁচিশ বছর | সত্যজিৎ ক্ল্যারিয়নের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে যুক্ত ছিলেন ১৯৯০ পর্যন্ত| পদটি অনেকটাই আলঙ্কারিক ও সাম্মানিক | ৭১-এ তিনি আমেরিকায় ফ্লোরিডার একটি সংস্থার হয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য দুটি ইংরেজি টাইপ ফন্ট তৈরী করেন, যথাক্রমে রে রোমান ও রে বিজার | দুটিই স্যান শেরিফ গোষ্ঠীর এবং এ কাজেও তিনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসহ প্রথম ভারতীয় | পরে আরো দুটি ফন্ট, ড্যাফিন্স ও হলিডে স্ক্রিপ্ট রূপায়িত করেন | ফন্টগুলিতে নিখুঁত জ্যামিতিক গঠন স্থাপত্যের সৌকর্য থাকলেও অভিনবত্ব বিশেষ কিছু ছিল না | এই কারণেই হয়তো বোডোনি, গিলসান, ইউনিভার্সাল, টাইম রোমান, হেলভেটিকা ও সম্প্রতি গ্যারামন্ড ফন্টের জয়যাত্রায় ভাগ বসাতে পারেনি | সুব্রত ভৌমিকের মতো অভিজ্ঞ মেধার ফন্ট বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মনে করেন যে সত্যজিৎ নিজের কাজের এই ঘাটতি বিলক্ষণ জানতেন এবং অকপট ছিলেন বিজ্ঞাপন থেকে তাঁর প্রাপ্তি নিয়েও | যেমন ঋণ স্বীকার করেছেন, ক্ষোভও ব্যক্ত করেছেন – যার লক্ষ্য ছিল ক্লায়েন্ট বা মক্কেলদের কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা | উল্লেখ্য, এই মানসিকতা এখনও বহাল আছে, বরং বি-স্কুলের অহমিকা বলে প্রকটতর | টাটা স্টীলের কিংবদন্তি বড় কর্তা, রুসি মোদী শীর্ষপদে আসীন হয়ে তাঁর প্রথম কর্তব্য হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন সংস্থায় কর্মরত বি-স্কুল শিক্ষিতদের 'আনলার্ন' করানো| ব্যতিক্রমীরা আছেন, তবে সংখ্যালঘু| এটাও উল্লেখ্য, এই নিকষ ব্রাহ্মণ্যবাদ বিদেশেও বহাল আছে, না হলে ওগিলভি সাহেবই বা কেন বলবেন, এজেন্সির সেরা কাজগুলো স্থান পায় বাতিল কাগজের বালতিতে | শোনা যায় মিতভাষী সুরসিক সুভাষ ঘোষাল মহাশয়ও এক পন্ডিত মক্কেলের ভাণসর্বস্ব বাকদাপটে তাঁর এজেন্সির সেরা টিমের প্রেজেন্টেশনের বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে মক্কেলকে প্রশ্ন করেছিলেন মহাশয় তাঁর সংস্থা-উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপন করবেন কিনা! উত্তরে মক্কেলের কেতাদুরস্ত 'হ্যাঁ' শুনে তিনি একটি অবিস্মরণীয় উক্তি করেন, "প্লিজ ওয়েস্ট ইয়োর মানি থ্রু আস"| সোজা বাংলায়, "নিজের টাকা যখন নষ্ট করতে আপনি বদ্ধপরিকর, তখন আমাদের মাধ্যমেই করুন"| আগেই জানানো আছে সুভাষবাবু ছিলেন সত্যজিৎ-মিত্র |

প্রথম চলচ্চিত্র দিয়ে আর এক নিহিত সৃজনী প্রতিভার আন্তর্জাতিক মোহজাল বিছিয়ে সত্যজিৎ বিজ্ঞাপন থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিলেন ১৯৫৬-তে, কিন্তু নিজের অর্জনকে

ত্যাগ করলেন না | উল্টে নিজের শেষ ছবি আগন্তুক পর্যন্ত সবকটি চলচ্চিত্রের পোস্টার, লবিকার্ড, প্রচার পুস্তিকা মায় সিনেমা হলের যাবতীয় স্থির প্রদর্শনী বা ডিসপ্লে তৈরীতে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আরও শাণিতভাবে প্রয়োগ করলেন | দেবী, চারুলতা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, নায়ক, মহানগর, অরণ্যের দিনরাত্রি, জন অরণ্য, জয়বাবা ফেলুনাথ, সতরঞ্চ কি খিলাড়ী এবং আগন্তুকের প্রচারমূলক উপাদানগুলিতে সত্যজিৎ নানা ভাঙচুর করেছেন; জাত শৈল্পিক তাড়নায় নিজেকে ছাপিয়ে গেছেন বারবার | ইদানীং যখন বিনোদন শিল্পের বিপুল উত্থান সিনেমার প্রচার উপাদানগুলোকে বিজ্ঞাপনের ডিসকোর্সে জায়গা করে দিচ্ছে, পুরস্কারের জন্য আলোচনা ও বিবেচনায় আনছে সত্যজিতের কাজগুলো তাদের সময়ের থেকে যোজন যুগ এগিয়ে থেকেও এই সুযোগের বাইরে রয়ে গেল | উত্তর সত্যজিৎ যুগে ঘটেছে ডিজিটাল বিপ্লব, যা প্রায় সর্বত্রগামী হয়ে পাল্টে দিয়েছে আমাদের চেনা জগতের জানা দিগন্তগুলি | মুদ্রণশিল্পও এর বাইরে নয়, গুণমানের ক্রান্তিকারী বদল ছাপার প্রতিটি কাজকে করে তুলেছে তর্কাতীতভাবে চোখ ধাঁধানো | সিনেমা পোস্টারেও এর ব্যতয় ঘটেনি | কিন্তু এর আবেদন বহিরঙ্গেই সীমিত | খুব কম পোস্টারেই দেখা যায় যেগুলো সিনেমার বিষয় ভাবনাকে ধারণ করে থাকে এবং মেধাবী নান্দনিকতার প্রয়োগে কালোত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা রাখে | গত শতাব্দীর ৫০ থেকে ৮০-র দশকে যখন বঙ্গপ্রদেশের মুদ্রণ জগৎ আজকের প্রেক্ষিতে প্রায় মধ্যযুগে তখন শুধু অতলস্পর্শী মেধায় ভর করে উল্লিখিত সিনেমার প্রচারমূলক উপাদানগুলিকে অনতিক্রম্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন | বিষয়কে ঘিরে ক্যালিগ্রাফি, ফোটো ইমেজ, গ্রাফিক ড্রয়িং ও মোটিফের অমোঘ সংশ্লেষকে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত করে তুলেছেন | এরা বার বার উঠে আসে টাইমস ম্যাগাজিন, সাইট অ্যান্ড সাউন্ড, সিনেস্টেট থেকে আমাদের আড্ডা, সেমিনার ও বিতর্কসভার আলোচনায় | কিন্তু আলোচনাগুলিতে খুব কমই জায়গা পেয়েছে, পায়নি বললেও অত্যুক্তি হবে না, তাঁর পোস্টারগুলিতে উপস্থিত জনসংযোগের অব্যর্থ বিজ্ঞাপনী ভাবনা | উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক জয়বাবা ফেলুনাথের পোস্টারকে | পশ্চাদপটে কালো রঙের ওপর

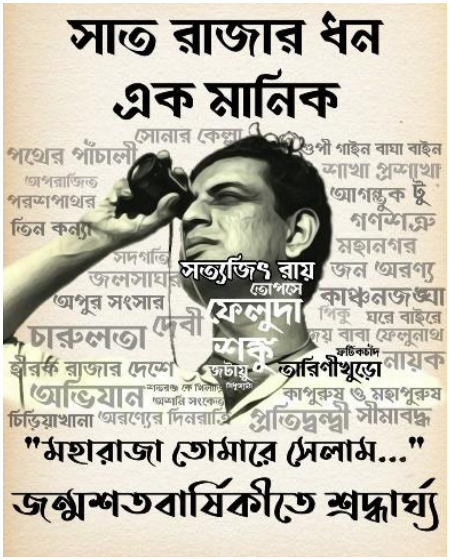

সিনেমার নামটি সাদায় অনবদ্য বলিষ্ঠ অক্ষরে লিখে দু'লাইনে ভেঙ্গে 'ল'-য়ের হ্রস্ব 'উ'কে আগুনবর্ষী পিস্তলে রূপান্তরিত করলেন | যদি 'ফ', 'ল' ও 'ন'-য়ের শুঁড়গুলোর পারস্পরিক যোগের অন্তর্নিহিত সংকেতকে কেউ গুরুত্ব নাও দেয় তাহলেও শুধুমাত্র গুলি বর্ষণকারী পিস্তল ও অক্ষরসজ্জা দিয়ে যে রহস্যময়তা তৈরী হয়, তাতেই বিষয়বস্তুর কেন্দ্রীয় ভাবনা নিয়ে ধারণা তৈরী হয়ে যায়, আকর্ষণও | এভাবেই সময়ের সীমারেখা ছাড়িয়ে যেতে থাকে সত্যজিতের সিনেমা পোস্টারে সেঁটে থাকা বিজ্ঞাপন ভাবনা | তাঁর সব পোস্টার অবশ্যই এ দাবী করে না, করা সম্ভব নয় বলেই | আমাদের গ্রহের সব বিশ্রুত প্রতিভাধরদের মতো তিনিও জানতেন তাঁর সৃজনশীল মেধার সীমাবদ্ধতা | জানতেন তাঁর সব কাজের মধ্যে যুগের পর যুগ অতিক্রম করার সঞ্জীবনী শক্তি নেই |

শেষ করা যাক সত্যজিৎ যাপিত বিজ্ঞাপন জীবন তাঁর চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল কিনা তার হদিশ দিয়ে | তাঁর দর্শকরা জানেন ২৯টি ফিচার, ৫টি ডক্যুমেন্টারি ও ২টি ছোট দৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ এসেছে মাত্র দুটি সিনেমায়, নায়ক ও সীমাবদ্ধ | আর ছিল চারুলতায় ভূপতির অমলকে বলা সংলাপের একটি বাক্যে, যার তাৎপর্য শুধু খবরের কাগজ চালাতে বিজ্ঞাপন অপরিহার্যতা বোঝাতে | কিন্তু নায়ক (১৯৬৬) ও তার পাঁচ বছরের ব্যবধানে সীমাবদ্ধতে বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের ন্যারেটিভে নাতিবিশদ দৈর্ঘ্য নিয়ে মজুত | 'নায়ক' সত্যজিতের প্রথম বহুস্তরীয় নোয়ার ছবি, যার পরতে পরতে উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত বঙ্গীয় নৈতিক দ্বিচারিতা বা হিপোক্রেসির তির্যক উদ্ঘাটন | সত্যজিতের অন্যতম পছন্দের বিষয় | নায়কের অন্ধকার ঢাকা মনোজগত থেকে সরে গিয়ে তিনি যাঁদের নিয়ে ন্যারেটিভের উপকাহিনী তৈরী করেছেন তাঁদের একজন হলেন এক বিজ্ঞাপনকর্তা | তিনি পূর্বপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে সস্ত্রীক একই ট্রেনের যাত্রী | বেশ শাঁসালো এক মক্কেলও সপরিবারে

নায়কের সহযাত্রী, যাকে জপানোর জন্য কর্তা তাঁর স্ত্রীকে টোপ হিসেবে এগিয়ে দিতে মরিয়া। স্ত্রী ঘোরতর অরাজী। কোন শুদ্ধ সংসারের কারণে নয়, তার মন ম্যাটিনি আইডলের দিকে। বিজ্ঞাপনকর্তা প্রৌঢ় মক্কেলের সন্তোষ বিধানে বিফল হলেন। তখনই একই ক্যুপে ওপরের বার্থে সারাক্ষণ নির্বাক সহযাত্রী হতাশায় বেহাল কর্তার ক্ষতে মলম লাগালেন তাদের বিশ্বজোড়া অধ্যাত্মবাদী সংস্থার জন্য বিজ্ঞাপন করার প্রস্তাব দিয়ে। অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় সমাপতন। বিজ্ঞাপন ব্যবসায় শরীরী খেলার ইঙ্গিত আপাততঃ শেষ হ'ল কৈবল্যবাদী সঙ্ঘ-জালের আহ্বানে। নিশ্চিতভাবেই বিজ্ঞাপনের জন্য খুব খারাপ বিজ্ঞাপনের নজির হয়ে রইল এই ছবি। সত্যজিৎ জানিয়ে রাখলেন বিজ্ঞাপনে শরীর ও মন দুইই পণ্য। স্মরণে ঘাই মারে 'নায়ক' তৈরীর ১৮ বছর পরে লেখা সত্যজিৎ আদলের সাহিত্য ও কবিপ্রতিভা শঙ্খ ঘোষের অবিকল্প উচ্চারণ, 'নিয়ন আলোয় পণ্য হ'ল যা কিছু আজ ব্যক্তিগত' (মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)। একটাই বাঁচোয়া – নায়কের ভূমিকায় উত্তমকুমারের যাদু উপস্থিতি ও অবিস্মরণীয় অভিনয়ের প্রভাবে আমদর্শকের মনে এই উপকথার অভিঘাত এখনও ন্যূনতম।

'সীমাবদ্ধ'তে তিনি বিজ্ঞাপন এনেছেন ছবির প্রোটাগনিস্ট শ্যামলেন্দুর পেশার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। বিজ্ঞাপন এখানে তার টেক্সটবুক নীতি মেনে সোজাসাপ্টা বিপণন ও বিক্রির মাধ্যম, যার নিয়ন্ত্রক শ্যামলেন্দু স্বয়ং। বিজ্ঞাপন কাজ করলে বিক্রি বাড়বে, আর যদি তাই হয়, তবে চরিত্রটির কর্পোরেট ল্যাডারের সর্বোচ্চ ধাপে উত্তরণ হওয়া কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সুতরাং পিটার ইন্ডিয়া ফ্যানের পশ্চিম এশিয়ায় রপ্তানি করা সংখ্যা দিয়ে শিরোনাম প্রিন্ট বিজ্ঞাপনের পুল সে যেমন মনোযোগ নিয়ে দেখে, তেমনি হট ও কুল ইংরেজি শব্দদুটির 'ও' অক্ষরকে স্পেশাল এফেক্টের মাধ্যমে দুটি বিপ্রতীপ অভিজ্ঞতার আধার বানিয়ে দেখানো অ্যাড ফিল্মকেও শ্যেন দৃষ্টিতে মেপে নেয়। সত্যজিৎ অ্যাড ফিল্মের আবহসঙ্গীতে রাখেন নিজের সিগনেচার কম্পোজিশন। ঈষৎ উচ্চগ্রামের এই সঙ্গীত লয়, তাল ও ছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে 'ও' অক্ষরের মধ্যে চিত্রায়িত দু'পর্বের নাটকটিকে দর্শকের প্রত্যাশিত ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে দেয়। শ্যামলেন্দুর শিক্ষাগত মেধা যে কর্পোরেট জগতে একমুখী মুনাফাকেন্দ্রিক সংস্কৃতির চাপে মানসিক ধার হারাচ্ছে, সম্ভবত তার প্রতীকী ন্যারেটিভ এই অ্যাড ফিল্ম। বিজ্ঞাপন তত্ত্বের নিরিখে এখানে একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে। রপ্তানীকৃত পাখার তেরো হাজার বিজ্ঞাপন হাতে নিয়ে শ্যামলেন্দুর মুখে ও নেপথ্য কণ্ঠে যে চাপা গর্ব ফুটে উঠছিল, সেই সংখ্যারই হওয়া উচিত ছিল অ্যাড ফিলমের ইমপ্যাক্ট তৈরীর অতি জরুরি উপকরণ। এর কারণ কি অসত্য জাতীয় অমনোযোগ না সক্রিয় বিজ্ঞাপন জীবন থেকে দীর্ঘ ১৫ বছরের দূরত্ব? অথচ সত্যজিৎ যে একজন তুখোড় কর্পোরেট তথ্যচিত্র নির্মাতার গুণ ধরেন তারও প্রমাণ রাখেন এই পর্বে। শ্যামলেন্দুর নেপথ্য কণ্ঠে বলা তার অতীত ও বর্তমান জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির সমান্তরালে যখন সত্যজিৎ পিটার ফ্যান কারখানার অন্দরমহলে ঢুকে ক্যান্ডিড স্টাইলে যে চলচ্চিত্রায়ন করেন তা এক কথায় হয়ে ওঠে অনবদ্য এক কর্পোরেট ডক্যুমেন্টেশন। অংশটি বর্তমান সময়ে নির্মিত কর্পোরেট ছবির মতোই ঝকঝকে, স্মার্ট। এরপর এই দীর্ঘদেহী সতত সৃজনশীল আন্তর্জাতিক ভারতীয় বাঙালি পলিম্যাথ আর কখনও বিজ্ঞাপনকে তাঁর বিষয় ভাবনার মধ্যে আনেননি; না লেখায় বা চলচ্চিত্রে।

পুনশ্চ: শ্যামলেন্দু চরিত্রের অভিনেতা বরুণ চন্দ্র ছিলেন কাকতলীয়ভাবে বিজ্ঞাপন লেখক এবং কর্মরতও ছিলেন কীমারঅন্তে জন্ম নেওয়া ক্ল্যারিয়ন সংস্থায়, যাঁর সাথে সত্যজিতের যোগ ছিল শেষ জীবন পর্যন্ত।

সত্যজিৎ রায়
জন্ম: ২রা মে, ১৯২১
মৃত্যু: ২৩ এপ্রিল, ১৯৯২ (বয়স ৭০)

নজরুলের অসুখ

শেলী শাহাবুদ্দিন

এক

দু'হাজার উনিশের জানুয়ারী মাস। বাংলাবাজার, নিউমার্কেট, সব জায়গায় খুঁজে না পেয়ে শেষে নীলক্ষেত বইয়ের বাজারে এসেছি। নজরুলের অসুখ বিষয়ে একটা বই খুঁজছি। যে দোকানটিতে নজরুল বিষয়ক বই বেশি থাকে, সেখানে এসে দোকানীকে আমার প্রয়োজনটা জানালাম। তিনি বইগুলির সন্ধানে দোকানের ছাদের একটা ফোকর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর একজন খদ্দের দাঁড়িয়েছিলেন। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে। সাথে মিষ্টি চেহারার এক তরুণী। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। কোনোদিন দেখিওনি। ভদ্রলোক আড্ডা দেওয়ার মেজাজে বেশ হাসি হাসি মুখে আমার সাথে খোশগল্প শুরু করলেন।

- "আরে ভাই, নজরুল ছিল বোহেমিয়ান প্রকৃতির মানুষ। উচ্ছৃঙ্খল। অনেক আজেবাজে জায়গায় যেত। ফলে যৌন রোগ বাধিয়ে বসেছিল... ।" ভদ্রলোক বিষয়টির বর্ণিল বর্ণনা শুরু করলেন। আমার খুব অস্বস্তি শুরু হ'ল। কিন্তু বকর বকর চলতেই থাকে। বলা বাহুল্য, বিষয়টি আলোচনা করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দলাভ করছিলেন। আমি এই আলোচনায় কোন উৎসাহ প্রকাশ করলাম না। সঙ্গের মেয়েটিও মনে হ'ল বিব্রত। সে তার লজ্জিত মুখ নামিয়ে রাখল। দোকানদার ফিরে না আসা অবধি আমি যেতেও পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ পর দোকানদার বেশ কয়েকটি বই হাতে নিয়ে অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসার পর ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে দোকানদারকে বললেন, "ওঁকে ডাক্তার বাগচীর লেখাটা জোগাড় করে দেবেন। বাগচী বলেছে সিফিলিস।"

অন্যত্র বাগচীর বক্তব্য আমি পড়েছি। তাঁর মূল রচনাও আমি পড়েছি। কোথাও পড়িনি যে বাগচী একথা বলেছেন বা লিখেছেন। কিন্তু এই ভদ্রলোক আমাকে এই বিষয়টি বুঝিয়ে গেলেন যে 'নজরুলের যৌন রোগ হয়েছিল', এই ধারণাটা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বুঝলাম, বিপরীত তথ্য থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ একথাটাই বিশ্বাস করেন এবং কথাটা পছন্দ করেন। বিচিত্র মানবচরিত্র!

আমাদের দেশে কিছু মানুষের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস এই যে শিল্প সাহিত্যিকদের জীবন অস্বাভাবিক এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে। প্রতিভাবান মানুষেরা কেউ কেউ অস্বাভাবিক। সেজন্য নজরুল বাকরুদ্ধ হলে তার কারণ হতে হবে সিফিলিস। বেটোভেন বধির হয়ে গেলে তারও কারণ হতে হবে সিফিলিস। অথচ এঁদের দুজনের কারো ক্ষেত্রেই কোন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যে তাঁদের সিফিলিস হয়েছিল। ছিল শুধু কিছু মানুষ বা বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত মত বা বিশ্বাস, যার ভিত্তি ছিল অনুমান এবং তৎকালীন ভ্রান্ত নির্ণয় পদ্ধতি (১)। তাই আমি এই ধারণার সাথে একমত নই।

ইদানীং আমরা জানি যে কিছু কিছু অটিস্টিক শিশু বড় হয়ে কোন কোন বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখায়। এইসব শিশুর এই ধরনের দক্ষতা বা প্রতিভার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যে বিষয়ে আগ্রহী হয়, সে বিষয়ে তাদের একাগ্রতা সাধারণ শিশুদের চাইতে বেশি হয়। বিষয়টি অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো। ইংরেজিতে যাকে বলে টানেল ভিশন (Tunnel Vision)। কিছু শিল্পীও হয়তো এই দলে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমার বিশ্বাস অটিস্টিক মানুষের পক্ষে কবি বা সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। কারণ টানেল ভিশনের অটিস্টিক মানুষ লক্ষ্যবস্তুর বাইরে কিছু দেখতে পায় না। জীবনকে সার্বিকভাবে দেখার (holistic view) ক্ষমতা তাদের নেই। লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুন দেখে শুধু মাছের চোখ। সে তখন আকাশ দেখতে পায় না। যে মানুষ আকাশ দেখতে পায় না, তার পক্ষে কবি বা সাহিত্যিক হওয়া সম্ভব নয়। স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা নির্ভর করে মানুষের নিজের ওপরে। শিল্প সাহিত্যের কারণে নয়, যার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ। আরো অজস্র প্রমাণ রয়েছে।

শিল্প সাহিত্যই যদি কারণ হয়, তাহলে একথা কেন কেউ মনে করেন না যে সঙ্গীতের চরম উচ্চতর মাত্রায় আরোহণের ফলে সঙ্গীতের কোন নিগূঢ় অজ্ঞাত বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেটোভেন বধির হয়েছিলেন, এবং নজরুল বাকরুদ্ধ হয়েছিলেন? অথচ আমরা কিংবদন্তি শুনি যে তানসেনের গানে আগুন জ্বলেছিল, বৈজু বাওরার গানে পাথর ফেটে পানি বের হয়েছিল।

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সঙ্গীতের দ্বারা গাছের বৃদ্ধি বাড়ানো যায়। পাশ্চাত্যে যন্ত্রণামুক্ত প্রসবের জন্য সঙ্গীতের ব্যবহার চলছে অনেকদিন থেকে।

সঙ্গীতের সাহায্যে ক্যান্সার আক্রান্ত মরণাপন্ন শিশুদের প্রায় অলৌকিক রোগমুক্তির কিছু ঘটনাও ইদানীং জানা গেছে।

মানুষ যখন এইসব শিল্পীকে বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড দেয়, তখন কেন ভাবে না যে খুনি আসামীকে যদি "benefit of doubt" দেওয়া যায়, কবিকে কেন দেওয়া যাবে না? কবি কি মানবজাতির শত্রু?

নজরুল জীবনীকার জিয়াদ আলী লিখেছেন, "কবি সম্পর্কে এত মানুষের এত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লেখা সত্ত্বেও এবং লন্ডন ও ভিয়েনার ডাক্তারদের রিপোর্ট প্রকাশের পরেও কেউ কেউ কূপমন্ডুকের মতো নিজেদের বানোয়াট বিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে চান। নজরুলের ব্যাধি নিয়ে যে দেশে-বিদেশে এত কান্ড ঘটে গেছে সে ব্যাপারে সেই রক্ষণশীলদের কোন অনুসন্ধিৎসাই নেই। তা না হলে এত বছর পর, ১৯৯৯ সালে রেজাউল করিম নামের এক উটকো বাংলাদেশী ক্যানাডায় বসে ইংরেজি ভাষায় নজরুলের জীবনী লিখতে গিয়ে সুফী জুলফিকার হায়দারের মতোই গালগল্প বানিয়ে নজরুল সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিকৃত ধারণা ছড়ানোর বদবুদ্ধি পান কোথা থেকে? নজরুলের অকালপ্রয়াত প্রথম পুত্র কৃষ্ণ-মোহম্মদের জন্ম নিয়ে তিনি অতি কুৎসিত ও অরুচিকর মন্তব্য করেছেন তাঁর বইয়ে। কবির নাতনি খিলখিল কাজীর কাছেই আমি প্রথম সেই বইটা দেখি।

নজরুলের সঙ্গী-সাথীদের প্রায় সকলেই এখন প্রয়াত। এখন নতুন করে কেউ ভুলভাল বললে তার প্রতিবাদ করবে কে?" (২) – পৃষ্ঠা ৩৩১। অর্থাৎ নজরুলের মৃত্যুর পরে যদিও ইংরেজ জাতি এই মৃত শত্রুকে নিয়ে কোন কুৎসা রটনায় আগ্রহী নয়; কিন্তু মর্ষণপ্রিয় পরশ্রীকাতর কিছু বাঙালি এখনও প্রয়াত কবির কুৎসা রটনায় রত। এর পেছনে ব্যক্তির রিপুর তাড়না দৃশ্যমান হলেও আসলে গভীরতর রাজনৈতিক কারণও রয়েছে।

দুই

একমাত্র সঙ্গীত জীবনের সাফল্যময় বছরগুলি ছাড়া কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছিল ধারাবাহিক বিয়োগান্ত জীবন সংগ্রাম। দুই হাতে যুদ্ধ করেছেন দুঃখ-দারিদ্র, অপমান, লাঞ্ছনা, সমাজ ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে। এত বেশি প্রতিকূল শক্তির এত বেশি সম্মিলিত আক্রমণের মুখে অধিকাংশ মানুষের জীবন অল্প কয়েক বছরে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কথা। সে হিসেবে নজরুল যে অন্তত ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত লড়াই করে গেছেন আমার কাছে সেটাই আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু সবচাইতে বেশি দুর্ভাগ্যজনক, ক্ষতিকর এবং মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ঘটেছিল তাঁর শেষ জীবনের অসুখকে কেন্দ্র করে। প্রথমেই তিনি ভুল রোগ নির্ণয়ের শিকার হয়েছিলেন। ফলে তাঁর ভুল চিকিৎসা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কিছু চিকিৎসক বলেছিলেন যে সময়মতো সঠিক চিকিৎসা হলে হয়তো নজরুলের অসুখের ফলাফল অন্যরকম হতো।

যেহেতু একজন বা কয়েকজন চিকিৎসক ভুল করে স্থির করলেন যে তাঁর যৌনরোগ সিফিলিস হয়েছিল, ফলে তৎকালীন পশ্চাৎপদ সমাজ চেতনার কারণে বহু বছর তাঁর ঠিকমতো চিকিৎসা তো হয়নি, উপরন্তু গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া তখন প্রায় সকল বন্ধুবান্ধব ও সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা নজরুলকে বর্জন করেন। তখনকার ক্ষমতাশালী লোকজন অধিকাংশই নজরুলকে এড়িয়ে চলেন। যাঁরা দায়িত্ব এড়াতে পারেননি, তাঁরাও যেন দায়সারা গোছের সামান্য সাহায্য করেছিলেন, ওই অল্প কয়েকজন খাঁটি বন্ধুর পীড়াপীড়িতে।

পৃথিবীর আরো কোন কোন শিল্পীর জীবনে এমন রোগ নির্ণয় ঘটেছিল; যেমন চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গগ। পাশ্চাত্যের মানুষ শিল্পীর চাইতে শিল্পীর রোগকে বড় করে দেখেন না। তাঁরা ভ্যান গগকে পূজা করেন, তাঁর রোগকে বড় করে তাঁকে অসম্মান করেন না।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার কারণে মানুষের চাইতে তার রোগ বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই রোগ নির্ণয়ের কারণে নজরুলের সংসারে নেমে আসে চরম আর্থিক বিপর্যয়। অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র এক বাড়িতে চাপাচাপি করে তাঁকে থাকতে হতো। চিকিৎসা দূরে থাকুক, অনেক সময় সংসারে খাবার কেনার টাকা থাকত না। অনেক মানুষ, যাঁরা অতীতে নজরুলের কারণে উপকৃত হয়েছিলেন, এবং যাঁদের কাছে তিনি টাকা পেতেন, তাঁরাও নজরুলকে বর্জন করেন। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় – যে রেকর্ড কম্পানিগুলি তখন একমাত্র নজরুলের গানের খ্যাতির কারণে রমরমা ব্যবসা করে ফুলেফেঁপে উঠেছিল, তারাও তখন নজরুলকে বর্জন করেছিল এবং তাঁর টাকা নিয়ে প্রতারণাও করেছিল। অবশ্য টাকা পয়সার বিষয়ে আরো অনেকে তাঁকে প্রতারণা করে ফতুর করে দেয়।

সম্ভবত নজরুলের প্রাপ্য রয়্যালটির বিষয়ে এই প্রতারণা এখনও চলছে। যদি সিফিলিস হয়েও থাকে, সে সময়ে সিফিলিসের কিছু চিকিৎসাও ছিল। যদিও তখনকার সেইসব ঔষধের কঠিন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও ছিল, কিন্তু নজরুলকে সেই চিকিৎসাও সময়মতো দেওয়া হয়নি। মূলত আর্থিক দুর্গতি এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে বাকরুদ্ধ হওয়ার পরে প্রায় প্রথম দশ বছর ঠিকমতো বা নিয়মিত নজরুলের কোন চিকিৎসাই হয়নি।

উনিশ'শ বিয়াল্লিশ সালে বাকরুদ্ধ হওয়ার পরে তাঁকে দীর্ঘদিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রাখা হয়েছিল। সামরিকবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া এক চিকিৎসক ছিলেন নজরুলের বাড়িওয়ালা বা একই বাড়ির ভাড়াটে। তিনি বিলেতি ডিগ্রিধারী চিকিৎসক ছিলেন। অর্থাৎ সিফিলিসের অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা তিনি জানতেন। কিন্তু সেভাবে চিকিৎসা না করে তিনি দীর্ঘ দু'মাস নজরুলকে কলকাতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। তাতে নজরুলের অবস্থার অবনতি হয়। তারপর তাঁকে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে এনে অন্য চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়।

তাহলে এই প্রশ্ন মনে আসা কি স্বাভাবিক নয় যে বিদেশ থেকে চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সব জেনেশুনে নজরুলকে দু'মাস ধরে সিফিলিসের চিকিৎসা না করে হোমিওপ্যাথি ঔষধ কেন খাইয়েছিলেন?

উত্তর হতে পারে এই যে, তিনি এই রোগকে সিফিলিস মনে করেননি। অথবা সিফিলিস জেনেও তিনি তার উপযুক্ত চিকিৎসা না করে জেনেশুনে নজরুলের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছিলেন। আর তাই যদি হয়, তা হতে পারে একমাত্র তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের ইঙ্গিতে বা হুকুমে। এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই যে কবি নজরুল ব্রিটিশ সরকারের জন্য অতি বিপদজনক মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, এবং নজরুলকে স্তব্ধ করে দেওয়া তখন ব্রিটিশ সরকারের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। নজরুলের বাকহীনতার সবচাইতে বড় সুফল ভোগকারী (greatest beneficiary) ছিল ইংরেজ সরকার।

ওই চিকিৎসক একসময় ব্রিটিশ সরকারের সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। সেই চিকিৎসকের জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করলে হয়তো এ বিষয়ে সত্যটি জানা যেত।

সারা পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসকরা নজরুলের রোগটি সিফিলিস নয় বলার পরেও এক শ্রেণীর মানুষ এখনও মনে করেন নজরুলের অসুখটা সিফিলিসই ছিল। তাঁদের প্রধান যুক্তি এই যে ১৯৪২ সালে লুম্বিনী হাসপাতালে ওয়াসারম্যান রিঅ্যাকশন (Wassermann Reaction – WR) পরীক্ষা পজিটিভ বা ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু সব চিকিৎসকই জানে যে, ওয়াসারম্যান (WR) পরীক্ষায় অন্যান্য কারণেও (non-specific test) ক্রিয়াশীল ফল পাওয়া যায়। অর্থাৎ সিফিলিস ছাড়াও আরো অনেক কারণে এই পরীক্ষা ক্রিয়াশীল হয়। ফলে WR পরীক্ষা বহুকাল থেকে সম্পূর্ণ বর্জিত। VDRL জাতীয় পরীক্ষা এখন করা হয় প্রাথমিক স্ক্রীনিং বা তদন্ত হিসাবে। তারপর সন্দেহ হলে আরো জটিল পরীক্ষা করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা হয়। তখনকার দিনে সেসব পরীক্ষা ছিল না।

আর একটি ধারণা বা যুক্তি এই যে নজরুলের স্থানীয় কয়েকজন চিকিৎসক যেহেতু তখন ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর এই রোগ হয়েছিল, কাজেই যতক্ষণ না কেউ প্রমাণ করতে পারবে যে এই রোগ হয়নি, ততক্ষণ ধরে নিতে হবে যে রোগটা হয়েছিল। অথচ পৃথিবীর বড় বড় চিকিৎসক তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ঘোষণা করে এসেছেন যে নজরুলের রোগটি সিফিলিস নয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৎকালীন ভিয়েনার পৃথিবী বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ হ্যান্স হফ। তিনি নির্ণয় করেছিলেন যে নজরুলের রোগটির নাম পিক্স ডিজিজ (Pick's Disease)। এই রোগে মস্তিষ্কের কিছু অংশ (Frontal & Temporal lobe) দুর্বোধ্য কারণে শুকিয়ে যায়, তারপর সমস্যাগুলি শুরু হয়। পিক্স রোগ অলঝাইমার রোগের (Alzheimer's disease) মতো একটি রোগ। অনেকগুলি স্নায়ুক্ষয়কারী রোগের মধ্যে এই রোগগুলি অন্তর্ভুক্ত। সিফিলিসের চমৎকার উন্নত চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও ইদানীং অনেক লোকের অলঝাইমার রোগ হচ্ছে। তাহলে নজরুলের সময় অলঝাইমার রোগ হওয়াতে বাধা কোথায়? এইসব মানুষদের এমন মনোভাবের কারণ কী হতে পারে?

এক সময় বলা হতো যে নজরুল ছিলেন পৃথিবীর সবচাইতে ভুলবোঝা (misunderstood) কবি। আস্তিক, নাস্তিক, মোল্লা, পুরুত, সকলেই নজরুলকে গালি দিত। নজরুল শুধু অসাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তিনি ছিলেন চরম অসাম্প্রদায়িক। সেজন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা

তাঁকে ঘৃণা করবে এটাই স্বাভাবিক | এছাড়া নজরুলকে নিয়ে উপমহাদেশের সবাই রাজনীতির ফায়দা লুটেছেন একথা সকলে ভালভাবেই জানেন | নজরুলকে গালি দিতে পারলে হয়তো এখনও কিছু মানুষের লাভ হয় | রাজনীতিতে 'নজরুল কার্ড' এখনও বেশ কার্যকর |

মোদ্দা কথা এই যে, যেহেতু মানুষটি কাজী নজরুল ইসলাম, তাই তিনি কোন অপরাধ না করলেও তিনি অপরাধী, যতক্ষণ না প্রমাণ করতে পারছেন যে তিনি নিরপরাধ | অথচ পৃথিবীর সর্বত্র আইন শাস্ত্রের একটি প্রধান ধারা এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষকে অপরাধী হিসাবে প্রমাণিত করা যায় না, ততক্ষণ সে নিরপরাধ | সেক্ষেত্রে প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারীর | নজরুলের ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো | অভিযোগকারীরা অপরাধ নাকচ করার দায়িত্ব দিয়েছেন নজরুল পক্ষের ওপরে | আইনের ভাষায় যাকে বলে, 'প্রমাণের দায়িত্ব' (Burden of proof) | নজরুলের ওপর এবং নজরুল সমর্থকদের ওপর আজ এই দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্রমাণ করতে হবে নজরুলের সিফিলিস হয়নি | যদি আমরা তা না পারি, তাহলে নজরুলের অসুখটা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই 'সিফিলিস'|

উনিশ'শ তেতাল্লিশ সালে এইভাবে নজরুলকে বিনা বিচারে প্রাণদন্ড দেওয়া হয়েছিল | তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল | সেই অভিযোগ থেকে তিনি আজও মুক্তি পাননি | বহু মানুষের মনের মধ্যে তিনি আজও অপরাধী | আমাদের দায়িত্ব এই অপবাদ, অপমান থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আনা |

*****

(১) বেটোভেন যেভাবে বধির হয়ে যান এবং তারপরও যেভাবে সর্বকালের সেরা সব সঙ্গীত সৃষ্টি করেন | উইলিয়াম মার্কোয়েজ, বিবিসি নিউজ মান্ডু | ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ |
https://www.bbc.com/bengali/news-55326784
downloaded on Feb 6, 2022

(২) নজরুল – অজানা কথা | জিয়াদ আলী | প্রকাশক – আহমেদ মাহমুদুল হক, মাওলা ব্রাদার্স | ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, বাংলাদেশ | প্রথম মাওলা ব্রাদার সংস্করণ – ফেব্রুয়ারি ২০০৮ | দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৬ |

ওয়াহ জিন্দগি

অলোক কুমার চক্রবর্তী

জীবনের প্রতিটি পরতেই অনুভব করি – আহা! এই জন্যই তো বেঁচে থাকা! নইলে কি স্রষ্টার এই মহিমা পারতাম অনুভব করতে? মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরাও তো বহুবার হয়েছে | মনে হয়েছে, আমাকে যে বাঁচতে হবেই! এই বিশাল সৃষ্টির কত কিছুই এখনো বাকি রয়ে গেছে দেখার, তার স্বাদ নেওয়ার | জীবন তো রয়েছে এসবের মধ্যেই! এইসব অগুনতির মধ্যে একটির কথা বলি |

১৯৭৮ মার্চ | ওড়িশার কেওঞ্ঝড় জেলার গহন অরণ্যে ঢাকা প্রত্যন্ত এলাকা শিলজোড়া | হাজার দুয়েক ফুট উঁচু এক পাহাড়ের মাথায় ক্যাম্প | শাল, মহুয়া, পিয়াশাল, হরিতকি, বয়ড়া, কুসুম, অর্জুন, গামার ইত্যাদি বড় গাছের সঙ্গে চিহড়, কুর্চি, সোনা, অনন্ত ইত্যাদি লতার ঘন সবুজে মোড়া | Geological Survey of India (GSI) থেকে ক'মাস আগেই MECL (Mineral Exploration Corporation Ltd.)-এ এসেছি সার্ভিস ট্রান্সফার হয়ে | এখানেই ১৯৭৬ থেকে আছি GSI-এর কাজে | MECL-এও একই কাজ – Bonai-Keonjhar Basin-এ ম্যাঙ্গানিজ আকরের সুলুক সন্ধান ও তার ভাণ্ডার পরিমাপন | বাস করি তাঁবুতে | আমি সঙ্গ পেয়েছি GSI-এর কমলেশ পাল-দার | অসম্ভব শক্তিশালী, জেদি কবি (এখনও ৮৮ বছর বয়সে ডায়ালিসিসে থেকেও তাঁর কথা ও কবিতার তেজ একটুও কমেনি | তাঁর ১৩টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, গুণমুগ্ধ মহলে চাহিদা এতটাই) | কমলেশদার জেদ, নামী পত্রিকায় তাঁর কবিতা দেবেন না | আজও দেননি শুধু নয়, নামী সম্পাদকের পকেট থেকে কবিতা জোর করে ফেরৎ নিয়েছেন এমন ঘটনাও আছে | নানা বিষয়ে আমাদের দুজনের মতের বেশ মিল পাই | দুজনের মেলে দারুণ!

আমার পরিচিতজনেরা সস্নেহে বলেন আমার নাকি শিরা-উপশিরায় রক্তের বদলে শাল-মহুয়া-পিয়াল-পলাশ-গামার-চিহড়-কুর্চি এরা বয়ে চলে | কাজটুকু বাদ দিয়ে ওদের মধ্যেই ঘুরে বেড়িয়ে, আঘ্রাণ, আস্বাদনে আমার দিনরাত কেটে যায় | কমলেশদাকে পেয়ে জুটি হ'ল জোরালো | দুজনে এলোপাতাড়ি ঘুরি, রাত জেগে লণ্ঠনের আলোয় তাঁবুতে বসে

কমলেশদার নতুন নতুন কবিতাকে জন্ম নিয়ে চোখ মেলতে দেখি | দুজনের তর্কে কিছু কাটাছেঁড়াও হয় | জীবন তো এখানেই, আবার কোথায়? প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ে বেঁচে থাকি |

একদিন কমলেশদাকে ধরলাম, "চলুন হাণ্ডিভাঙা ঝর্না দেখে আসি |"

- "সেটা কোথায়?"

- "সঠিক জানি না | এই পাহাড় থেকে পেছন দিক দিয়ে নেমে নীচের ভ্যালি পেরিয়ে ওপাশের পাহাড়ের গায়ে কোথাও হবে | কেউ ঠিক বলতে পারছে না | চলুন, খুঁজে বার করব |"

পরদিন রবিবার সকাল সকাল পরোটা, আলুভাজা, ডিমসেদ্ধ, গুড়, জলের বোতল, সঞ্চয়িতা, কবিতার খাতা নিয়ে রওনা হলাম | শিলজোড়া পাহাড়ের মাথার সমতল বা প্ল্যাটো ধরে দু'পাশের পনসগুড়া, চম্পা, কালামুণ্ডা ইত্যাদি অনেকগুলো চালু বা পরিত্যক্ত খাদান পেরিয়ে চললাম | অনেকটা এসে নুড়িপাথরে ভরা খাড়া উৎরাই বেয়ে খুব সাবধানে নীচের ভ্যালিতে নামতেই অনেকটা সময় চলে গেল | এবড়োখেবড়ো প্রান্তর দিয়ে চলছি | উপত্যকা মাঝে রেখে বেশ কিছুটা দূর দিয়ে চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে পাহাড়ের দেওয়াল | কোন পাহাড়ের দিকে গেলে ঝর্না পাব জানি না | বললাম, "ওই যে শেষ মাথায় কালচে সবুজ রেখাটা দেখা যাচ্ছে, ওটাই হাণ্ডিভাঙা নালা হবে | নালা ধরে গাছপালা হয়েছে | ওটা ধরেই ঝর্নার খোঁজ পাব নিশ্চিত |"

- "কিন্তু, এক তো ওই গাছের রেখা বহুদূর | আর ওটা কিছুটা গিয়ে কয়েকটা ভাগ হয়েছে | তার মানে, কয়েকটা স্রোত আছে | ঝর্না কোনটাতে?" – কমলেশদার শঙ্কা |

আমি জবাব দিই, "জানি না | কপাল ঠুকে এগোব, গন্ধ শুঁকে বার করব | চলুন তো!"

হঠাৎ এক সুতীব্র "কেঁও কেঁও" চিৎকার প্রায় রুক্ষ উপত্যকার নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে চারিদিকের পাহাড়ি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল | আমরা কেঁপে উঠলাম | ময়ূরের ডাক! আছে চারপাশ ঘিরে থাকা জঙ্গলের মধ্যে কোথাও! রোদ ক্রমশ চড়ছে, আমরা চলেছি বিনা ঠিকানায় | মাঝে মাঝেই ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি | ওটাই যা বৈচিত্র্য | দীর্ঘ সময় ধরে ন্যাড়া প্রান্তর পার করে পৌঁছালাম দূর থেকে দেখা সেই গাছের সারির কালচে রেখার ধারে | তার ওপাশ থেকেই উপত্যকা শেষ হয়ে আবার পাহাড় উঠেছে | সূর্য মাথার ওপর গনগনে, এতক্ষণে একটু ছায়া পাওয়া গেল | কিন্তু কমলেশদা শঙ্কিত কণ্ঠে জানালেন, "অলোকবাবু, জল কিন্তু প্রায় শেষ |"

এই ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে বার বার জল না খেয়ে থাকাও যাচ্ছিল না | কিছু করার নেই | এখানে বড় বড় নুড়ি পাথরের আড়াল দিয়ে তিরতির বয়ে চলা জলের আভাস; কাব্যিক দেখালেও কিন্তু ওই খোলা জল মুখে দিলে বাঁচা যাবে না | ম্যালেরিয়ার আর আরও নানা রোগের খনি যে এইসব এলাকা! অগত্যা –

- "চলুন, এগোই |"

- "এরপর?"

- "দেখা যাক |"

এবার পথ আরো বন্ধুর | আমরা সেই গাছের রাশি, জলের সোঁতা আর ঢালু নুড়িপথ ধরে বাঁদিকে ঘুরলাম | ডানদিকে খাড়া পাহাড় | নুড়িগুলো স্বাভাবিকভাবেই এদিকে ঢালু হয়ে নেমেছে বর্ষার জলে ভেসে | ঢালু পথে আড়াআড়ি যেতে হচ্ছে | ডান পা উঁচুতে, বাঁ পা নীচের দিকে | বেঁকে চলতে চলতে কোমরে, পায়ে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে |

কমলেশদা বিরক্ত, "জল নেই একফোঁটা, হাঁটাও যাচ্ছে না | চলুন, ক্যাম্পে ফিরি |"

- "কমলেশদা, চলা তো সামনের দিকেই হয় | চলুন, ওই ঝর্না ছুঁয়ে ক্যাম্পের দিকে এগোব |"

একটা বুনো দুর্গন্ধ পাচ্ছিলাম এদিকটায় এসে থেকে | ধরনটা আমার চেনা | তবু কিছুটা হঠকারিতা করে খানিক এগোতেই আন্দাজ সত্যি হ'ল | ডাইনে পাহাড়ের গায়ে এক গুহা, ভালুকের – ওটাই দুর্গন্ধের উৎস | ভেতরে গোটা তিনেক কালো তুলতুলে ছানা | মা ভালুককে দেখতে পেলাম না | হয়তো খাবারের সন্ধানে গেছে বা বেশি ভেতরে আছে | জানি না | নিমেষে কমলেশদাকে নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে নালা ও গাছপালা পেরিয়ে আবার নালা পেরিয়ে ওপারে | ওপাশ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে আবার এপারে এলাম | জলের ধারা ধরে চলতে চলতে একসময় দ্বিধায় পড়লাম | জলধারাটি বাঁদিকে ঝোঁক রেখে যেভাবে চলেছে, তাতে কাছাকাছি ঝর্নার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না | কিন্তু আমার মন বলছে কাছেই আছে | খেয়াল করলাম, এদিকে পাথরের আকৃতি প্রায় গোলাকার ও বড় | আমি

'ইনট্যুইশন'-কে খুব গুরুত্ব দিই | কমলেশদা সাধারণত এত অবুঝপনা করেন না, কিন্তু এখন আবার বললেন, "অলোকবাবু, এতটা তো হ'ল, এবার চলুন ফিরি |"

আমি জবাব না দিয়ে খুব নিবিষ্টমনে এপাশ ওপাশ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখি ওই বড় বড় পাথরের তলা দিয়ে যেন খুব লুকিয়ে চার-পাঁচটা সোঁতা ডানদিক থেকে নেমে আসছে | দ্রুত ডানদিকের ঝোপঝাড় সরিয়ে তেরছাভাবে খানিকটা চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতেই একটা গুমগুম ও ঝরঝর মেশানো শব্দ পেলাম, যেন এক অমোঘ মন্ত্রোচ্চারণের – নিরন্তর ঝরে চলা নির্ঝরের গুরুগম্ভীর মন্দ্রস্বরে সুরালাপ যেন! মন্ত্রমুগ্ধ কমলেশদা! স্তব্ধ আমি! একটু এগোতেই অপরূপ মোহময় দৃশ্য – কালচে সবুজ চাপ বাঁধা আঁধারিতে যেন এক ঐশ্বরিক আলোর জ্যোতি – গাঢ় সবুজ জলে ভরা বিশাল এক কুণ্ড, তার ওপারে মোহময় সাদা কুয়াশার মতো বিশাল ঝর্না ঝরে চলেছে অবিরাম | চারিদিকের দেওয়াল জাপটে রেখেছে নাম না জানা গাছপালা, লতা, শিকড় | অতিকায় এক ঢাকনা খোলা হাঁড়ি যেন সোজা বসানো আছে, আর তার একটা দিক কেউ লম্বালম্বি ভেঙে দিয়েছে | সেখান দিয়ে পবিত্র আশীর্বাদ ধারা নিরন্তর বয়ে চলেছে সকলের তৃষ্ণা তৃপ্ত করতে, প্রাণের সঞ্চার করতে | নির্বাক, নিশ্চল, ধ্যানস্থ দুটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ, সেই নির্ঝরের জলবিন্দু রেণু রেণু হয়ে তাদের দিয়ে যাচ্ছে আশীর্বাণীর পরশ, অন্তর বাহির সিক্ত হয়ে উঠছে তাদের |

"...উধাও জল, স্তব্ধ দুটি লোক,
হাতের কাছে সঞ্চয়িতা খোলা |"

(ওখানে বসে লেখা কবিতার শেষ দুটি লাইন)

এরপরে আর কোথায় খুঁজব জীবন!

সেই রাতে কমলেশদার কলমে সৃষ্ট হ'ল, তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত (২০১৯) ও নিঃশেষিত "কবিতা সংকলন" গ্রন্থে স্থান পাওয়া কবিতা "আছে":

আছে
কমলেশ পাল

অলোক আমার গাইড
দুজনে ট্রেকিং করছি প্রাণান্ত খাড়াই |
আমি আর পারছি না | বললাম: অলোক
চলো ক্যাম্পে ফিরে যাই |
অলোক ঈষৎ হাসল: এ জীবনে ফেরা কি সম্ভব?
হয়তো অ্যাবাউট-টার্ন
করে সেই এগোনোই হবে |

– রসিকতা! তেতো লাগছে |
মারা যাচ্ছি তোমার ভুলেই |
ওয়াটার-বটল্ এম্পটি! এই দ্যাখো
ছিন্নমস্তা পিপাসাতে
ঢেলে যাচ্ছি অগ্নিধারা – নেই নেই নেই!

সহসা নজরে এল,
একটি হরিণপথ চলে যাচ্ছে
কোনো এক জলঝর্না করুণার কাছে...

আমি চুপ |
অলোক স্বগত বলল: আছে |

****

(প্রসঙ্গত, এই কাহিনীটির পুরোটাই সত্য ঘটনা | দু'বছর আগে লেখা | দুর্ভাগ্যজনকভাবে কবি কমলেশ পাল গত ১৪ই এপ্রিল, ২০২৩, তাঁর অগুনতি গুণমুগ্ধ পাঠককুল ও স্নেহভাজনদের এবং তাঁর রচনাভাণ্ডার রেখে পাড়ি দিয়েছেন না ফেরার দেশে |)

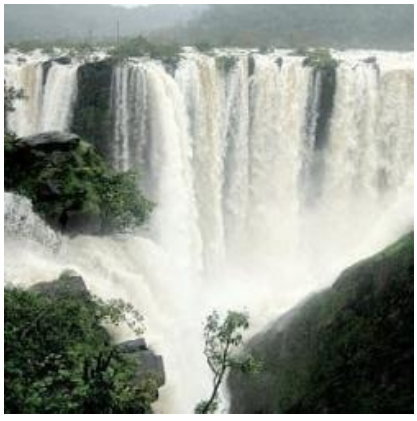

হাণ্ডিভাঙা ঝর্না
কেওঞ্ঝড়, ওড়িশা

ব্যতিক্রমী

দেবব্রত তরফদার

ফজর আলীর জন্ম মোরগ ডাকা ভোরে | বিকেল থেকে তার মা আসমানতারার প্রসব বেদনা ওঠে | শহর সন্নিকট গ্রাম জালালখালীতে আসমানতারার বাপের ভিটে | এই গ্রামের অনেকেই এখনো প্রসবের ব্যাপারে ধাইমার উপরই নির্ভরশীল কিন্তু বেদনা ওঠার দু'ঘন্টার মধ্যে কিছু না ঘটায় আসমানের বাপ হেকমত শেখ ধাইমার উপর আর ভরসা করতে না পেরে ঘোড়ার গাড়ি করে সোজা মাতৃসদন | ডাক্তার নার্সদের কাছ থেকে একচোট গালাগাল শুনতে হয় | মেয়ের বিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণনগরেই রাজবাড়ীর পাশের গড়ে | তা জামাই শুকুর আর তার বাপ বশির আলী দুজনেই ঘোড়ার গাড়ি চালায় | নিজের বাড়ি ঘরদোর আছে, আয়পয় খারাপ নয় | জামাইবাড়িতে খবর যেতেই বেয়াই বেয়ান চলে আসে হাসপাতালে | জামাই শুকুর আলী আসেনি | বউ বিয়োতে এসেছে, আর তার স্বামী এসে বসে থাকবে এ বড় লজ্জার ব্যাপার | শুকুরের আম্মা সাকিরুন বিবি একটু থেকেই ভাতপানি করতে বাড়ি চলে গেল; রাতে মেহমানদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে | যাওয়ার সময় বেয়ান আয়েশা বিবিকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যায় | দুই বেয়াই হাসপাতালের গাছতলায় বসে থাকে | রাত আটটার সময়ও কোনো খবর নেই | শুকুর তার বন্ধু প্রকাশকে নিয়ে হাসপাতালে গেলে দুই বেয়াই বাড়ি আসে | খাবার মতো অবস্থা ছিল না তাদের | একটু ভাত নাড়াচাড়া করে দুই বেয়াই উঠে পড়ে; রাতজাগা রয়েছে | তবে শুকুর আর প্রকাশ দুই বুড়োকে রাতজাগা থেকে রেহাই দেয় | খাবার পর ওরা গিয়ে বসে হাসপাতাল চত্বরে | সাকিরুন আর আয়েশা অবশ্য তাদের সঙ্গ ছাড়েনি | প্রকাশ ছিল যথেষ্ট করিতকর্মা | আর হাসপাতালের জেনারেটর অপারেটর ছেলেটা তার পরিচিত হওয়ায় ভেতরের খবর পাওয়া যাচ্ছিল সবসময় | পেশেন্টকে স্যালাইন দিয়ে রেখেছে আপাতত | রাত তিনটের সময় যখন লেবার রুমে নিয়ে গেল তখন আসমানতারা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে; চোখদুটো ঘোলাটে | শুকুর আলী বউয়ের অবস্থা দেখে দমে যায় | গাছতলায় বসে সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করে আর ভাবে কোন ফেরেস্তা এসে সেই সুখবরটি দেবে | প্রকাশ শুকুরের জিগরী দোস্ত, সেই হাফপ্যান্ট-বেলা থেকে | মিউনিসিপ্যালিটির ক্যাজুয়াল কর্মী আর একটা খাতা-পেনের দোকান আছে; বাপ-ছেলে মিলে চালায় | সব ব্যাপারেই কোচোয়ান বন্ধুটির পাশে আছে | সাকিরুনের সে আর একটি বেটা, দুজনেই রাত জাগে | বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বসে আছে পরম মমতায় | বয়স্ক দুই মহিলা একটু দূরে বসে | আল্লাকে ডাকা ছাড়া কোনো পথ নেই | ক'দিন পরে বোধহয় পুজো, পাশেই জাগৃতি ক্লাবের প্যান্ডেলের কাজ হচ্ছে রাত জেগে | চারদিক একটু ফর্সা হয়ে আসছে, শান্ত ভোরে ভেসে আসছে ঢাকের শব্দ | এরই মধ্যে নলুয়া পাড়ার কোন মুসলিম বাড়ি থেকে ভোরের জানান দেয় কোন মোরগ | আর এই সময়েই নার্সদিদি এসে জিজ্ঞেস করে আসমানতারার বাড়ির লোক আছে কিনা | ভোর চারটে পাঁচ মিনিটে সে জন্ম দিল ফুটফুটে একটি শিশুর | ফেরেশতা জিব্রাইল যেন নার্সদিদির রূপ ধারণ করে এসেছে | চারজন পড়িমরি করে ছোটে | ট্রের উপর আল্লার রসূলটি হাত পা ছোঁড়ে | নরমাল ডেলিভারি, ক্লান্ত অবসন্ন আসমানতারার মুখে অপার্থিব হাসি | সে স্বামীর দিকে তাকায় | শাশুড়িমা, প্রকাশ ভাইয়ার সামনে মাথায় ঘোমটা নেই, সে হঠাৎ লজ্জা পায় |

প্রকাশ আর শুকুর বাইরে আসে | প্রকাশ বলে, "বোধহয় শুভক্ষণেই জন্ম হ'ল তোর ছেলের, দেখিস একটা কেউকেটা হবে তোর ব্যাটা |"

শুকুর হাসে | এখন ফজরের নামাজের সময়, প্রকাশ একটু দূরে দাঁড়ায় | হাসপাতালের শিউলি গাছের নিচটা ফুলে ফুলে সাদা, ফুলের বিছানা শুকুরের জায়নামাজের কাজ করে | ফজরের নামাজে বসে শুকুর, তার মাথায় ঝরে পড়ে শিউলি | আকাশে ফেরেস্তাদের জমায়েত | চারদিক আলো করে জন্ম হ'ল ফজর আলীর |

ফজর বড় হয় | কালো রোগা চেহারা, দাদা বশিরের মত রঙ পেয়েছে | তেল মাখাতে মাখাতে সাকিরুন গজগজ করে | কিন্তু চোখ, নাক মায়ের মতো সুন্দর | পা পা হাঁটতে শেখে | একদমই দুরন্ত নয়, কান্নার শব্দ শোনা যায় না | বাড়িতে একটা বাচ্চা আছে বোঝাও যায় না | ফজর স্কুলে ভর্তি হয় | তার ছুন্নত দেওয়া হয় ধুমধাম করে |

ট্রলি, ভ্যানের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা কমতে থাকে, পরিবারের আয় কমে যায় | এখন আর

একটি ঘোড়াও নেই | শুকুর ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে ধরে নবদ্বীপ ঘাট, কৃষ্ণনগর স্টেশনের একটি অটো পারমিট বার করে একখানা অটো নামিয়েছে | আর তার আব্বা জালালখালীর বেয়াইয়ের সঙ্গে সব্জির ব্যবসা করে | এইসব করেই চলে যাচ্ছে কোনরকমে |

ফজর আলী ভর্তি হয়েছে এ ভি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে | লেখাপড়ায় মোটামুটি, পাস করে যাচ্ছে | তার হাতের লেখা দুর্দান্ত, আর ছবিও আঁকে দারুন | বইয়ের ছবিগুলি খাতায় আঁকে সেই শিশুবিভাগ থেকেই | একটু দূরেই আঁকার শিক্ষক আছেন রুস্তম স্যার, তাদের ক্লাসের অনেকেই শেখে | ফজর মায়ের কাছে বায়না ধরে, সে আঁকা শিখতে চায় | আর শুকুর আলী ভর্তি করে দেয় রুস্তম স্যারের কাছে | প্রতি রবিবার ক্লাস, একগাদা ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নিজের ছেলেকে যেন খুঁজেই পায় না শুকুর | পরে দেখে এককোণে তন্ময় হয়ে আঁকছে কোনদিকেই খেয়াল নেই | রুস্তম স্যার বার বার তার খাতা চাইলেও সেদিকে কানই নেই ফজরের | শুকুর রেগে যায় ছেলের বেয়াদপিতে | সে বকে ওঠে | স্যার শুকুরকে বলেন, "বকিস না শুকুর, তোর ঘরে বোধহয় জাতশিল্পী এসেছে | কিছুতেই খাতায় পেন্সিল ছোঁয়াতে দেবে না, শুধু বলবে , স্যার, আপনি দেখিয়ে দিন, আমি আঁকছি |"

- "খালি সারাদিন আঁকাজোকা, পড়ায় মন নেই |" শুকুর গজগজ করে |

- "কেন, আঁকা খারাপ নাকি? তোর ছেলে দেখবি অনেককেই ছাপিয়ে যাবে, ওর যা সেন্স!" স্যার বলেন |

- "আর তারপর টিউশনি করে খেতে হবে সারাজীবন |"

স্যার খোঁচাটা হজম করে বলেন, "আমি তো আর্ট কলেজে চান্স পেয়েও পড়তে পারলাম না |"

- "আর আমার মতো অটোচালক কী করে পড়াবে?" শুকুরের দীর্ঘশ্বাস পড়ে |

ক্লাস থ্রীতে স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ফজর আলী ফার্স্ট হয় | ছবিটি ছিল মা সরস্বতী হাঁসের পিঠে চেপে মেঘের দেশে পাড়ি দিয়েছেন | জাজমেন্টে যিনি ছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র, এবং ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ | ছোট্ট শিশুটিকে দেখে বিশ্বাসই হয় না এটা ওর আঁকা | সরস্বতী পুজোতে ছবিগুলো টাঙানো ছিল, মতামত লেখার খাতা ভরে যায় ফরজের প্রশংসায় |

এর মধ্যে বশিরের গন্ডগোল হয়ে যায় তার প্রতিবেশী চাচাতো ভাই, ওসমানের সঙ্গে | সে বেচারিও ঘোড়ার গাড়ি চালাত | ট্রলি, ভ্যান চালু হওয়ায় তার ভাড়া কমে যায় আর হঠাৎ তার ঘোড়াটি মারা যায় | বেসামাল হয়ে পড়ে ওসমান তার ছেলেপুলে নিয়ে | ঘোড়ার গাড়িটিও বিক্রি করতে পারে না ক্রেতার অভাবে | ট্রলি ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছে | বয়স বাড়ছে; প্রতিদিন ঠিকমতো ভাড়া হয় না | চরম ধর্মপ্রাণ মানুষটি শেষ বয়সে মদ ধরেছে | রাতে এসে গালাগালি করে | যেদিন সে বউয়ের উপর হাত তুলল, সেদিন আর বশির ঠিক থাকতে পারেনি দু'ঘা বসিয়ে দিল ছোট চাচাতো ভাইকে | আর রাতের বেলায় খিস্তি গালাগালির ঝড় উঠল | শুকুরও তার বাপকে বকাবকি করল যথেষ্ট | এখন ব্যাপারটা থম মেরে আছে | তবে ওসমানের সঙ্গে বাক্যালাপ নেই | মদটদ খেলে ঠেস মেরে কথা বলে |

ইতিমধ্যে একটি বোন হয়েছে ফজরের | চার বছরের নাদিয়া সারাবাড়ি দৌড়ে বেড়ায়, ভীষণ চঞ্চল | বইটই ছেঁড়ে, অনেক ছবিও নষ্ট করেছে ভাইয়ার | ফজর কিছুই বলে না, বোনকে খুব ভালবাসে | তবে অনেকদিনই হ'ল বোনটি তার মাকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে | বোন হবার পরে সে তার দাদা-দাদির মাঝখানে শোয় | এ নিয়ে তার একটু দুঃখ আছে, কিন্তু অভিযোগ নেই | তবে শান্ত চুপচাপ ছেলেটির কিছু মনের কথা হয় তার দাদার সঙ্গে | বশির আলীকে অনেক কিছুই জিজ্ঞেস করে সে | যেমন – ফেরেশতারা রাতের আকাশে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু মানুষ তাদের দেখতে পায় না কেন? আবার কখনো তার প্রশ্ন – " দাদা, আল্লা কেমন দেখতে?"

দাদা তল খুঁজে পায় না এই প্রশ্নের | বলে, "ভাইজান, আল্লা নিরাকার | তিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন |"

- "আমি আল্লার ছবি আঁকব, কিন্তু কোনো ছবি পাচ্ছি না |"

সাকিরুনের বুক কেঁপে ওঠে, ইবলিশ ভর করেছে ছেলেটার উপর | নাতিকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, "ওকথা বলতে নেই ভাইজান, গুনাহ হবে |"

- "কেন, বন্ধুদের বাড়িতে কত ঠাকুরের ছবি, কত ঠাকুরের মূর্তি | আর আমাদের বাড়িতে আল্লা লেখা একটা ফটো |"

এই ছোট্ট শিশুটিকে বশির কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না |

ফজর বলেই চলে, "আচ্ছা দাদা, আল্লা কি শিবঠাকুরের মতো? আমি যতবারই আল্লার ছবির কথা ভাবি তখনই আমার বন্ধু প্রসূনদের ঘরে টাঙানো শিবঠাকুরের মুখ মনে পড়ে। আচ্ছা দাদা, আল্লা বড় না শিবঠাকুর?"

সাকিরুন বিরক্ত হবার ভান করে বলে, "তুই কি আমাদের ঘুমোতে দিবিনে? আয়, কাছে সরে আয়, মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।" কিন্তু তার বুক কাঁপে, আবার কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়!

পরে আর একদিন ফজর মাকে বলে, "আম্মা, আমার বোনটা বড় হলে ঠিক সরস্বতী ঠাকুরের মতো হবে।"

- "তোকে কে বলল?" মা একটু বিরক্ত।

- "আমার তো তাই মনে হয়। স্কুলে যে ছবিটা আঁকলাম তার মুখটা তো নাদিয়ার মতোই।"

আসমানতারা ভাবে, কী বলছে ইবলিশের বাচ্চাটা! বোনের মুখ আঁকে ঠাকুরের মুখের সঙ্গে! আল্লার কোপে পড়বে কি তার মেয়ে! দুমদাম বসিয়ে দেয় ঘা'কতক। মার খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ছেলেটা। কাঁদতেও ভুলে যায়। সাকিরুন বিবিও বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। আসমানতারা চিৎকার করেই চলে, "মোচলমানের ছেলে ঠাকুরের ছবি আঁকে, সব্বোনাশ হবে সংসারের।"

- "কেন? রুস্তমচাচাও তো আঁকে।" ফজর বলে।

- "রুস্তম চাচা শিখেছ! সে তো মোচলমানের জাত নয়। নামাজ পড়ে না, মসজিদে যায় না, তাকে গুরু মেনেছ? আবার মুখে মুখে চোপা!"

- "কেন অনেক মুসলমান শিল্পী তো ঠাকুরের ছবি আঁকে, চাচা আমাকে দেখিয়েছে।" ফজর এবার মরিয়া।

- "দেখবি হারামজাদা, আবার মুখে মুখে কথা!" সে হাত তোলে ছেলের উপর। ফজর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। তার দাদি ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে, কিন্তু শান্ত ছেলেটি গোঁ ধরে বসে থাকে। ছোট্ট শিশুটিও মা'র রঙ্গিনী ভঙ্গি দেখে চুপচাপ, ভাইয়াকে মার খেতে দেখে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

- "দাঁড়া তোর আব্বা আসুক, তোর আটিস হওয়া ঘোচাচ্ছি।"

দুপুরবেলা বাপছেলে বাড়ি ফিরে খেতে বসে। থমথমে ভাব দেখে বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে। সব বৃত্তান্ত শুনে হাসে শুকুর আলী। সে চিরকাল হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে মিশেছে, প্রসাদ খেয়েছে, আনন্দ করেছে পুজোতে। ভাবে গ্রামের মেয়েছেলে, গ্রামে হিন্দু ছিল না তাই মনের মধ্যে তার একগাদা সংস্কার। কিন্তু সংসারে অশান্তির ভয়ে মুখে কিছু বলে না। বলে তার বাপ বশির, "বৌমা রাগঝাল করো না। ফজর নেহাত পোলাপান, রংতুলি নিয়ে একটু খেলা করে আরকি।"

আসমানতারা শ্বশুরের মুখের উপর কিছু বলে না, সেটা শোভন নয়। বশির ফজরকে কাছে টানতেই সে দাদার কোলে কান্নায় ভেঙে পড়ে, "দাদা, মা বলেছে আর আঁকতে দেবে না। রংতুলি সব উনুনে দেবে।"

- "দূর বোকা, এসব রাগের কথা, মা'র মাথা ঠান্ডা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।" বশির অভয় দেয় নাতিকে। তারপর একটু জোর গলায় বলে, "গাছপালা, ফুল-পাখি আঁকো, কিন্তু ঠাকুর দেবতার ছবি একেবারে বন্ধ।" তার চোখ কিন্তু প্রশ্রয়ের হাসি হাসে।

ফজরের ক্লাস ফোর। তার বাড়ি থেকে একটু দূরে পালপাড়া। দুর্গাপুজোর আগে লুকিয়ে দেখে এসেছে পালদের ঠাকুর গড়া। নজর এড়ায় না কোনো খুঁটিনাটির। দুর্গাপুজো চলে যায়, কৃষ্ণনগরে এর কোনো ধুমধাম নেই। কালীপুজোও কেটে যায়। আর এরপরেই আসে কৃষ্ণনগরের সবচেয়ে বড় উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজা। প্রতিটি বারোয়ারীতেই ঠাকুর বানানো হয়। এখানকার নুড়ি পাড়ার পুজোটি চারদিনের, দুর্গাপুজোর মতো। তাই এদের কাঠামো, বিচুলি বাধা একটু আগেই শুরু হয়। এই পাড়ার মাঠ ফজরদের খেলার জায়গা। যেদিন থেকে পালমশাই ঢুকেছে সেদিন থেকেই খেলা বন্ধ। হঠাৎই কাঠামো বাঁধা দেখতে দেখতে শুভ বলে, "চল আমরা একটা পুজো করি।"

সবাই অবাক – বলে কী ছেলেটা! উৎসাহ নিয়ে সবাই বসে এক জায়গায়। কমল বলে, "অনেক খরচ ভাই, টাকা পাব কোথায়?"

শুভ চরম উৎসাহী, "কেন, আমাদের পালমশাই আছে। সে ফজরের দিকে আঙ্গুল তোলে। কিরে পারবি না ভাই?"

ফজরের চোখে ঘোর, বলে কি এরা! সে ঘাড় কাত করে। তখনই বারোয়ারীর ফেলে দেওয়া কাবারি দড়ি বিচুলি কুড়িয়ে নেয়। চরম উত্তেজনা ফজরের, রাতের পড়াশোনা ডকে ওঠে। পরদিন থেকেই বড় ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে অন্য জায়গায় ছোট ঠাকুর গড়ে উঠতে থাকে। সিংহটি করার সময় একটু ঝামেলা হয়। আলোক পাল বেশ নামী শিল্পী। সে বুঝতে পারে ছোটরা কিছু একটা

করছে, তার একটু প্রশ্রয়ও থাকে | পরিত্যক্ত চুল, সিংহের কেশর চুমকির সাজ দিয়ে ফজরের জগদ্ধাত্রী সেজে ওঠে | পঞ্চমীর দিন চক্ষুদান করে আলোক পাল | সাজটাজ পরিয়ে বিদায় নেবার সময় হঠাৎ মনে হয় বাচ্চাগুলোর কথা | খোঁজ নিয়ে দেখে একটু দূরে শুভদের বাড়িতে বানানো হচ্ছে ঠাকুর | সেখানে গিয়ে আলোক পাল থ! কী করেছে বাচ্চারা! তার তৈরি ঠাকুরের ছোট সংস্করণ প্রায় নিখুঁতই বলা যায় | ছোট প্রতিমা বানাতে মুন্সিয়ানা লাগে, হাত পা আঙুলের মাপ নিখুঁত |

- "কে বানিয়েছিস?" আলোকের জিজ্ঞাস্য |

- "ও বানিয়েছে |" শুভ ফজরকে দেখিয়ে দেয় |

- "নাম কিরে তোর?"

- "ফজর আলী |"

আলোক আশ্চর্য হলেও মুখে প্রকাশ করে না | বাচ্চাটিকে কাছে টেনে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলে, "তোর ইনাম | খোদার হাত আছে তোর মাথায়, তুই অনেক দূর যাবি |"

পুরস্কারের পঞ্চাশ টাকায় তাদের পুজো উৎরে যায় | মায়ের শাড়ির প্যান্ডেল আর টুনি বাল্বে ঝোপের মধ্যে সেজে ওঠে তাদের প্রতিমা | ফজর ভয়ে ভয়ে থাকে | পথচলতি অনেক দর্শনার্থীকে তাদের ছেলেমানুষি মুগ্ধ করেছে | মায়ের কানে পৌঁছালে মুশকিল | কিন্তু বুঝতে পারে বাপ-দাদা সবাই জেনে গেছে |

শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে যায় ফজর তার বাপ-দাদার সঙ্গে | নামাজ পড়ার পর খুতবা দেওয়া হয় | খুতবার অর্থ হ'ল সমসাময়িক কোন বিষয় কোরানের আলোকে দিক নির্দেশিত করা | খুতবার পর জলিল | যে এখনকার উঠতি বড়লোক, আগে টিকিট ব্ল্যাক করত, এখন জমি কেনাবেচার ব্যবসা করে, নিজেকে কেউকেটা ভাবে এবং কিছু চামচা পরিবেষ্টিত হয়ে ঘুরে বেড়ায় | সে হঠাৎ বলে, "ইমাম সাহেব, আপনাকে একটা বিচার করতে হবে |"

ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় |

- "আমাদের ধর্মে মূর্তি গড়া গুনাহ | আর এই শুকুরের ছেলে ইবলিশের দোসর, ঠাকুর তৈরি করে, পুজো করে | এর বিচার করুন |"

- "শুকুরের ছেলে কোনটি?" ইমামের জিজ্ঞাস্য |

ছোট বালকটিকে দেখে তিনি অবাক হন | কাছে ডেকে আদর করে বলেন, "বাপজান তুমি ঠাকুর তৈরি করো?"

ফজর ভয়ে দাদার কাছে সরে আসে, 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ে |

- "বাপজান, আমাদের ধর্মে মূর্তি গড়া গুনাহ | তুমি আর ওসব করবে না |"

পিছন থেকে তীক্ষ্ণ একটি চিৎকার আসে, "ইমাম সাহেব বিচার ঠিক হ'ল না |"

সবাই তাকিয়ে দেখে ট্রলিওয়ালা ওসমান, ফজরের বাবার চাচা, অনেকদিন বশিরের সঙ্গে কথা বন্ধ |

- "আপনি ওই ছোট্ট অবোধ শিশুকে কী বললেন? ওর পাপ-পুণ্য বোধ আছে? আমরা যে ট্রলিতে ঠাকুর বই, রাজমিস্ত্রি, রঙমিস্ত্রিরা মন্দিরে কাজ করে, তার বিচার করবে কোন খোদা? ইমাম সাহেব, সবচেয়ে বড় ধর্ম পেট, খিদে পেলে সব ধর্ম ইয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় |"

জলিল কিছু বলার জন্য উসখুস করতেই ওসমান মারমুখী, "চুপ কর ব্যাটা, আমার নাতিকে ইবলিশ বলিস, তুই যখন টিকিট ব্ল্যাক করতিস, যখন মদ খাস, মাগীবাড়ি যাস তখন গুনাহ হয় না? হাদিসে এইসব করতে বলেছে বোধহয় | আমার নাতিকে কিছু বলে দ্যাখ, মসজিদে রক্তপাত হবে | বেশ করবে, ঠাকুর গড়বে, দেখি কী করে কোন বাপের ব্যাটা |"

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো চুপসে যায় জলিল | তারপর ওসমান ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, "মাপ করবেন সাহেব, আমি মুখ্যু, মাতাল মানুষ, নরকের কীট জানি; মুসলিম মানে ইমানদার | মানুষ বাঁচার জন্য কী না করে!" এগিয়ে আসে বশিরের দিকে, "ভাইজান, ক্ষমা করো মাতাল ভাইটিকে, অভাবী মানুষ, মাথার ঠিক থাকে না | তবে নাতির হাতের কাজটি দেখেছ? এতটুকু ছেলে – আল্লার রহমত না থাকলে এই কাজ করতে পারে?" তারপর ফজরকে কোলে টেনে নিয়ে বলে, "দাদাজান, খুব ভাল করে পড়াশোনা করো, আর ছবি আঁকো, আল্লা তোমার সঙ্গে থাকুক |"

বাড়ি ফেরার পথে বশির ওসমানকে বলে, "হ্যাঁরে, মাসুদ এখন কী করে?"

- "কী আর করবে; খায়দায়, ঘুরে বেড়ায় | ব্যবসা করবে বলে টাকা চায় | কোথায় পাব বলো?"

- "কাল ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস – সঙ্গে জোয়ান একটা ছেলে থাকলে ভাল হয় | বেয়াই বলছিল তাহলে

কলকাতা মার্কেটটা ধরা যাবে।" দুপুরে খেতে বসে বশিরের মনে হয় ঈদের মতো খুশির দিন এটা।

ক্লাস সিক্সে ওঠে ফজর। রেজাল্ট তার ভাল হয়নি। আসমানতারা একটিও কথা বলে না ছেলের সঙ্গে। ফজর কী করবে, পড়তে তার ভাল লাগে না। পড়তে বসলে তার ছবিতে পায়, খাতার পাশে লুকিয়ে আঁকে, বোনকে এটা ওটা বানিয়ে দেয়। আসমানতারা একা একাই কাঁদে। তার একটাই ছেলে, এত ভাল। ছোটবেলা থেকে কোনো যন্ত্রণা দেয়নি। কিন্তু এখন কী হ'ল তার ছেলের!

ক্লাস সিক্সের সরস্বতী পুজোতে স্কুল সাজানোয় প্রধান ভূমিকা নিল ফজর। তার দু'বছর পর স্কুল তাকে ঠাকুর তৈরির দায়িত্ব দিয়ে সাহস দেখায়। খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে সান্ত্বনা পুরস্কার পায় শহরে। প্রাইজের ট্রোফি নিয়ে ফজর বোনের হাতে দেয়। বাড়িতে খুশির আমেজ। ওসমান এসে বাড়ি সরগরম করে তোলে। শুভরাও এসেছে সব দলবেঁধে। আবদার করে আসমানতারার কাছে – "মিষ্টি খাওয়াতে হবে কাকিমা।"

নাদিয়া তার মাকে ট্রোফিটা দেখাতে যায়, "দেখো মা, সরস্বতী ঠাকুর কী সুন্দর!"

আসমানতারা হঠাৎ মারমুখী হয়ে ওঠে মেয়ের উপর, "লেখাপড়া নেই তোর, প্রাইজে পেট ভরবে?"

পরিবেশটা বেমানান হয়ে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যায়। শুকুর আলী বউকে বলে, "ছেলেগুলো আবদার করেছিল। তুমি এমনটা নাও করতে পারতে। দেখো তো, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলল।"

আসমানতারা বলে, "তোমরা সবাই মিলে আমার ছেলেটাকে শেষ করছ। কী হবে তার ভবিষ্যতে? মোচলমানের ছেলে ঠাকুর গড়ে খাবে। দু'বছর পর মাধ্যমিক দেবে, রেজাল্ট দিন দিন খারাপ হচ্ছে। সে নিয়ে তোমরা কিছু বলো না। আর এখন সবাই ওকে মাথায় তুলে নাচছ।"

ফজর তার মায়ের দুঃখের কারণ বুঝতে পারে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় সবকিছু ছেড়ে লেখাপড়ায় মন দেবে। কিন্তু তুলি ধরলেই সবকিছু ভুলে যায়। পালপাড়ার সুবল পাল, মহেশ পাল, তার ছেলেরা, কানাই ঘোষ, পরিমল পাল – এইসব বিশিষ্ট শিল্পীরা সবাই তাকে চিনে গেছে। সে ঘুরে ঘুরে ওদের কাজ দেখে। সবচেয়ে ভালবাসে তাকে অলোক জ্যেঠু। সময় পেলে সে অলোক পালের কারখানায় হাতে হাতে একটু সাহায্য করে দেয়। এবার দুর্গাপুজোয় অনেক কাজ অলোক পালের। বাইরের বড় বড় কাজ আছে। দু'মাস আগে থেকে অলোক পাল ফজরকে বলে, "বাপ, এবার একটু বেশি সময় দিতে হবে।"

- "পারব না জ্যেঠু, পড়া আছে স্যারেদের কাছে। সেখানে কামাই হলে মা রাগ করবে। হয়তো বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না। আমি বিকেলে খেলার সময়গুলোতে আসব জ্যেঠু।"

- "ঠিক আছে বাপ, তাই করিস।"

ফজর সময় পেলেই ছুটেছে। মহালয়া পেরিয়ে গেল, সব বড় ঠাকুরগুলো বেরিয়ে গেছে, কারখানা একদম ফাঁকা। এখন এলাকার ছোটখাটো ঠাকুরগুলো রয়েছে। ক'দিন খুব ধকল যায় সবারই, এখন একটু চাপ কম। চতুর্থীর দিন বিকেলবেলা হঠাৎই অলোক ফজরকে ডাকে, "নে ব্যাটা তুলি ধর, পাড়ার ঠাকুরের চোখ দান কর।"

ফজর কেঁপে ওঠে। অন্য কারিগররা একটু অবাক হয় – মূল শিল্পী কখনো তুলি ছাড়ে না। বৃদ্ধ কারিগর ভোলা পাল কখনো দুর্গার চক্ষুদানের সুযোগ পায়নি। সে বলে, "নে বাবা, খোদার নাম নিয়ে শুরু করে দে।"

ফজর প্রথমে ভোলা পালকে প্রণাম করে, তারপর অলোক পালকে। বুড়ো মানুষটি জড়িয়ে ধরে বাচ্চাটিকে। তুলিহাতে মাচায় চাপে ফজর। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কতদিন আম্মা তার সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলে না। কতদিন তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেনি। বার বার চোখ মোছে। অলোক পাল অবাক হয়ে দেখে ছেলেটির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তার তুলির টানে মা জীবন্ত হন। কাজ শেষ হলে সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। মা যেন এবার কথা বলে উঠবেন। অলোক পাল জড়িয়ে ধরে বাচ্চাটিকে। শিল্পীই শিল্পের প্রকৃত কদর করে।

অলোক জ্যেঠুর কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছে ফজর। দাদার হাতে দিয়েছে চুপিচুপি। দাদার সঙ্গে গিয়ে বোনের জন্য একটা জামা কিনেছে, মা আর দাদির জন্য শাড়ি। মাকে দিতে পারেনি, দাদির কাছে আছে। পাড়ার ঠাকুর এসে গেছে, ষষ্ঠীর ঢাক বাজতে শুরু করেছে। ফজরের চক্ষুদানের ব্যাপারটি আর চাপা নেই। অনেকেই আলোচনা করছে। নাদিয়া তার দাদির সঙ্গে ঠাকুর দেখে এসে মাকে তার বর্ণনা দিয়েছে। আসমানতারা কিছু বলেনি। সপ্তমীর রাতে শুকুর তার বউকে বলে, "চলো, ছোঁড়াটা

কী করেছে দেখেই আসি।"

আসমানতারা নীরব। এই নীরবতাই সবচেয়ে ভয় পায় শুকুর। সাকিরুন এবার কথা বলে, "বৌমা, তোমাকে মেয়ের চোখেই দেখি, বুড়ো মায়ের একটা অনুরোধ রাখো। নাতিটা আমার চোরের মতো থাকে বাড়িতে, আমার বুক ভেঙে যায়। কেঁদে ফেলে বুড়ি। তারপর নতুন কেনা শাড়িটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "এইটে পরো, তোমার ছেলের কামাইয়ের শাড়ি। আল্লার রহমত ভাবো।"

আসমানতারা একটু চুপ থেকে, উঠে গিয়ে শাড়িটা পরে নেয়। তার চোখ কি কাউকে খোঁজে? শুকুরের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। সে মুসলিমপ্রধান গ্রামের মেয়ে। পুজো হতো না তাদের গ্রামে। এখানকার মতো ঠাকুর দেখার রেওয়াজ নেই সেখানে। বেরিয়েছে সে স্বামীর সঙ্গে, কিন্তু তেমন উৎসাহ নেই। মন্ডপে গিয়ে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে সে কেঁপে ওঠে, হারামজাদা করেছে কী! মায়ের মুখের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় আসমানতারা। পরিচিতরা তাকে দেখিয়ে অন্যদের বলে ওই হ'ল ফজরের মা। এক সমুদ্র কান্না তার বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে। তার চোখ ছেলেকে খোঁজে, কোথায় সে? শুকুরকে বলে, "আমি বাড়ি যাব, শরীরটা ভাল লাগছে না।" বাড়ি ফিরে দেখে বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে ফজর। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বাঁধভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ে আসমানতারা। কান্নার মধ্যেই বলে, "তোকে আর আমি আটকে রাখতে পারব না, তুই শুধু আমার একার নোস।"

আর ফজর দেখে তারাভরা আকাশের মধ্যে মধ্যে দেবী দুর্গার মুখ। সে মুখ তার মায়ের মুখের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

*****

(একটিও চরিত্র কাল্পনিক নয়। ছোট্ট আমিরের তৈরি জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখেছিলাম, তখন তার বয়স দশ বছর। আনন্দবাজার পত্রিকার কল্যাণে দূরের লোকও তাকে চেনে। আমার সঙ্গে অবশ্য তার পরিচয় নেই, কিন্তু তার খবর রাখি। এ বড় কঠিন সময়। কত শত আমির আর ফজর সেতু বন্ধনের কাজ করে চলেছে। ঈশ্বর, আল্লার আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হোক।)

অপাহিজ

নিবেদিতা গাঙ্গুলী

ডঃ ঘোষ। ইনি হলেন পুরনো দিনের মানুষ। তিনি মানুষকে মানুষ বলে মনে করেন। জ্ঞান আছে কিন্তু জাঁকজমক কম। শুরু থেকে তাঁর যাঁরা পেশেন্ট, তাঁরা আজও ওঁকেই ভরসা করেন। তাঁরা কেউ আজকালের গ্ল্যামার, হৈ হৈ, রই রই দেখে এদিক ওদিক ছিটকে পড়েন না বা মাঝপথে অন্য কারো অযাচিত প্ররোচনায় সহজে বশীভূত হন না। আর ইনি হলেন মিসেস দত্তগুপ্ত। উনিও কি আজকের? অনেক কম বয়সে স্বামীকে হারিয়ে এই নার্সিংকেই ভালবেসেছেন। প্রায় নিজের সন্তানের মতো এই ক্লিনিকটিকে আগলে রেখেছেন। অতীব বুদ্ধিমত্তায় ও সতর্কতায় ডঃ ঘোষের সুনাম এবং সততা বজায় রেখেছেন, এ বাজারে যতটা রাখা সম্ভব।

আর, এই হ'ল সেই ক্লিনিক। এটি খুব বড়সড় না হলেও খুব খারাপ মাপেরও নয়। তবে, এই মাপ দিয়ে কি আর একটা ক্লিনিকের দোষ-গুণ বিচার করা যায়? ডঃ ঘোষের সবথেকে বড় গুণটি হ'ল তিনি রোগীদের কথা শুনতে চান আর তাই শোনার সময়ও খুঁজে পান। রোগ কঠিন হলে রাত জেগে রোগীর কথা ভাবেন, অসহায় মানুষ দেখে ভেতরে কষ্ট পান, অনেক কাজ করেন, তবে নীরবে। মিডিয়া বা পাবলিসিটির একেবারেই ধার ধারেন না। মিসেস দত্তগুপ্তের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, স্নেহ ও ভালবাসা আছে। তাঁর অনুপস্থিতিতে ডঃ ঘোষ অস্থির হয়ে পড়েন। ভিড়ভাট্টায় আসতে দেরী হলে তিনি চিন্তা করেন। অনেক সময় কাজের শেষে এক কাপ চা হাতে রোগীদের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। এঁদের সম্পর্ক সুগভীর কিন্তু কোন বিকৃত বা অবৈধ সম্পর্ক নয়। আর এত বছরেও এঁদের সম্পর্কের নামকরণ কেউ করতে পারেনি। এই হ'ল প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ডঃ ঘোষ আর তাঁর নার্স মিসেস দত্তগুপ্ত।

সেদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা; ক্লিনিক প্রায় শেষ হবে। ডঃ ঘোষ তাঁর চল্লিশ বছরের অভ্যাসমতো পেশেন্টদের চার্টগুলো আরও একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। দেখছেন কোথাও কোন ভুলত্রুটি আছে কিনা। মিসেস দত্তগুপ্তর উপর তাঁর যথেষ্ট বিশ্বাস, আর ভরসা আছে, তবে মানুষ তো! তিনি বোঝেন, যে বাইরের চেহারার শক্ত বাঁধন, মনের বল, আর

কাজের প্রতি অগাধ ভালবাসা থাকলেও তলে তলে তাঁরও বয়স বাড়ছে। শরীরে আর মনে কিছু পরিবর্তন তো আসবেই! সেটা অব্যর্থ; কে তা খণ্ডাতে পারে!

এমন সময় দরজা খুলে মিসেস দত্তগুপ্ত ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "ডঃ ঘোষ একটি চিঠি আছে।" মুখ না তুলেই ডঃ ঘোষ অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিতে গিয়েও নিলেন না। সংকেতে মিসেস দত্তগুপ্তকে চিঠিটা পড়তে বললেন, আর এই হ'ল সেই চিঠি...

"ডিয়ার ডঃ ঘোষ,

গতমাসে মিতুল মারা গেছে। আপনার তো কিছুই অজানা নয়। আপনি শুধু মিতুলের ডাক্তারই নন, আমার বন্ধুও বটে। মিতুল একরকম নিজে মুক্তি পেল আর আমাকেও মুক্তি দিয়ে গেল। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমি আবার পথের দিকে পা বাড়ালাম। এবার হয়তো ঘরে ফেরা মুশকিল হবে।

ইতি

মিতুলের দাদু আর আপনার পরম বন্ধু, দিগ্বিজয় চ্যাটার্জি"

পড়া শেষ করে মিসেস দত্তগুপ্ত ধীর পায়ে এসে চিঠিটা ডঃ ঘোষের হাতে ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ডঃ ঘোষ ফিরে গেছেন বছর দশেক আগের এক সকালে।

সেদিনের প্রথম পেশেন্ট। নাম ডাকার সাথে সাথে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন তিনি। বয়স ষাট কি পঁয়ষট্টি হবে। খুব স্মার্ট লুকিং, দেখে মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের। মুখে মনের ছায়া। দেখে বোঝা যায় বহুদিন চোখে ঘুম নেই। দুই হাতে বুকের কাছে জাপটে ধরা মোটাসোটা একটি ফাইল, মনে হ'ল মেডিকেল রেকর্ডস।

ডঃ ঘোষ মুখ তুলে বললেন, "বসুন"।

ডঃ ঘোষের কথা শেষ হতে না হতে তিনি বলে উঠলেন, "না না আমি কিন্তু পেশেন্ট নই। পেশেন্ট আমার একমাত্র নাতি, মৃত্যুঞ্জয় ওরফে মিতুল।" আর কিছু বলার অপেক্ষা না রেখে তিনি ডঃ ঘোষের হাতে ধরিয়ে দিলেন তার বুকের কাছে জাপটে ধরা ফাইলটি।

প্রথম পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়ল পেশেন্ট'স নেমঃ মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি; এজঃ ফোর; ডায়াগনোসিসঃ ডুশেন...

দেখে মনে হ'ল মেয়ো ক্লিনিকের পুরনো মেডিক্যাল রেকর্ডস। অন্য পাতা ওল্টানোর আগে বা কিছু প্রশ্ন করার আগেই মিঃ চ্যাটার্জি নিজেই বলতে শুরু করলেন, "আমি মিঃ দিগ্বিজয় চ্যাটার্জি। স্বচ্ছল বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে, বাবার ইচ্ছাতেই কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলাম। প্রথম জীবনে যুদ্ধ ছিল, যেমন আর পাঁচজনের হয়ে থাকে, বিশেষতঃ যখন দেশ থেকে মানুষ বিদেশে গিয়ে বিদেশের মাটিতে নিজগুণে দাঁড়াতে চায়। সেদিক থেকে অবশ্য দেশটা ভাল। গুণের কদর করতে জানে। কাজেই জীবনে সেই প্রতিষ্ঠা পেতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। তারপর সময়মতো বিয়ে, বাচ্চা, সব। আমাদের একটিই ছেলে, সুজয়। ওখানে জন্ম, বড় হওয়া। ওখানেই ডাক্তার হিসেবে নিজে প্রতিষ্ঠিত হ'ল... তারপর তারও বিয়ে হ'ল সোহিনীর সাথে। সোহিনী অবশ্য এদেশের মেয়ে, অন-লাইনে ওদের আলাপ। পেশাতে কম্পিউটার এঞ্জিনিয়ার; খোলামেলা-ঝকঝকে, আধুনিক মেয়ে। ভাল লাগারই মতো। সোহিনী নিজের গুণেই বিদেশে এল। তারপর, ভাল চাকরির অফার, বিয়ে, বাচ্চা, সবকিছুই ছকে পড়ে গেল। আর ওদের এই একটিই ছেলে। আমার নামের সাথে নাম মিলিয়ে ওর মা নাম রাখল মৃত্যুঞ্জয়। বলল, 'বাবা, ও বড় হয়ে ডাক্তার নয়, এই তোমার আমার মতো কম্প-সায়েন্স পড়বে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নামটা ওদেশের পক্ষে কঠিন নাম তো!' তাই আমিই বলেছিলাম এই নাম না রেখে একটু সহজ... আমার বেশ মনে আছে, তাতে ছেলে আমায় বলেছিল, 'কেন বাবা? আমরা যদি ম্যাসাচুসেটস্ বলতে পারি তো ওরা কেন নয়?' আমি বলেছিলাম ঠিক আছে... দেখো চেষ্টা করে। তবে পরে ও ডাক নামেই বেশী পরিচিত হয়ে গেল; মিতুল।

মিতুল বড় হচ্ছে। ফুটফুটে একটা ছেলে। আকার আয়তনে ছোট্ট হলেও সে সবার বুক জুড়ে বসল। ওর খিলখিল হাসিতে মন ভরে যায়। কিন্তু বছর দুই-তিন যেতে না যেতে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল, মানে যে সময় বাচ্চারা হাঁটতে ছুটতে শুরু করে ঠিক সেই সময়টা...। ও হ্যাঁ, সবার কথা বলা হ'ল, কিন্তু আমার মিসেস, চিত্রিতার কথা বলা হয়নি। ও আমারই ব্যাচমেট ছিল। আমার সাথেই বিদেশে এল বিয়ের পর, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সংসারের জন্য সবটা ত্যাগ করে দিল। যাক, যে কথা বলছিলাম... ওরই চোখে প্রথম ধরা পড়ে। আমায় বলত, 'দেখেছ, মিতুল কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে ওঠে, বসে, দাঁড়ায়, ছোটে? আর খুব সহজেই পড়ে যায়?' আমি

হেসে বলতাম, আরে, বাচ্চা তো!

মিতুল আমাদের কাছেই বেশী থাকত | ওর বাবা-মা কাজের চাপে তেমন সময় দিতে পারত না; আর আমাদের তো অবশ্যই ভাল লাগত | কিন্তু দিনে দিনে আরও পরিষ্কার হতে লাগল... মিতুলের কিছু একটা অসুবিধা আছে | তারপর শুরু হ'ল এ ডাক্তার, সে ডাক্তার, এই স্পেশালিস্ট, সেই স্পেশালিস্ট | কিন্তু হাজার ডাক্তার দেখিয়েও ওর ডায়াগনোসিসে কোনও বদল হ'ল না, ওর ডায়াগনোসিস হ'ল 'ডুশেন'|

এটি একটি ভয়ঙ্কর বংশগত রোগ | মায়ের মধ্য দিয়ে আসে | মেয়েরাই এর ক্যারিয়ার | ছেলেরা সাফারার | সব ডাক্তার ওই একই কথা বললেন | এদের শরীরের মাংসপেশীগুলো যেমন দেখতে মোটাসোটা, ঠিক তেমনই কাজে দুর্বল | এরা পরে হাঁটাচলা, ওঠাবসা কিছুই করতে পারে না | শরীর ক্রমশ দুমড়ে মুচড়ে বিকৃত হয়ে যায় | কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধি, চিন্তা সব মোটামুটি ঠিক থেকে যায় | টিন-এজ বা তার একটু বেশী এদের আয়ু, তারপর সব শেষ | এদের হার্ট ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যেসব মাংসপেশীর দরকার সেগুলোও পরে ঠিকমতো কাজ করে না বলে মৃত্যু অবধারিত |

খবরটা শুনে একদিনে মিতুলের বাবা-মা কেমন যেন উদভ্রান্ত হয়ে উঠল | কাজে মন লাগাতে পারত না, ওদের মধ্যেও কথা কাটাকাটি কানে আসত | একে অন্যকে দোষারোপ করত, ধীরে ধীরে ওদের দুজনের সুন্দর সম্পর্কও এমন একটা অদ্ভুত জায়গাতে এসে দাঁড়াল যে শেষে ওরা আমাদের মাধ্যমে কথা বলত | পরে জানা গিয়েছিল সোহিনীর একটি ভাই ছিল, যে অনেক আগেই এই ব্যাধিতে শেষ হয়ে গিয়েছিল | ডাক্তারের অ্যাডভাইস ছিল যেন সোহিনীর বিয়ে না দেওয়া হয় | কিন্তু সেরকম হ'ল কই? আজকালকার ছেলেমেয়ে এরা | অন-লাইনে আলাপ, বিয়ে – ওসব কথা কোনদিন ওঠেনি | আর এখন একে অপরকে দোষারোপ করেই বা কার লাভ? কিন্তু কে কাকে বোঝায়!

তারপর হঠাৎই ঘটল আর এক মর্মান্তিক ঘটনা | গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে একদিনে শেষ হয়ে গেল আমার পরিবার | বেঁচে রইলাম আমি আর মিতুল | আমার সমস্ত সম্মান, অর্থ, সোশ্যাল স্ট্যাটাস সব কেমন যেন বিষ হয়ে উঠল | কিছুদিনের মধ্যে মিতুলকে নিয়ে দেশে ফিরে আসি | মিতুলের বয়স তখন আট | ওরা বলেই দিয়েছিল এর কোন চিকিৎসা নেই | তবু দেশে এসেও বেশ ক'জন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করি, মিতুলকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করি | সবাই একই কথা বললেন | আমার মানতে কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু পরে দেখলাম কেউই মিথ্যে বলেননি | মিতুল আঠারোতে পা দিল | ধীরে ধীরে মিতুলের অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে | প্রথমে ভেলোর, তারপর দিল্লী, তারপর মুম্বাই, তারপর শেষে এই কলকাতাতে | যতই অসুবিধা থাক, নিজের জায়গা তো, একটা সম্পর্ক থেকেই যায়! আমারও বয়স বাড়ছে, আর আমি জানি, মিতুলেরও দিন শেষ হয়ে আসছে | দেশের মাটির একটা গন্ধ আছে | যারা দেশে থাকে তারা তেমনভাবে সে গন্ধ পায় না | আমি যখন থাকতাম, তখন আমিও কিন্তু পেতাম না; এখন পাই | তাই ঠিক করলাম এখানেই থাকব | মিতুলকে আর বেশীদিন নাড়াচাড়া করব না |

এখন আমার এতদিনের বিশাল বিশ্বজগৎ ক্রমশ ছোট হতে হতে এই বাড়িটায় এসে ঠেকেছে | মিতুলকে একা ছেড়ে আমার কোথাও বেরোনো হয় না, মনও লাগে না | আর মিতুলের জগৎ? তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কর্মকাণ্ড বলতে ওই একটা বিছানা আর একটা হুইল-চেয়ার | ওকে ওঠানো বসানো সব আমি নিজেই করে এসেছি এতদিন, তবে মিতুলের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ওর শরীরটা কেমন লোহার মতো ভারী হয়ে উঠছে | একা আর পেরে উঠছি না, তাই সাহায্য করাবার জন্য বাইরের লোক রেখেছি | ওরা আসা-যাওয়া করে রোজ | মিতুল আর আমি – এই আমাদের সংসার | ওকে যতটা সঙ্গ দেওয়া যায়, আমি দিই | অদ্ভুত লাগে... ছেলেটার অঙ্গ চলে না, কিন্তু মস্তিষ্কটা সজাগ; সব বোঝে | কোন কোন দিন অনর্গল প্রশ্ন আবার কোন কোন দিন কী যে হয়, একদম চুপ মেরে পড়ে থাকে | এখন মিতুল একটা উঠতি বয়সের ছেলে... ভগবান নিজে সৃষ্টি করে আবার নিজের হাতেই মেরে তাকে আধমরা করে রেখেছেন | এখন এটাই ওর জান-প্রাণ | তবে শুধু ওর নয়, আমারও তাই | ওর মধ্যে দিয়েই আমরা দুজনে পৃথিবী দেখি | তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ডঃ ঘোষ, আমি জানি আপনার কিছু করার নেই | আমি জানি এ অসুখ সারবার নয় | আর মিতুলের জীবনে বেশী সময়ও নেই | কিন্তু মানুষের শরীর তো, সর্দি কাশি, জ্বরজারি তো হতে পারে, কিম্বা পেট খারাপ? তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি আমি নিজে | আমার মিতুলের যে ক'টা দিন

আছে ডাক্তার হিসেবে আপনি ওর সব দায়িত্ব নিন।"

সেইদিন, সেই মুহূর্ত থেকে পেশেন্ট না দেখেই মিতুল চিরকালের জন্য ডঃ ঘোষের হয়ে গেল। আর সেই থেকে কোনদিন মিতুলের ডাক্তার হিসেবে আর কোনদিন দিগ্বিজয়-বাবুর বন্ধু হিসেবে ওঁদের বাড়ি ডঃ ঘোষের যাওয়া-আসাও শুরু হ'ল।

এইভাবে দু'দুটি বছর পার হয়ে গেল।

তারপর একদিন, তখন সন্ধ্যে প্রায় আগত। বাইরে নেমেছে বৃষ্টি। লাস্ট পেশেন্ট দেখে মিসেস দত্তগুপ্ত সেদিন বেরিয়ে পড়েছেন। ডঃ ঘোষ তখনও ক্লিনিকে। সেই সময় হঠাৎ ঝড়ের গতিতে দিগ্বিজয়বাবুর প্রবেশ – উদভ্রান্ত, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। শরীরের নানা অংশে বৃষ্টির দাগ।

ডঃ ঘোষ বিচলিত হয়ে বললেন "এনিথিং রং উইথ মিতুল?"

দিগ্বিজয়বাবু বলে উঠলেন, "না না, ইটস মি!"

ডঃ ঘোষ দিগ্বিজয়বাবুর দিকে মুখ তুলে বললেন, "প্লিস হ্যাভ আ সীট, হ্যাভ আ সীট...।"

চেয়ারে বসতে বসতেই দিগ্বিজয়বাবু শুরু করলেন, "ইদানীং মিতুলের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখছি। ও আর তেমন আমার সাথে কথা বলে না, কেমন একটা উদাস ভাব, ছবিও আঁকেনি অনেকদিন। জ্বরজারি নেই, তেমন শরীর খারাপ বলেও তো মনে হয় না। কেমন যেন চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মিতুলের ঘরের মধ্যেই আমার বিছানা। তবে আজকাল বিছানাতে শুলেই ঘুম কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। তাই আজকাল অনেক সময় মিতুল ঘুমিয়ে পড়লে ওর ঘরের দরজার ঠিক বাইরে এসে আমি আমার ইজি চেয়ারটায় বসি। ওখান থেকেই রাতের আকাশ দেখি। ছোটবেলার কথা মনে আসে। তারা চোখে পড়ে না, কিন্তু বসে বসে দেখি সেই একই মিশকালো অন্ধকার। ওই অন্ধকার দেখতে দেখতেই ঘুম এসে যায়। যেটুকু রাত বাকি থাকে, কেটে যায়। একটু পরে ভোর দেখতে পাই। সেদিন রাতে চেয়ারে শুয়েও ঘুম এল না। হঠাৎ মিতুলের ঘর থেকে একটা খুট করে শব্দ কানে এল। মনে একটা কেমন ভয় হ'ল। ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে ঘরের সামনে এসে একটু উঁকি দিয়ে মনে হ'ল মিতুল জেগে আছে। অন্ধকার দেওয়ালে হালকা রঙিন আলোর এলোমেলো খেলা। বুঝলাম টিভি চালিয়েছে মিতুল। আপনমনে রাত জেগে টিভি দেখছে... কিছু না বলে চলে এলাম আমার চেয়ারে। সত্যিই তো! এটা কি একটা বাঁচার মতো জীবন? আর ক'টা দিনই বা আছে মিতুলের? এইভাবে আরও বেশ কিছুদিন গেল... আজকাল যেন ও একটু বেশীই ছটফট করে। মনে কেমন যেন একটা আশংকা হতে থাকে, এ কি সেই নিভে যাবার আগে জ্বলে ওঠা প্রদীপের শিখা? আমার সে রাতে ঘুম এল না একেবারে। এক অজানা ভয় মনটাকে যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রাখল। ঘড়িতে দেখলাম রাত একটা বাজে। উঠে গেলাম... মনে হ'ল মিতুল আজ টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথাটা বালিশে স্থির হয়ে আছে। বুকের ওপর থেকে রিমোটটা খসে পড়েছে। দুমড়ানো-মুচড়ানো ঘুমন্ত শরীরটা... তাকানো যায় না। রিমোটটা আস্তে করে হাতে তুলে নিলাম। টিভিটা বন্ধ করতে গিয়ে স্ক্রিনের দিকে চোখ পড়তে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। একী! এ কী দেখছে মিতুল? সারাক্ষণ রিমোট নিয়ে খুটখাট করতে থাকে... আর কীই বা আছে ওর জীবনে? কিন্তু একী! কোন জগতের সন্ধান সে পেয়েছে? মিতুল আঠেরোর ঘরে। সত্যিই তো তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত হলেও তার শারীরিক সুখের বোধ নিশ্চয়ই আছে। সেদিন বুঝতে পারলাম মিতুল শুধু অপাহিজ বাচ্চা নয়। সে মানসিকভাবে পূর্ণ যুবক। মিতুলের সামনে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে কেমন লজ্জা আর ভয় করতে লাগল। নিজেকে অপরাধী মনে হতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। আমি এতদিন ধরে ভাবতাম আমার করণীয় যা যা আছে আমি সব দায়িত্ব, সব কর্তব্য পালন করেছি। সেদিন আমার প্রথম মনে হ'ল ছেলেটাকে তার জীবনের প্রাপ্য জন্মগত সব অধিকার আমি দিতে পারিনি। দিনে রাতে এই অপরাধ বোধ কুরে কুরে আমায় খেতে লাগল।

তারপর একদিন রাতের অন্ধকারে কাউকে না বলে চলে গেলাম রেড লাইট এরিয়াতে। দেখেশুনে নিয়ে এলাম একজনকে। তার নাম রানী। তাকে অনেক টাকা দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে করে দিলাম মিতুলের এক রাতের রানী।

মিতুলের ঘরের বাইরে অন্ধকারে সারারাত চেয়ারে পড়ে থাকলাম নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দকে আঁকড়ে। আর সে রাতের সেই প্রতিটি মুহূর্ত সেদিন মনে হয়েছিল যেন এক একটি অনন্তকাল। ভোরের আলো ফোটার আগেই রানী মিতুলের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মাথার খোঁপা ঘাড়ে খসে

পড়েছে | শাড়ির আঁচলে গাটা ঢাকতে ঢাকতে রানী আমার সামনে এসে দাঁড়াল | মুখে কিছু না বলে আমার হাতে আমারই দেওয়া টাকার বাণ্ডিলটা গুঁজে দিল | সেই আবছায়াতে মনে হ'ল তার চোখের কোণটা কেমন চিকচিক করছে | মুখে হালকা হাসি টেনে বলল, 'ভোরের আলো ফোটার আগে বেরিয়ে পড়ি, নাহলে আপনার জন্য ভাল হবে না | আশেপাশের লোকজন কানাঘুষো করবে | আর হ্যাঁ একটা কথা... ফাঁকি দিইনি বাবু | ছেলেটা বেশীদিন বাঁচবে না... না গো?' তারপর সে হনহন করে লম্বা লম্বা পা ফেলে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল | দরজা খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ পেলাম | কিন্তু আমি কেবল নিথর হয়ে চেয়ারে বসে থাকলাম |

সকালের লোকটি এল | এসে বলল, 'আপনি কাল নীচের দরজা লাগাতে ভুলে গেছেন |'

আমরা দুজনে একসাথে ঘরে ঢুকলাম | মিতুল বিছানাতে শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে... একমনে কী ভাবছে | ডাকলাম, 'মিতুল', কোন উত্তর পেলাম না | জানি না আমি ঠিক করলাম নাকি আরও বড় ভুল করলাম | কাউকে বলতে পারিনি | আপনি তো সবই জানেন | আর আপনার কাছে আমার লুকোবারও তো কিছুই নেই! বিবেকের বোঝা হালকা করতেই আপনার কাছে আসা |" এই বলে দিগ্বিজয়বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন | ঘড়িতে সন্ধ্যে ছ'টা বাজল | ডঃ ঘোষ ক্লিনিকের বন্ধ জানালাটা আর একবার খুলে দিলেন | নজরে এল জানালার বাইরে একটু দূরেই পীচঢালা পাকা শহুরে রাস্তা, গাড়ি-ঘোড়া, বাস-ট্রাম, নানান ধরনের শব্দ, আর বেপরোয়া জনতা | দিনের আলো তখন একটু ঢিমে হয়ে এসেছে, তবে রাস্তার সব আলো তখনো জ্বলে ওঠেনি | দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আবার একবার দিগ্বিজয়বাবু ঘুরে দাঁড়ালেন | বললেন, "ডঃ ঘোষ, আমি কি ভুল করেছি?" কিছুক্ষণ পর ডঃ ঘোষ জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকালেন, কিন্তু দিগ্বিজয়বাবুকে দেখতে পেলেন না | কখন তিনি যে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন! ডঃ ঘোষ সেদিন তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারেননি; না ডাক্তার হিসেবে, না বন্ধু হিসেবে |

আজ বিকেলটা সেই বিকেলটার মতোই, আকাশে মেঘ, বৃষ্টি নেমেছে, বাইরের আলো ঢিমে হয়ে আসছে | ক্লিনিক বন্ধ হবার সময়... কিন্তু, আজ ক্লিনিকে কেবল ডঃ ঘোষ আর মিসেস দত্তগুপ্ত | মিসেস দত্তগুপ্ত অবাক হয়ে ডঃ ঘোষের দিকে তাকিয়ে আছেন; হাতে তখনও অন্যমনস্কভাবে ধরা সেই চিঠিটা; কিন্তু ডঃ ঘোষ বিড়বিড় করে কী বলে চলেছেন? "দিগ্বিজয়বাবু, না না, একেবারেই না, আপনি কিছুই ভুল করেননি |"

মিসেস দত্তগুপ্ত ডাকলেন, "ডঃ ঘোষ" – ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডঃ ঘোষ দরজার দিকে চোখ রেখে কাকে স্যালুট করছেন? মিসেস দত্তগুপ্ত আবার ডাকলেন, "ডঃ ঘোষ"! তখনও তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে, কোন সাড়া দিলেন না |

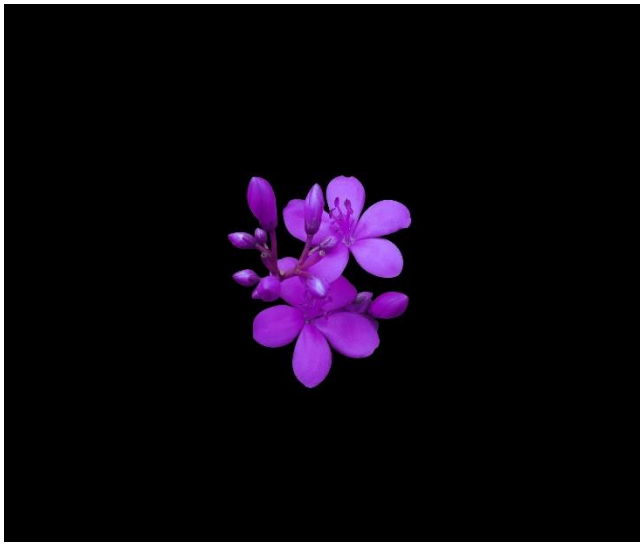

৪৫ নং বাড়ি

প্রভাস দাস

বাড়িটা অনেকদিন আবাসিকশূন্য | অনেকদিন আগে এক সময় এর বড় বড় ঘর, বারান্দা গান-আড্ডা, তর্ক-ঝগড়া, প্রেম-হাসি, হৈচৈ-খুনসুটিতে টইটম্বুর হয়ে থাকত | তারপর কখন যেন শুরু হয়ে গেল উলট পুরাণ | সপ্রাণ মানুষগুলোর সংখ্যা নানা ধরনের বিযুক্তি ও বিচ্ছেদ দিয়ে কমতে শুরু করল | এখন সে সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে একে |

বয়সে ন্যুব্জ মানুষীটির পিতৃদত্ত নাম বিন্দু | আর তার বোন সিন্ধু | বিন্দু যখন তৃতীয় শ্রেণীতে ভালভাবে পাস করল, খুশিতে ডগমগ তার বাবা তখন এক মারণ রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করছে | লড়াইটা ছিল অসম, কারণ তার প্রতিপক্ষ অপ্রতিরোধ্য! খুশির রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই বাবা হেরে গেল | কর্কট রোগ কেড়ে নিল বাবার প্রাণ | তারপরের জীবনটা কেমন যেন মামুলি হয়ে গেল বিন্দুর কাছে | সে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মহাপ্রস্থানের মিছিল | একে একে মা, তারপর তাদের দু'বোনের অভিভাবক হয়ে বাবা মায়ের অভাব পূরণ করতে থাকা পিসা, এবং এক বছরের ব্যবধানে পিসিও আগুন-যাত্রায় চলে গেল |

বোন সিন্ধু শত বিপত্তিতেও হাল ছাড়েনি | ও ছিল বিন্দুর চরিত্রের ঠিক উল্টো | দারুণ রেজাল্ট নিয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে, চাকরি পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিল | প্রথমদিকে আর পাঁচজন যা করে ও তেমনই করত; দু বছর অন্তর দেশে আসত, তারপর সেই আসায় যবনিকা পতন | একটি ভাল ছেলেকে ভালবেসে সে বিদেশে থিতু হ'ল | বিন্দু কোনকালেই স্মার্ট ছিল না, বরং বেশ মুখচোরা | দেখতেও সাধারণ | প্রেম, বিয়ে তার হয়ে ওঠেনি | কারো কাছ থেকে কোনও সংকেত এসেছিল কিনা তাও বুঝতে পারেনি | সে তার সর্বস্ব দিয়ে আঁকড়ে রইল তাদের ৪৫ নং বাড়ি | অশরীরী বিষণ্ণতার বুকে মাথা রেখে মাঝে মাঝে কাঁদত | দেওয়ালে টাঙানো স্বজনদের ছবিগুলোতে হাত বুলিয়ে কাঁদত | ঘর-বারান্দা-ছাদে পায়চারি করতে করতে কাঁদত; রাস্তামুখো জানালার শিক ধরে সে কাঁদত | কিন্তু কোন কান্নাতেই তার চোখ বেয়ে জল নামত না, তাই কেউ টেরও পেত না | তার বোন ফোন করলে সে খুব বেশী কথা বলত না | ফোনটা তার বোনই নিয়ে এসেছিল বিদেশ থেকে | বোন ভাবত দিদি বোধহয় চাইছে না তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে | তেমনটা বুঝে ক'দিন আগে সিন্ধু জানাল ওরা দেশে আসবে বাড়িটা বিক্রি করতে | আর বিন্দুর জন্য অন্য কোথাও, কোনও আশ্রমে থাকার ব্যবস্থাও করে দিয়ে যাবে | বিন্দু সবটা শুনল; উত্তরে বলল, "আচ্ছা, রাখছি |"

পরের পনের দিন তার সব কান্না উধাও হয়ে গেল | সে তার মন ও শরীর জুড়ে টের পেতে লাগল বাবাকে | বাবা ফিরে এসেছে | ওকে আঁকড়ে ধরে, কোলে নিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে | গাইছে তো গাইছেই | একনাগাড়ে | সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা, সারারাত, সারাদিন এক এক করে গেয়েই চলেছে | মাঝে মাঝে কাশছে, মুখ দিয়ে ছলকে উঠছে রক্ত | গরম রক্ত তার বিছানা ভিজিয়ে দিচ্ছে | একসময় সে টের পেল গান থেমে গেছে | বাবা কি ঘরের আলো নিভিয়ে চলে গেল! গাঢ় অন্ধকারে সে বুঝতে পারল তাকে বিছের মতো কোন কীট কামড়াচ্ছে | ছোটবেলায় সে বিছের কামড় খেয়েছে | মা কিসের যেন পাতা বেটে লাগিয়ে দিত, আস্তে আস্তে জ্বালা কমে আসত | সে চীৎকার করে মাকে ডাকল – বেশ কয়েকবার, যত জোরে ডাকা যায়, তত জোরে | কিন্তু মা কেন শুনতে পাচ্ছে না সে বুঝতে পারল না | বিন্দু নিজেও তার চীৎকার শুনতে পেল না | খুব জ্বালা করছে | খুউব!

৪৫ নং বাড়ির দরজা দিন তিনেক পরে ভাঙা হ'ল | সিন্ধু তার স্বামীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল শশব্যস্তভাবে | পুলিশ ও পাড়ার কয়েকজন ঢুকল তাদের সঙ্গে | কত যুগ পরে ৪৫ নং বাড়ির সিঁড়ি, সিলিং, মেঝে, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল, জানালা, দরজা ও বারান্দা শুনল মানুষের হাঁকডাক, কথাবার্তা | কিছুক্ষণ পরেই সাইরেন বাজিয়ে ডাক্তারসহ এল অ্যাম্বুলেন্স | রক্তভেজা বিছানায় মিশে থাকা শরীরটা তুলে নিয়ে তারা চলে গেল | সিন্ধুকে জানিয়ে গেল তাদের প্রাথমিক অনুমান | ক্যান্সার, টার্মিনাল স্টেজ |

অ্যাম্বুলেন্স চলে যাওয়ার পর সিন্ধু বড় একটা শ্বাস ফেলল | সে শ্বাস কষ্টের, নাকি স্বস্তির, তা দু'ভাবে বোঝা গেল – এক সিন্ধু নিজে এবং অপরটি ৪৫ নং বাড়ি |

আমার দুর্গাপুজো

রূপসা সরকার (বয়স ১৩) (সপ্তম শ্রেণী)

দুর্গাপুজো সব বাঙালির কাছেই খুব আনন্দের সময়। আমি এই সময়টাতে খুব ব্যস্ত থাকি।
এবছর আমি ছয়টি নাচে অংশ নিচ্ছি। নেচে ক্লান্ত হয়ে গেলেও খুব আনন্দ পাই।
আমি আমার প্রিয় জিনিস করতে পারি। নাচ করি এবং আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলি।
নাচের পাশাপাশি আমি রূপছন্দা মাসির ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কবিতা বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাই।
আমার এটা করতে খুব ভাল লাগে।
আমি এবছর হিউস্টন দুর্গাবাড়ির পত্রিকার জন্য আমার লেখা কবিতা এবং আমার আঁকা ছবি জমা দিয়েছি।

এবার পুজো সবার খুব ভাল কাটুক!

শিল্পী: ঈশায়ু মণ্ডল (বয়স ৬)

পরী

(ছোটদের শ্রুতি নাটক)

শঙ্কর তালুকদার

চরিত্র: ভোম্বল, নুরুল ও ইমন

[রেকর্ডে: চারদিক নিঃঝুম, শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের ডাক। হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল]

ভোম্বল:- আঁ,আঁ করে ভিরমি খেয়ে টলে পড়ল।

নুরুল:- বার বার বলেছিলাম ওকে সঙ্গে নিস না। ওর যত বীরত্ব স্কুলে, বিশেষ করে মেয়েদের সামনে, আসলে ব্যাটা ভিতুর ডিম।

ইমন:- কে ওকে আনতে চেয়েছিল! কিন্তু নাছোড়বান্দা; যাবেই যাবে। আসলে স্কুলে হিরো সাজতে হবে না!

নুরুল:- এখন হিরো তো জিরো হয়ে বসে আছে। কী করবি?

ইমন:- [ভোম্বলের গালে দু'চার চাপড় মেরে] এই ভোম্বল, ওঠ ওঠ।

ভোম্বল:- [একটু পরে "কে? কে?" বলে উঠে বসল। ইমন আর নুরুলের দিকে তাকিয়ে]

কীরে, তোরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছিস কেন?

নরুল:- এত যখন ভয়, এলি কেন?

ভোম্বল:- ভয়! ভয় কোথায় পেলাম? এই বান্দা ভয় পাওয়ার ছেলে নয়।

ইমন:- এই তোর দোষ। ভাঙবি তবু মচকাবি না।

ভোম্বল:- টলে পড়েছিলাম বলে এত কথা বলছিস তো? তার কারণটা শোন, তবেই বুঝতে পারবি।

নুরুল:- ব্যস, গ্যাস দেবার সুযোগ পেয়ে গেছে।

ভোম্বল:- কাল মামাবাড়ি থেকে যখন ফিরলাম, দুটো ঘুঘুপাখি নিয়ে এসেছিলাম।

ইমন:- ঘুঘুপাখি কোথায় পেলি?

ভোম্বল:- আমার বন্দুকের শিকার।

নুরুল:- [একটু হেসে] তুই বন্দুকও চালাতে পারিস! তা ঘুঘুপাখির সঙ্গে টলে পড়ার কী সম্পর্ক?

ভোম্বল:- ঘুঘুপাখির মাংস কখনও খেয়েছিস? খেলেই শরীর গরম হয়ে যায়। গা দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করে। রাতে ঐ ঘুঘুর মাংস খাওয়া হয়েছিল।

ইমন:- সে তো ৫/৬ ঘন্টা আগে খেয়েছিস। তার সঙ্গে টলে পড়ার...

ভোম্বল:- আগে বলতে দিবি তো।

নুরুল:- বল, বল।

ভোম্বল:- যোগ ব্যায়াম করি তো। ঘুঘুর মাংস খেয়ে সবাই যখন ঘামতে আরম্ভ করল, আমি যোগবলে একটুও ঘামলাম না। বাড়ির সবাই ভীষণ অবাক। কিন্তু কাজটা ঠিক হয়নি। ঐ চেপে রাখার জন্যই এখন এমন ধাক্কা দিল ভিতরে যে আমি টলে পড়লাম।

ইমন আর নুরুল:- তুই পারিসও বটে!

নুরুল:- অনেক হয়েছে। এবার চল। নীলুকাকু বার বার বলেছে ঠিক ভোর ভোর না পৌঁছাতে পারলে পরীদের দেখা যাবে না। সকাল হওয়ার আগেই তারা চলে যায়।

ইমন: কে জানে! সত্যি সত্যি পরী আছে কিনা। কিন্তু নীলুকাকু এমন বিশ্বাসের সঙ্গে বলল যে কৌতূহল চেপে রাখতে পারলাম না।

নুরুল:- ঠিক তাই। নইলে রাতের ঘুম নষ্ট করে কে আসে?

ইমন:- যদি সত্যি সত্যি পরীর দেখা মেলে, তবে ভোম্বলকে আর ধরে রাখা যাবে না। স্কুলে যে ও কী কান্ডটা করবে!

নুরুল:- চল চল, কথা বলে আর সময় নষ্ট করিস না। ভোর হতে আর দেরী নেই, জঙ্গল বলে বোঝা যাচ্ছে না।

ভোম্বল:- তোরা দুজনে মিলে তখন থেকে আমায় অ্যাটাক করে যাচ্ছিস। আমি না হয় গুল মারি, তা তোরা এলি কেন?

ইমন ও নুরুল:- [সমস্বরে] আমরা সত্য-সন্ধানী। নীলুকাকুর কথাটা যাচাই করার জন্য যাচ্ছি।

ইমন:- চুপ চুপ। জঙ্গল শেষ হয়ে এল। এবার সাবধান। শব্দ হলেই পরীরা পালাবে।

ভোম্বল:- উফ্!

নুরুল:- আস্তে।

ভোম্বল:- কাঁটা ফুটেছে।

ইমন:- ঠিক সময়ে যত বাগড়া! দাঁড়া, আমি কাঁটা বার করে দিচ্ছি।

নুরুল:- আরে দীঘির জল ফেনার রাশিতে ভর্তি কেন?

ইমন:- এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চল, হামাগুড়ি দিয়ে একটু এগিয়ে যাই।

ভোম্বল:- কিছু জ্যান্ত জিনিস নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে মনে হয়।

[একদল হাঁস উড়ে যাবার শব্দ]

নুরুল:- হাঁস রে, হাঁস। এত হাঁস একসঙ্গে কখনও দেখিনি। দেখ দেখ – সব মিলে যেন এক বিশাল আকার। যেন কোনও সাদা মেঘ ভেসে চলেছে। কী সুন্দর! কী সুন্দর!

ইমন:- তাহলে এরাই নীলুকাকুর পরীর দল! ভোম্বল, তোর আর স্কুলে কেতা নেওয়া হ'ল না।

নুরুল:- নীলুকাকু সত্যি বলুক আর মিথ্যে বলুক; ঐ দীঘির বুকে ফেনার রাশি, ঐ দলে দলে হাঁসের দল উড়ে যাওয়া; যেন পরীদেরই উড়ে যাওয়া রে!

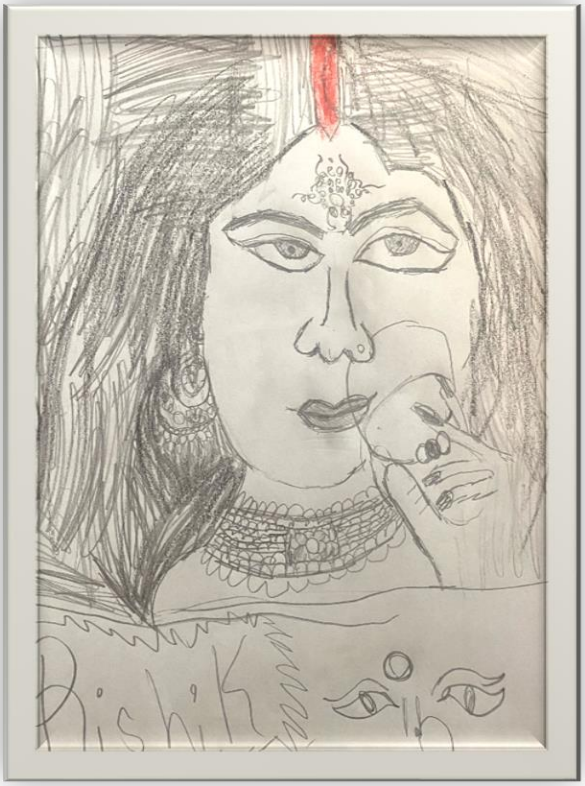

শিল্পী: ঋষিক গাঙ্গুলী (বয়স ৭)

শিল্পী: শ্রেয়ান চক্রবর্তী (বয়স ৮)

ঈশ্বর বর্ণনা

শান্তনু মিত্র

চিনির রসে ঐ যে ভাসে
হলদে, সাদা, গোল।
একটিকে নাও, সব ভুলে খাও
সুখের দোলায় দোল।
শুধাই এবার "বন্ধু আমার
যে সুখ পেলে মুখে,
খাতার পাতায় দশটি কথায়
পারবে দিতে লিখে?"
লক্ষ আবেগ পেয়ে গতিবেগ
খুঁজবে মনের দ্বার।
হায় রে কপাল, আকাশ পাতাল
ভাবনা হবে সার।
উদাস মনে খাতার পানে
রইবে চেয়ে ভাই।
'মিষ্টি' কথার বাইরে তো আর
লেখার কিছুই নাই।
কলম রাখো, চোখটি ঢাকো,
আর একটি নাও মুখে।
সেই অনুভব রইবে নীরব,
যায় না দেওয়া লিখে।

জলকণা

শান্তনু মিত্র

সীমাহীন গম্ভীর সাগরের প্রাণে
সহস্র শতকণা জল!
অস্থির অতি চঞ্চল!
সুন্দরী মায়াবিনী দক্ষিণা হাওয়ায়
কে যেন সে ডাকে 'আয়'।
কে যেন সে ছুঁয়ে যায় বর্ষার গানে।
আকাশের আহ্বান আনে সমীরণ।
জলবিন্দু উড়ে যায়,
গড়ে মেঘ মায়াময়।
মহানন্দে কণাগুলি হয় সখা সখী।
কে কোথায় ছিল দূরে
সাগরের ঢেউয়ে দুলে।
ক্ষণিকের মেঘে ঐ ক্ষণিক মিলন।
তবু ঝরে যেতে হবে বৈশাখী ঝড়ে,
গহন বনের মাঝে, ধু ধু প্রান্তরে,
সীমাহীন একাকীত্বে,
খুঁজে শুধু একে অন্যেরে।
স্মৃতিকণা ভরে রবে হৃদয়ের ঝুলি,
কত বিন্দু রবে মনে মনে।
ছিল সবে একসাথে
আকাশের কোণে,
জীবনের সেরা দিনগুলি।

শরৎ প্রভাতে

কমলপ্রিয়া রায়

এ কী অপরূপ রূপটি হেরি
আজি এ শরৎ প্রভাতে
আলো ঝলমল নাচে চঞ্চল
ধরার আঙিনাতে
মন আজ ভরে ফুলের সুবাসে
অন্তর উঠে দুলি
হৃদয় আজিকে বাহিরের পানে
ছুটেছে দুবাহু মেলি
প্রভাত হেথা ডাকিছে সবারে
মেঘের আড়াল ত্যাজি
আলোর পরশে মনের হরষে
সুরবীণা উঠে বাজি
ওরে তোরা সবে ছুটে আয় আজি
আগমনী গান ধরি
সকলের সাথে হাতে হাত রেখে
সব কাজ আজ সারি
শরৎ প্রাতের মধুর প্রভাতে
মাকে মোরা সবে স্মরি
মায়ের আশিস সাথে নিয়ে চলো
নতুন পৃথিবী গড়ি

পুনর্বাসন

অনসূয়া চন্দ্র

আকাশে তখনও ঘুড়ি ছিল বেশ কিছু,
গন্তব্য যাদের ছিল না তেমন ঠিক।
মাঞ্জা-লাটাই ছিল না কারো হাতে,
ওড়ার আনন্দে উড়ে যেত দিকবিদিক।

এখন, আকাশ জুড়ে কেরামতি
নির্দিষ্ট তার চলার সীমানা
লাটাই হাতে স্থির তার পরিণতি
বেতাল, বেচাল হাজারো জরিমানা।

ঘুড়ি জানে তার সীমাহীন দায়-
বদ্ধতা সে অমান্য করে হেলায়।
আবার আসব কথা দিয়ে তাই
টুপ করে তারার মতো খসে যায়।

তবু ঘুরপথে পতপত ওঠে আওয়াজ
কাটা ঘুড়িগুলো জড়িয়ে ধরেছে গাছ।
উড়াল পেলে সুতোর গিট্টি খুলে
সাজিয়ে রাখবে অদেখা মন্তাজ।

জীবন যেমন

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

সাক্ষী আছে ফুল পাখি মাঠ
কত কাছে ঝুঁকেছিলে দহনের দিনে
পদ্মবীজ মালা ছিল রমণ কাতর
নির্বিকার ধুয়ে দিলে অক্ষরের ঋণে

মানুষও তো সয়ে নেয় শোক জ্বালা প্রেম
মোম গলে মৃদঙ্গ আঘাতে
লাটিমের মতো ঘোরে কাছে আসে
সরে যায় আপন খেয়ালে
বৃষ্টি শেষে অকৃত্রিম রামধনু ওঠে

অন্ধকারে পাতা থাকে চন্দনের পিঁড়ি
সম্পর্কের নিবিড় সুবাস
কোন টানে ঘুরে যায় ব্যথার মাস্তুল
যৌথ জীবন তবু শীত বারোমাস

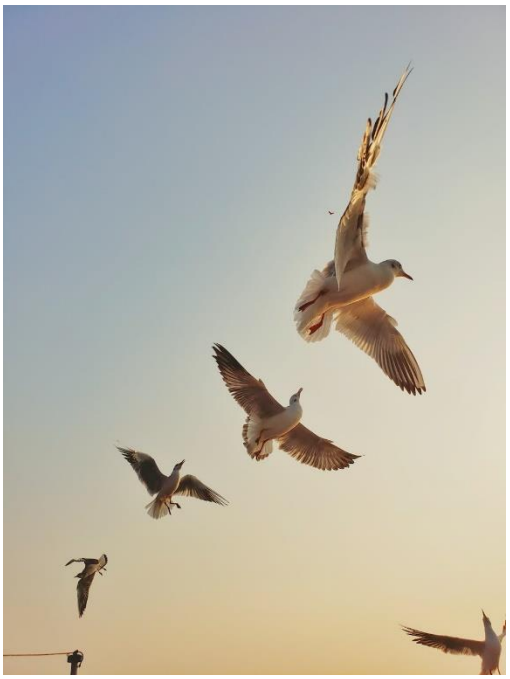

পাখি

অজয় সাহা

যদি পাখি হও,
উড়ে যাও ডানায় বাতাস,
উড়ে যাও মনখারাপের তীরে
যেখানে মেঘের ঘের
আলোছায়া মেখে
সেরে ওঠো নীল সেরে ওঠো
গত বিকেলের ক্ষত
আহত সন্ধ্যার পরিচর্যায় ওষধি,
আকাশ হয়তো এখনও
রেখে যায় উপশম কিছুটা যা
তোমারই মতো।
কখনও আবার এসো ফিরে
চেনা গাছগাছালি আর প্রিয় নদীটির চরে
বহুদূরে বসতি বাগানের ঘেরাটোপ
সবই সে আগের মতোই আছে
শুধু ধোঁয়া নেই ভাঙা শেড জংধরা কারখানাটাও গেছে,
তোমার কি মনে আছে?
এরই ঠিক পিছনের দিকে
আমাদের একান্ত গোপন শেষ বিকেলের
আস্তানা!
আপাতত ১২তলা আবাসন হয়ে থেমেছে।
যদি পাখি হও
উড়ে এসো ডানায় বাতাস,
ফিরে এসো জনবসতির ভীড়ে
যেখানে আশার আবেগে
তোমাকে রাখবে ঘিরে।
সেরে ওঠো নীল সেরে ওঠো
মানুষের হৃদয়ের ক্ষত।

নার্সিশাস

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বড় মধুর সময়!
শুধুই আত্মরতি,
দর্পণ বিলাসে প্রগাঢ় প্রেম!
শুধু নিজেকেই দেখা!
গভীর ভালবাসায়,
আশ্লেষে ভরিয়ে দাও
শুধু নিজেকেই।
আত্মপ্রতিষ্ঠার
শূকরী বিষ্ঠায়,
গড়াগড়ি দেওয়ার
দিন আজ!

রাজসভায়
বন্দীরা গাইছে বন্দনাগীত,
পুষ্পবৃষ্টি চতুর্দিকে,
জয়ধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে!
এ বড় সুখের সময়!
জেগে আছে
শুধুমাত্র "আমি"!
ধন্য নার্সিশাস!
ধন্য তুমি!

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

তোমাদের সাথে মিলল জীবন পাঠ কবিতায় গল্পে গানে,
এমনি করেই কাটুক না দিন, খুশির খোরাক আসুক প্রাণে।

লেখার তাগিদ থমকে ছিল জীবন স্রোতে কয়েক বছর,
আবার শুরু এই সভাতে শ্রোতার গুণে বাড়ল কদর।
লেখার ধারা বয় যেন গো তোমাদের এই স্নেহের টানে,
এমনি করেই কাটুক না দিন, খুশির ছোঁয়া আসুক প্রাণে।

কেমন ছিল রইবে কেমন আমাদের এই সভার ধারা,
শান্তি যেন তাদের ঘেরে রইছে যারা আসবে যারা।

মাসের শেষে যে রবিবার বসবে সভা যার বাড়ীতে,
তাদের যেন মন খাঁটি রয় সুখ ভরে যায় ফুল সাজিতে,
সবার আসার ভিন্ন হেতু আসল নকল কেই বা জানে,
এমনি করেই কাটুক না দিন, খুশির হাওয়া আসুক প্রাণে।

অর্থ

শঙ্কর তালুকদার

একটা শব্দের অর্থ
খুঁজে বেড়াচ্ছি কয়েকদিন ধরে
প্রতি মুহূর্তে তার আন্দোলন।
মন্ত্রীরা গেছে জানাতে সমবেদনা
সঙ্গে মিডিয়ার ছবি আর গল্প,
ফেসবুকে সাজানো সারি সারি
সমবেদনার মালা নানান রঙের
আর গেছে কিছু পাড়ার ছেলে
রক্ত দেবে প্রাণ জোগাতে।
কারা সত্যি সমবেদনা জানাল?
সমবেদনার বালুচরে কি
সব ঢেউ মিলে একাকার!
তির্যক চোখে কেউ বলে
সবাই কী করে যাবে রক্ত দিতে।
তাই বলে কি সমবেদনা
বাষ্পের মতো উবে যাবে ফুৎকারে।
প্রশ্ন জাগে, সমবেদনা হয় না
প্রতিবাদের সুরে, প্রশ্ন করে –
কোন অপরাধে এই নরবলি।
নাকি চোখে চোখ রেখে
কথা বলার সাহস গেছে হারিয়ে
তাই সমবেদনার এই পরিচয়।

(প্রায় ২৪ বছর আগে সাংঘাতিক ট্রেন
দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে)

বসে আছি

শঙ্কর তালুকদার

বসে আছি, বসে থাকি
খোলা জানালা
বাতাস কথা বলে
শুনি নিরালায়।
আর সব স্মৃতিপটে
লেখা অতলে
কিছু কিছু মনে পড়ে
খেলার ছলে।
ছিল কোলাহল
আর মতের বিরোধ,
ঘর অগোছালো কেন
হয়েছি সরব।
আজ আর কেউ
কাঁদে না মিছে
ঘরগুলো সাজানো
চোখ মেলে থাকে।

বসে আছি,বসে থাকি
খোলা জানালা
নিরুপদ্রব জীবনে এখন
সময়ের খেলা।
রাস্তায় কারা যায়
কান পেতে শুনি

নিশ্চুপ ঘরে
নেই প্রতিধ্বনি।
আজ শুধু দিন গুনে
মনে করে রাখি
কোনদিন জনম
আর বিবাহ বার্ষিকী।
ভুল তবু, ভুল হয় মনের ভুলে
অভিমানে ফোন তাই
বেজে বেজে ওঠে।

নির্যাস

সৌরভ মুখার্জী

ছবিটা আবার গিয়ে উঠল
দেওয়ালে গাঁথা লোহার হুকে।
শুকিয়ে যাওয়া চন্দনের ফোঁটাগুলো
গতকালের স্মৃতিটুকু বহন করছে।
এক অনাবিল অনুভূতি।
ধুলোর আস্তরণে ঢাকা ছিল ছবিখানা,
পেড়ে, মুছে, চন্দন-ফোঁটা দিয়ে সাজিয়ে,
ফুল, মালায় ঢেকে,
সাদা কাপড়-ঢাকা টেবিলের ওপরে বসানো
হয়েছিল।
অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি।
কিছু কথা, গান, পদ্য আর গদ্য,
কেউ সাদামাটা, কেউ অনবদ্য।
লালপাড় সাদা শাড়ি, খোঁপায় লাগানো ফুল,
ধুতি, পায়জামা আর পাঞ্জাবি,
তিনি যে বাংলার কবি।
কেমন ছিলেন তিনি?
কী ছিল তাঁর ভাবনায়?
শুধুই কি প্রেম, বিরহ আর জীবনের জলছবি?
নোবেল প্রাইজ, নাইটহুড,
জোড়াসাঁকো কি শিলাইদহ,
তিনি যে হৃদয়ের বার্তাবহ,
বছর কাটে, যুগ কাটে,
তবু তিনি থাকেন –
থাকবেন,
পরিবর্তিত মননের পরতে পরতে।
সুখ, দুঃখের সমাবেশে,
বিষাদ, হর্ষের আলিঙ্গনে,
চেতনায়,
অনুপ্রেরণায়,
জন্ম থেকে মৃত্যুতে।

ছবিতে লাগানো মালাগুলি –
অনেকটাই শুকিয়ে গেছে।
গন্ধটা আজও রয়েছে।

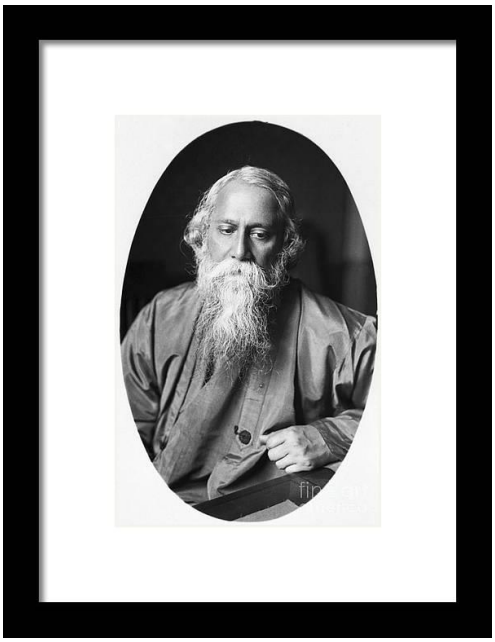

জন্মস্থান

রঙ্গনাথ

আমার জন্মস্থান –
সেথায় আমার প্রথম আগমন
সেথায় শুরু হয় আমার জীবন
আমি কেঁদেছি সেথায় প্রথমবার
হেসেছি দেখে মনোরম চারিধার।
আমি সেথায় শিখেছি কথা বলতে
হাঁটি-হাঁটি পা-পা ফেলে চলতে
আস্তে-জোরে হতে আগুয়ান –
সেটাই হ'ল আমার প্রিয় স্থান।

আমার জন্মস্থান –
যার আকাশতলে পেয়েছি ঠাঁই
তাকে তো আমার ভুলতে নাই!
তার বায়ুতে নিয়েছি প্রথম নিঃশ্বাস
তার জল মিটিয়েছে প্রথম পিয়াস
ভাল লেগেছে তার ফুল ও ফল
ক্ষুধা মিটিয়েছে তার মাটির ফসল
তার মাটিতে হেঁটেছি খালিপায়ে
তার ধুলো মেখেছি সারা গায়ে।

আমার জন্মস্থান –
তা আমার মনে জাগে অহরহ –
সে অপরূপ, নেই কোন সন্দেহ।
এ জন্মভূমির দৃশ্য ভোলা না যায়
স্মৃতিপটে সবকিছু ভেসে বেড়ায়।
তার ভাষা শিখতে লাগেনি স্কুল
সে মাতৃভাষা বলতে হয়নি ভুল।
তার মানুষজন আমার স্বজন
দেখেছি তাদের মধুর আচরণ।

আমার জন্মস্থান –
এ যেন আমার শ্রেষ্ঠ এক পুণ্যস্থান
তার সবকিছু উত্তম, মহা মূল্যবান।
সেথায় পেয়েছি শিক্ষার আলো –
বুঝতে শিখেছি কী মন্দ, কী ভালো।
এ মহাবিশ্বে ঘুরেছি, দেখেছি কতো
পাইনি কোনকিছু জন্মভূমির মতো।
আমার কেন্দ্রবিন্দু আমার জন্মস্থান
সে আমার গর্ব – আমি তার সন্তান।

আমি এক নগণ্য বিন্দু

রঙ্গনাথ

মনে হয়, বিশাল বিশ্বে আমি নগণ্য বিন্দুমাত্র;
অহেতুক ছোটাছুটি, সংগ্রাম করি দিবারাত্র –
ব্যস্ত থাকি, হতে চাই মস্ত ধনী, জ্ঞানীগুণী
চাই সমাদর, গুণগান; প্রশংসা কানে শুনি।
ভাবি যা করি, যা বলি, সব কিছু মহামূল্যবান
চাই লোকে দেয় বাহবা, আমায় ভাবে মহান!

মোর ভাবনায় আছে কিনা ভুল, জাগে সংশয় –
মাথায় এত সাতপাঁচ, সেটা কি পাগলামি নয়?
বড় ও ছোট বিন্দুতে কী তফাৎ! দুটিই মুছে যায়!
কে জানবে তারা কী ছিল; দুটিই পরিচয় হারায়।
হয়তো বা উত্তম, সাধ্যমতো নগণ্য কিছু দিয়ে যাই
তৃপ্ত থাকি; দেখেশুনে, হেসেখেলে দিন কাটাই।

(২০২৩ মে মাসের সাহিত্য সভায় পঠিত)

চোর

রঙ্গনাথ

দেখিনু এক রুগ্ন-লেংড়া এল ঘরে
প্রশ্ন করলাম, 'ঢুকলে কী করে?'
বলল সে, 'দুয়ারটা খোলা ছিল
ওটাই তো আমায় সাহস দিল'।

'তুমি কে, এসেছ কোত্থেকে?'
'চিনতে পারনি আমায় দেখে?
রাত্রে তোমার খাবার ঘরে যা পাই
আমিই চোর সেজে খেয়ে যাই'।

জানতে চাইনু, 'যাওনি কেন সেথা?'
সে বলল, 'পাইনি যা পাওয়ার কথা
কিছুই দেখিনি, একটু হতাশ হলাম;
ভুলে গেছ কিনা জানতে এলাম'।

সে বলল, 'তুমি কি মোরে চেনো?'
বললাম, 'এসব জানতে চাও কেন?'
'দেখেছি ক'বার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া
ভেবেছিলাম, জানো মোর আসা যাওয়া'।

বললাম, 'খাও কি কিছু দিনের বেলা?'
'দিনে জোটে লাঞ্ছনা, ঘেন্না-অবহেলা;
টুকিটাকি যা পাই ক্ষুধা মেটে না তাতে;
তাই পেটের দায়ে আসি প্রতি রাতে'।

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

মিথ্যে বলে আর কতকাল চালাবি তোর পেশা?
পেশার কথা ভুলে এখন মিথ্যে বলাই নেশা।

দুর্নীতি তোর রক্তে মনে, দুর্নীতি তোর কথায়
সাপের থেকেও বিষাক্ত তুই পাঁশ ভরা তোর মাথায়,
কুবুদ্ধিতে দেশ কি চলে, বিশ্ব কি পায় দিশা?
সত্যি করে হেরেও যে তোর মিথ্যে জেতার আশা।
পেশার কথা ভুলে এখন মিথ্যে বলাই নেশা।

নিজের স্বভাব জেনে-বুঝে বলিস যে তায় অন্যে,
ভাবিস নিজে চালাক বড়ই বড়াই যে তার জন্যে।

মিথ্যে বলার শাস্তি রে তোর হচ্ছে জমা ঠিকই,
ভড়ং মেনে কিছু চেলা হলেও হবে মেকি।
সত্যের জয় সকল সময় নয় বাধা তার ভাষা,
ভাবছি শুধু মিথ্যে বলে কী হবে তোর দশা!
পেশার কথা ভুলে এখন মিথ্যে বলাই নেশা।

শিল্পী: রায়ান দাস (বয়স ৬)

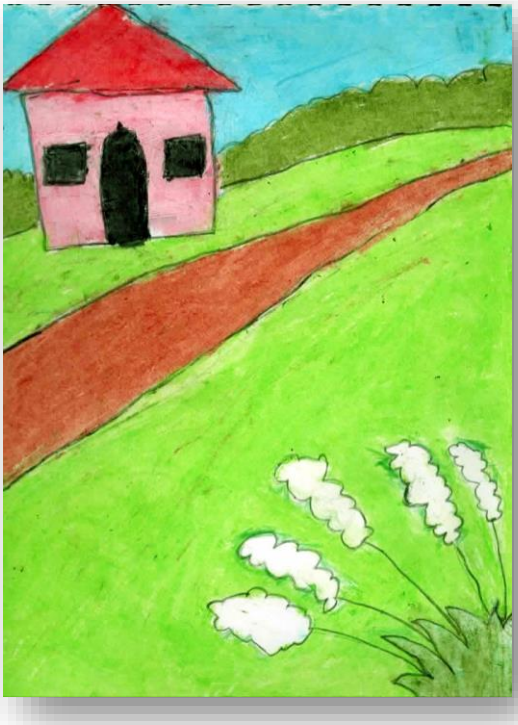

শিল্পী: ঈশায়ু মণ্ডল (বয়স ৬)

কোল্যাটারাল

বিষ্ণুপ্রিয়া

১

এই প্রথম ডিয়েপের বাবার বাড়িতে গেল ঈশিতা। বহু বছর ধরে একসাথে কাজ করে ওরা, যদিও আলাদা ইউনিটে। সকালের ব্রেক টাইমে দুটো ব্লক একসাথে চক্কর দেওয়া ওদের এখন রুটিন হয়ে গেছে। যতটা ভিটামিন ডি আর বিশুদ্ধ বাতাস শুষে নেওয়া যায় শীতের আগে ততটাই ভাল। তাছাড়া অফিসেও কাজের ফাঁকে হাঁটাহাঁটিকে বেশ ভাল চোখে দেখে সবাই। ফিটনেস না থাকলে কাজ করা অসম্ভব। চোখেমুখে হাওয়ার ঝাপটা লাগলে ব্রেনও চনমনে থাকে। অনেকদিনই ওরা দুজন একসাথে লাঞ্চ করে নীচের ক্যাফেটেরিয়াতে বা 'পানেরা' অথবা 'কাভাতে'। গ্রীনস, গ্রেইনস আর কোন না কোনও প্রোটিনসহ স্যালাড বোল নিয়ে নানা গপ্পোসপ্পো। কিন্তু কেন যেন ডিয়েপের বাবাকে নিয়ে কখনই কথা ওঠেনি, তাই ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ঈশিতার।

আজ হঠাৎ chicken wrap খেতে খেতে ডিয়েপ বলল, "মনটা খারাপ। এই তো পরশুই হাসপাতাল থেকে বাবা বাড়ি ফিরল, আর আজ সকাল থেকে আবার জ্বর। ভোরবেলা একবার দেখে এসেছি। একটু স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই মুখে নিল না। কী যে করব বুঝতেই পারি না। ক্রমশই খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন একবার দেখে আসব। লাঞ্চ শেষ হতে আধঘন্টা বাকি। যাবে সঙ্গে? কাছেই…"

ঈশিতা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

- "কে থাকে ওঁর সাথে?"

- "বাবা একাই থাকে। আমরা দু'বোন থাকি কাছাকাছি, কিন্তু কোনো মেয়ের সংসারেই বাবা থাকবে না।"

বাবার কথা মনে পড়ল ঈশিতার। আজকাল বেশি করে মনে পড়ে। দু'দশকের ওপর ঈশিতা এদেশে। প্রথমে PhD, তারপর পোস্ট ডক, তারপর চাকরি। সেই থেকেই তো বাবাকে একলা থাকতে হয়েছে দেশের ওই ছোট্ট মফস্বল শহরের পৈতৃক বাসায়। দাদুর বানানো অসংখ্য স্মৃতি-বিজড়িত বাড়ি। মা চলে যাবার পর অসম্ভব একা হয়ে গিয়েছিল বাবা। সবই বুঝত ঈশিতা কিন্তু এত দূরে বসে দুর্ভাবনা ছাড়া আর কী করেছে! তিন বছর হ'ল বাবাও চলে গেছে। শুধু পড়ে আছে ঈশিতার ছেঁড়া ছেঁড়া জীবন। কোথায় মাটি, কোথায় বাসা, কোথায় শিকড় কেউ আর বলে দিতে পারে না ওকে। দাদু আর বাবার সময় একটা কেমন নিশ্চিন্ততা ছিল। ভিটেমাটি ছেড়ে কেউ কোথাও যায়নি। ঈশিতাই প্রথম সাত সমুদ্র পেরিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে এসে থেকেই গেল। এখন ওই পুরনো জরাজীর্ণ বাড়িটায় গেলে কান্নায় ভিজে থাকে কয়েকটা দিন। একটা চাপা ব্যথা ছেয়ে ফেলে মনটাকে।

- "আর তোমার মা?"

ডিয়েপ কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলল, "মা থাকে আমার ছোট বোনের কাছে, নিউটনে।"

- "ও তাহলে তো বেশ দূর, সাসেক্স কাউন্টিতে!"

"দূরই ভাল। কাছাকাছি হলেই সারাক্ষণ খন্ডযুদ্ধ। সে কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাবার এক মহিলাকে ভাল লেগেছিল, তারই জের টেনে আজও বাবাকে মা'র রাগের মুখোমুখি হতে হয়। অনেক ব্যর্থতা এখনো জমে আছে মা'র মনোভূমিতে। মাঝে মাঝেই সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। এইজন্যে বাবা সারাজীবন কোণঠাসা। প্রেম কখন বা কীভাবে কড়া নাড়ে কেউ কি বলতে পারে, বলো তো? মা সেটা বুঝতেই চায় না। বাবা কিন্তু মাকে কখনো অবহেলা করেনি। আমাদেরও খুব যত্নে বড় করেছে। সম্পর্কের জটিলতা শুধু মানুষই বহন করে। কেবল অনর্থক একগুঁয়েমি আর রাজ্যের অভিমানের পাহাড় গড়ে তোলা। তাকে ঠেলতে ঠেলতে সব আবেগ চিঁড়েচ্যাপ্টা। কারুরই কোন কাজে দেয় না। কিন্তু আইনমতো ডিভোর্সের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। অথচ মা'র হাসপাতালে যাওয়া চাই-ই চাই। আমার কাছে ছিল এই ক'দিন। পরশু বাবা বাড়ি ফিরলে মা নিউটনে রওনা হয়ে গেল। রাগ, অভিমান, আবেগ, ভালবাসা, মায়া মনের নানা কুঠুরিতে রাখা থাকে। আমরাই নাস্তানাবুদ। ট্রুসের সাদা পতাকা হাতে নিয়ে ঘুরছি তো ঘুরছিই।"

২

ওরা এসে পড়েছিল। দোতলায় ছোট্ট দুটো বেডরুম, লাগোয়া বাথরুম আর নীচে লিভিং, ডাইনিং স্পেস, রান্নাঘর আর হাফ বাথ নিয়ে ছিমছাম একটা টাউনহোম। পেছনের প্যাটিওতে একটা ইলেকট্রিক গ্রিল রাখা আছে।

উনি শুয়েছিলেন চোখ বন্ধ করে। শীর্ণ, অত্যন্ত দুর্বল কুঁকড়ে

যাওয়া এক বৃদ্ধ। যাঁর সব কাজ যেন সারা হয়ে গেছে। এখন কেবল অজানার প্রতীক্ষা।

ডিয়েপ পরম যত্নে মাথায় হাত রাখতেই, উনি চোখ খুললেন। ক্ষীণ ক্লান্ত হাসিটা চোখে ফুটে উঠেই নিভে গেল যেন। ভীষণ মায়া হ'ল ঈশিতার এই অসহায় মানুষটির ওপর। আবারও তার বাবার মুখটা ভেসে উঠল। মেয়েদের কাছে সব বাবারাই যে এক! ডিয়েপ চিকেন স্যুপ আনতে গেছে নীচে। সকালে ফ্রিজে রেখে গিয়েছিল।

জানলার বাইরে ঝলমলে রোদে মরশুমি ফুলগুলো চিকচিক করছে। নিশ্চয়ই এই মানুষটি এক সময় চারপাশের জীবনরঙ উপভোগ করতেন, মন দুলে উঠত আনন্দে শিশুর হাসি-খেলায়, প্রেমের নিবিড় স্পর্শে। এখন এক অনন্ত থেমে থাকা এই নির্বাক, নির্লিপ্ত দিনান্তবেলা।

হঠাৎ ঈশিতার অবাক চোখ আটকে গেল দেওয়ালে টাঙানো ইউনিফর্ম পরা এক সৈনিকের ছবিতে। এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দৃপ্ত ভঙ্গি, গর্বিত হাসি, নানা মেডেলে সুসজ্জিত মানুষটি কে?

ডিয়েপের বাবা কিছুতেই একটুও স্যুপ খেলেন না, না খেলেন আপেলের একটিও কুচি। ডিয়েপ চিন্তিত মুখে থালা-বাটি নাইটস্ট্যান্ডে নামিয়ে পাশে বসে বাবার মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল। ওঁর ক্লান্ত চোখে এখন মমতার ঝর্ণা। ডিয়েপের কানে কানে কিছু বললেন।

বাষ্পভেজা গলায় ডিয়েপ বলল, "বাবা এখন ক্বচিৎ কদাচিৎ খুব আস্তে আস্তে শুধু ভিয়েতনামীজ ভাষাতেই কথা বলে। ইংরেজি একেবারেই ভুলে গেছে। কোন শব্দই আর মনে করতে পারে না। কথা খুব দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে গেলেই চোখ ভিজে যায়।"

ঈশিতা এতদিন জানত ভাষা জানাটা হাঁটার মতো। ভোলা যায় না একবার শিখলে এবং চর্চায় থাকলে।

- "ট্রমা সব ভুলিয়ে দিতে পারে। ওই যে দেখছ ছবি, ওটা বাবার, ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় তোলা। তখনও বন্দী করা হয়নি বাবাকে। দশ বছরের কারাবাস জীবনের বেশিটাই কেড়ে নিয়েছে।"

- "যুদ্ধের এত বছর পরেও...?"

- "এ যন্ত্রণা আমরণ, ঈশিতা। ওষুধ বা থেরাপি কোনটাই এই ব্যথাকে উপড়াতে পারে না। গাঢ় সেডিমেন্ট থেকেই যায়।"

কখন যেন আমাদের কথা শুনে উনি উঠে বসেছেন বিছানায়। শিশুর মতো আঁকড়ে ধরেছেন মেয়েকে। অঝোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ডিয়েপের বুক ভিজে যাচ্ছে ওঁর কান্নায়। তাড়াতাড়ি বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল ডিয়েপ, "সব ঠিক আছে বাবা। ওসব যুদ্ধ থেমে গেছে। আর হবে না।"

বাবাকে কিছুটা শান্ত করে, শুইয়ে দিল ডিয়েপ। ইতিমধ্যে একটি ধবধবে সাদা বেড়াল গুটিশুটি হয়ে বিছানায় ওঁর কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। খুব তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করে বিরাট একটা হাই তুলল। ওর নরম তুলতুলে গায়ে আদর করে এই প্রথম ডিয়েপ একটু হাসল।

- "আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস নায়লা। নাইল নদীর মতো নীল চোখ বলে ওর নাম নায়লা। খুব আয়েশী। বাবার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী, থেরাপিস্টও।

চলো, এবার আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি অফিসের দিকে। বাবা এখন ভালই থাকবে যতক্ষণ নায়লা পাশে থাকবে।"

৩

স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে ঈশিতা ডিয়েপের দিকে তাকাল। মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে।

- "পৃথিবীতে যুদ্ধ কি কখনো থামবে ডিয়েপ?"

- "জানি না। হয়তো না। তবে বাবাকে অন্য কোনও কথা বলে ভোলানো যায় না। ব্রেন সম্পূর্ণ ড্যামেজড্। PTSD নিয়েই থাকা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়িত্ব এড়ায়নি। পৃথিবীর আর কোনো দেশ এইভাবে অপর পক্ষের সৈনিককে সম্মান দেখায় কিনা আমার জানা নেই। হিউম্যান রাইটসের প্রশ্ন এসে পড়ে। কিন্তু এদেশ শুধু বাবাকেই নয়, আমাদের সবাইকে মার্কিন নাগরিকত্ব দিয়েছে। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা এবং চাকরি করে নিজেদের জীবন গুছিয়ে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে। বাবার ট্রমা ইনফর্মড্ থেরাপির সব খরচ সরকার বহন করেছে। এর বেশি ক্ষতিপূরণ আর কী দেবে?

- "এই বাড়িও কি সরকারের দেওয়া?"

- "না। অ্যামেরিকান যুবতী বিধবা মিসেস পোলগার যুদ্ধের সময় মার্কিন শিবিরের নার্স ছিলেন। ওই বীভৎসতার মধ্যেও কিন্তু প্রেম জন্মাতে পারে। বাবা ও মিসেস পোলগার একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। ফিরে এসেও মাঝে মধ্যে চিঠিতে

যোগাযোগ করতেন। উনি মারা যাবার আগে নিজের এই ছোট্ট বাড়িটা বাবাকে দিয়ে গেছেন। তাই তো মা এখানে কিছুতেই থাকবে না।"

যুদ্ধের কী মর্মান্তিক পরিণতি! কত জীবন তছনছ হয়ে যায়। কোল্যাটারাল ড্যামেজ। যুদ্ধ বিরতি এত ক্ষণস্থায়ী যে পুরোপুরি সেরে ওঠার সময় পায় না কেউ। কিন্তু ক্ষত আর ক্ষতির হিসেব নিয়ে বাঁচাও যে বড় শক্ত! এলিভেটারে উঠতে উঠতে ঈশিতার আবার শিকড়ের কথা মনে হ'ল। সারা পৃথিবী জুড়ে কত মানুষ কতভাবে শিকড় বাকড় ছিঁড়ে অন্য মাটিতে শিকড় গাড়ছে। কেউ কিছু পায়, কেউ বা অনেক কিছু হারায়!

অসমাপ্তি

সুজাতা দাস

স্মৃতির মণিকোঠা থেকে ভেসে আসা 'মণি' ডাকটা অনেক বছর পরে মণিমালাকে আবার নতুন করে মনে পড়িয়ে দিল উৎসর কথা, যাকে একবারের জন্যও আর মনে করতে চায় না মণি; তবুও কেন যে সে বার বার মনে আসে, আর মণিমালার সমস্ত হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে যায়! কেন এই ভাবনা মনে করাতে চায় তার না পাওয়াকে, যা সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে একদিন। ভালই তো আছে মণি নিজের ছোট্ট জীবনটা নিয়ে। উৎসর জীবন থেকে দূরে, বহু দূরে, যেখানে চাইলেও উৎস আর কখনও পৌঁছাতে পারবে না। সে তাকে আর কখনও খুঁজে পাক, সেটাও চায় না মণিমালা। তবুও মনটা ঘুরে ফিরে চলে যায় ফেলে আসা সেই জীবনটার দিকেই।

আর ভাবতে পারে না মণিমালা, নিজেকে মেলে ধরে নিজের হাতে গোছানো বিছানায়। আজ হাসপাতালে প্রচুর খাটুনি হয়েছে, তবুও ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম আসতে চায় না তার। অনেকগুলো বছর এখানে কাজ করছে সে; সেই তখন থেকে, যখন সংসার আর উৎসকে ছাড়তে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। সেই উৎস, যে একদিন নিজে যেচে এসেছিল তার জীবনের অংশ হতে, সে নিজেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, বিয়ের মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই।

আসলে হয়তো সে নিজেই ভুল ভেবেছিল, যখন বাবাকে বলেছিল উৎস তাকে বিয়ে করতে চায়।

বাবা বলেছিলেন, "ওরা আর আমরা! এমন সম্পর্ক কি ঠিক হবে, মা?"

সত্যিই ঠিক হয়নি; মানসিকতার তফাৎ প্রতি মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল তার আত্মদর্শনকে।

উচ্চ মাধ্যমিকের পর, বাবা যখন সায়েন্স নিয়ে পড়তে বললেন, কেন জানি মণির মনে হয়েছিল, এমন কিছু ওর পড়া উচিত, যেটাতে ও তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। সংসারে অনেক লোক, কিন্তু রোজগার করেন শুধুমাত্র বাবা। দাদা যে কী করে, কিছুই বুঝতে পারে না মণিমালা, অনেক রাতে চুপি চুপি ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। মনে হয় দাদা জানে না, মণি এই সময়টা পড়াশোনা করে। তাই দাদার চলাফেরার

এই নিঃশব্দতাটা মণি টের পায় ভাল করে। কত ভাল ছিল ওর দাদা, অপূর্ব চৌধুরী, যেমন খেলাতে, তেমন পড়াশোনায়, সব কিছুতেই এক নম্বর। কেন যে, পাল্টে যাচ্ছে দাদা!

বাবার দিকে তাকালে কষ্ট হয় মণির – নিজের ভেতরটাকে সবার থেকে আড়াল করে মুখে সর্বদা হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন বাবা। শুধুমাত্র দুটি মানুষ বোধহয় ঐ ভেতরের মানুষটার খবর পায়, মণির মা, অমলা চৌধুরী আর মণি নিজে। হঠাৎ ভাবনারা এলোমেলো হয়ে যায়। কখন যেন ঘুমের দেশে পৌঁছে যায় মণিমালা।

হঠাৎ মণি দেখে তার খাটের পাশে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন সেই হাসিমাখা মুখ নিয়ে। বললেন, "সবসময় কী এত চিন্তা করিস, মণি? আমি আছি তো তোর সাথে সবসময়, চিন্তা কি তোর?"

মণিমালা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল 'বাবা' বলে।

- "তুমি আমার কাছে থাকবে বাবা?"

- "আমি তো তোর কাছেই আছি মণি, শুধু তুই বুঝতে পারিস না।"

একটু হেসে বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন যাবার জন্য। মণি বাবার হাতটা ধরতে গেল, কিন্তু ধরতে পারল না কিছুতেই। 'বাবা বাবা' বলে দৌড়ে গেল মণি – আর ঠিক তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল। অবাক হয়ে চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ, ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল মণিমালার। এখনও বাইরে অন্ধকার, অন্ধকারের দিকে তাকিয়েই ভাবতে লাগল মণি, বাবার কথা।

বাবা বোধহয় ঠিকই চিনেছিলেন উৎসর পরিবারের সকলকেই। কিন্তু মণিমালার সেই সময় উৎসর কোনও খারাপই চোখে পড়েনি, তাই ওসব নিয়ে ভাবতেও চায়নি।

মণিময় চৌধুরী, মণির বাবা রাশভারী হলেও মুখে সর্বদা একটা হাসি লেগে থাকত। মণিরা দুই বোন – অনসূয়া ও মণি, দুই ভাই – অপূর্ব আর মহেন্দ্র; বাবা-মা সব মিলিয়ে ছ'জনের সংসার। মণির ঠাকুরদা চৌষট্টির গন্ডগোলের সময় সপরিবারে ভারতে এসে সোজা জলপাইগুড়ি চলে যান, আর ওখানেই বসবাস শুরু করেন। তখনকার জলপাইগুড়ি এখনকার মতো ছিল না। চারিদিকে জঙ্গল, সন্ধ্যা নামলেই হিংস্র পশুদের আনাগোনা। ঠাকুরদা, সেখানকার চা বাগানের 'বাগানবাবু' ছিলেন, মণি অবশ্য ঠাকুরদাকে দেখেনি। মণির ঠাকুরদা মানবেন্দ্র চৌধুরী, চাকরি করতে করতেই নতুন পাড়ায় ছোট একটি জমি কিনেছিলেন, অবসরের পরে ওই জমিতেই বাড়ি করলেন তিনি।

মণির বাবা চা বাগানে চাকরি করলেন না। তিনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন, তাই তাঁর পরিশ্রমও ছিল খুব। তা সত্ত্বেও বাবার মুখের হাসিটি ছিল অমলিন, যা এই কষ্টের সংসারকে শান্তির প্রলেপ দিত।

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজে সম্বিত ফিরল মণিমালার। দরজা খুলে দেখল, পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে।

- "তোমার কি শরীর খারাপ দিদি?" পদ্ম ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করল।

- "না তো, কেন রে?"

- "কখন থেকে তোমাকে ডাকছি... সাড়া না পেয়ে ভাবলাম কি জানি শরীর খারাপ কিনা।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হ'ল মণি। এতটা বেলা হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি। হাসপাতালে যেতে দেরি হয়ে যাবে আজ।

কত বছর পরে বাবাকে দেখতে পেল, সেই হাসিটা এখনও তেমনই আছে। সত্যি সত্যিই বাবা ওর সাথেই আছেন! একবার চারদিকটা দেখে নিল সে।

- "কী চিন্তা করছ দিদি, কখন থেকে ডাকছি।"

- "কিছু না রে, কি বলছিলি বল।"

- "কী খাবে?"

- "তুই রোজ কেন জিজ্ঞাসা করিস?" বলে, স্নানে চলে গেল মণিমালা, কিন্তু ভাবনারা সাথেই রইল। কীসের সংঘাত ছিল? আত্মশ্লাঘা, আত্মাভিমান না আত্মসম্মান কোনটা? আজও বুঝে উঠতে পারেনি মণিমালা।

এই বাড়িতে পদ্মর অনেকগুলো বছর হয়ে গেল। সকালে ঢোকে, রাতে চলে যায়। দিদিকে এমন অন্যমনস্ক থাকতে কোনওদিন দেখেনি সে।

হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরী হয়ে মণিমালা এক কাপ লিকার চা, আর একটা বিস্কিট খেয়ে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে পদ্ম বলল, "এমন চললে তোমার শরীরখারাপ কেউ আটকাতে পারবে না। তখন তোমার জন্যই নার্স লাগবে।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে মণিমালা বলল, "তুই তো আছিস, চিন্তা কি..."

কোয়ার্টার থেকে হাসপাতাল দশ মিনিটের রাস্তা, তাই মণিমালা

হেঁটেই যাতায়াত করে | নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাসপাতালের গেটের কাছে চলে এল | মঞ্জরীদির ডাকে ফিরে তাকাল | একটু হেসে এগিয়ে গেল মঞ্জরীদির সামনে |

- "শুনেছিস কিছু?" বললেন মঞ্জরীদি |

- "কী শুনব!"

- "শিগগিরি ভেতরে যা, তোর জন্যই অপেক্ষা করছেন ডক্টর বাসু |"

মণিমালা একটু অবাক হয়েই তাকাল মঞ্জরীদির দিকে | ইশারায় ওকে ভেতরে যেতে বলে, বেরিয়ে গেলেন মঞ্জরীদি |

মণিমালা ও.টি. নার্স | ডক্টর বাসুর অপারেশন থাকলে, আগে থেকে ফোন করে জানিয়ে দেন মণিমালাকে | ডক্টর বাসু অর্থোপেডিক সার্জেন | হঠাৎ তার খোঁজ কেন ভাবতে ভাবতেই পা চালাল মণিমালা | এমারজেন্সির সামনে প্রচুর ভিড়, তাই পাশের রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢুকল | দোতলায় ও.টি.-র সামনে দিয়ে যাবার সময় মনে হ'ল কেউ যেন খুব আস্তে মণিমালার নামটা উচ্চারণ করল | এক সেকেন্ড থমকাল মণিমালা, তারপর তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল ও.টি.-তে | পোশাক বদলে যখন অপারেশন টেবিলের সামনে এল, টেবিলে রক্তাক্ত চেনা মানুষটিকে দেখে, চিৎকার করে বসে পড়ল টেবিলের সামনে | অঝোর ধারে চোখে জল এল | এত বড় অ্যাক্সিডেন্ট কেস সচরাচর এই ছোট হাসপাতালে আসে না | কিন্তু ডক্টর বাসুর হাতযশের কারণে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে ঘটা দুর্ঘটনার পেশেন্টকে এখানেই নিয়ে এসেছেন পরিবারের সদস্যরা |

ও.টি.-র ভেতরে প্রত্যেকেই পেশেন্টকে নিয়ে যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ মণিমালার কান্নায় সবাই হকচকিয়ে গেল! কিন্তু সেটা মাত্র কিছুক্ষণের জন্য | মণিমালাও নিজেকে সামলে নিল তাড়াতাড়ি | চোখ মুছে, ডক্টর বাসুর সাথে সহযোগিতা করতে থাকল | একটুর জন্যও আর নিজেকে ভেঙে পড়তে দিল না মণিমালা | কিন্তু কাজের ফাঁকে বারে বারে মনে আসছিল তার আর উৎসর শেষের দিনগুলোর কথা, যেগুলো এখনও ভাবলে কষ্ট হয় | উৎসর মায়ের খুব একটা পছন্দ ছিল না মণিমালাকে; কিন্তু ছেলের পছন্দের জন্য কিছু বলতে পারেননি তিনি | যখন ওদের বিয়ে হ'ল, তখন মালদা মেডিকেল কলেজে চাকরি করছে মণিমালা | বিয়ের কিছুদিন পরে কলকাতায় চাকরি পেয়ে গেল সে | ওখানকার স্টাফ কোয়ার্টারেই থাকার ব্যবস্থা হ'ল |

কলকাতায় যাওয়ার ঠিক দুদিন আগে হঠাৎ উৎস মণিমালাকে ডেকে বলল, "কলকাতায় চাকরি নেবার দরকার নেই |"

- "কেন?" বলে উঠল মণিমালা |

- "সব কেনর উত্তর হয় না মণি, আমি যখন বলছি তখন যেতে হবে না |"

হাজারো ভাবনার ভিড়ে সাতঘন্টা বাদে যখন অপারেশন শেষ হ'ল, ডক্টর বাসু মণিমালার দিকে তাকালেন | একটু হাসলেন, সোয়াস্তির হাসি | বললেন, "চিন্তা কোরো না মণিমালা, সব ঠিক আছে |"

কিন্তু যতক্ষণ না উৎসকে বেডে দেওয়া হ'ল, ততক্ষণ মণিমালা দাঁড়িয়ে রইল উৎসর সামনে | অনেক বছর পরে দেখল উৎসকে, একই রকম আছে | ছিটকে পড়ার কারণে পায়ের হাড় ভেঙেছে, আর বুকের একটা হাড় তিন টুকরো হয়ে গেছে | কপালে অনেক'কটা স্টিচ হওয়ার জন্য মাথায় ব্যান্ডেজ হয়েছে, ব্রেনে কোনও আঘাত লাগেনি | লাগলে কী হতে পারত ভেবে মণিমালার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল | উৎসকে ও.টি. থেকে আই.সি.ইউ.-তে নেবার পর মণিমালা বেরিয়ে পড়ল নিজের কোয়ার্টারের দিকে | সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ | মানসিক ও শারীরিক ধকলে মণিমালা আজ বিধ্বস্ত |

মণিমালাকে কোয়ার্টারে ঢুকতে দেখে পদ্ম বলল, "সবকিছু গুছিয়ে রেখে গেলাম দিদি |" বলে বেরিয়ে যেতে গিয়ে, মণিমালার দিকে তাকিয়ে সে হতবাক হয়ে গেল | এক বেলায় এ কী চেহারা হয়েছে দিদির!

- "তোমার কী হয়েছে দিদি? আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে থেকে যাচ্ছি |"

মণিমালা বলল, "তুই বাড়ি যা পদ্ম, আমি ঠিক আছি |"

মুখে কিছু না বলে ভেতরে ঢুকে গেল পদ্ম | যেতে যেতে বলল, "গিজারটা অন করে দিলাম, তুমি ভাল করে স্নান করে এসো | আমি চা দিচ্ছি |"

তবুও মণি চুপ করে বসে রইল | আর তার মন ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে থাকল অনেক পিছনে |

দাদার চুপি চুপি আসা যাওয়ার দিকে খেয়াল করলে, মণির ভয় লাগত | কিছু খারাপ কাজ করছে কি দাদা! জিজ্ঞাসা করত নিজেকেই | মাঝে মাঝে রাতের বেলায় বেশ বড় বাক্স নিয়ে

ঢুকতে দেখেছে সে দাদাকে | জলপাইগুড়ি থেকে ভুটানের সামচি বর্ডার মাত্র চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে | কোনও খারাপ কাজে দাদা জড়িয়ে পড়ছে ভেবে আতঙ্কে ঠান্ডা হয়ে যেত মণিমালা |

'না না, দাদা এমন কাজ করতে পারে না,' এ কথাও সে মনে মনে ভাবত | সে যে মণিময় চৌধুরীর বড় ছেলে | দাদা কখনও খারাপ কাজ করতেই পারবে না |

এরপর নিজের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মণিমালা, পরীক্ষায় ভাল ফল করে নার্সিং ট্রেনিং নিতে কলকাতায় চলে গেল | ছুটিতে সব সময় বাড়ি যেতে পারত না খরচ বেশি হবে বলে | এক সকালে তার হস্টেলে খবর এল যে দাদা মারা গেছে বর্ডারে মাল দেওয়া নেওয়ার সময়, বর্ডার গার্ডের গুলিতে | সেই রাতের বাসেই রওনা দিল মণিমালা |

এই বাসেই প্রথম সে দেখেছিল উৎসকে | দাদার মৃত্যুর খবরে বিধ্বস্ত মণিমালার তখন বেসামাল অবস্থা | নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করেও চোখের জল আটকাতে পারছে না | বাবার অসহায় মুখ মনে আসছে | সেই অবস্থায় মণিমালার সাথে নিজে থেকেই আলাপ করেছিল উৎস | আর ওই অল্প পরিচয়েই দাদার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিল মণিমালাকে |

কদমতলা বাসস্ট্যান্ডে নেমে, রিক্সা নিল মণিমালা, সে সময়ও সাথে ছিল উৎস | রিক্সাওয়ালা রূপশ্রী সিনেমার সামনে দিয়ে, থানাটাকে বাঁদিকে রেখে, করলা নদীর পাশ দিয়ে গিয়ে নতুন পাড়ায় রিক্সা দাঁড় করাল |

রিক্সা থেকে নেমে দেখল বাড়ির সামনে অনেক লোক | ওকে দেখে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন মা | মণিমালা বাবার দিকে তাকাল, ঐ সদাহাস্য মানুষটাকে চেনা যাচ্ছে না আর | একদম চুপ হয়ে গেছে এই দু'দিনে | মণিকে দেখে বলল, "একবারের জন্যও কিছু বুঝতে পারলাম না; কেমন বাবা আমি?"

পদ্মর ডাকে হুঁশ ফিরল | অবাক হয়ে মণিমালা বলল, "তুই বাড়ি যাসনি পদ্ম? তোর বাবার শরীর খারাপ, এটা কিন্তু তুই ঠিক করলি না |"

- "আমি পাশের বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি দিদি; চিন্তা করো না | তুমি এখনও বসে আছ? স্নান করতে যাবে না?"

- "যাচ্ছি" বলে স্নানঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল বুকের মধ্যে এত ব্যথা জমে থাকে কেমন করে!

স্নান সেরে বেরিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে যাবার সময় হঠাৎ কলিং বেলটা আওয়াজ করে উঠল | এ সময়ে কে হতে পারে! দরজার দিকে এগিয়ে গেল মণিমালা | দরজা খুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, আর অস্ফুটেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "মণিমা, আপনি!"

- "বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকব? ভেতরে ডাকবি না মালা?" মণিমা বললেন |

হঠাৎই সামনে মণিমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল মণিমালা | মনে মনে ভাবল ও.টি-তে ঢোকার মুখে হালকা স্বরে 'মণিমালা' ডাকটা কি তাহলে মণিমারই ছিল! আসলে, সেই সময় তাড়া ছিল বলে দেখার সুযোগ হয়নি | কিন্তু কার কাছ থেকে মণিমা তার কোয়ার্টারের খবর পেল!

সাতপাঁচ ভাবনার মধ্যেই তথাকথিত মণিমা জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ভাবছিস মালা, আমি কি ফিরে যাব?"

চমকে উঠে মণিমালা, বলল, "না না, আপনি ভেতরে আসুন |" মণিমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে মণিমালা ভিতরে চলে গেল | নিঃশব্দ কান্না কি গলার কাছে আটকে থাকে? বুকের ভেতরে এত কষ্ট হচ্ছে কেন! এমন তো হবার কথা নয় – মনে মনে ভাবল মণিমালা | নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে জলের গ্লাস হাতে বাইরের ঘরে ঢুকল |

- "কেমন আছিস, মালা?"

একটু হেসে মণিমালা বলল, "ভাল"|

- "তোকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করবার জন্য আমি তোর কাছে আসিনি |" বললেন মণিমা |

অবাক দৃষ্টিতে মণিমার দিকে তাকাল মণিমালা |

মণিমাই বলে চললেন – ওঁরা বিষ্ণুপুরে যাচ্ছিলেন গাড়ি করে, গাড়ি উৎসই চালাচ্ছিল | তিনি তাকালেন মণিমালার দিকে; বললেন, "তুই তো জানিস, উৎস কত ভাল চালায় | হঠাৎ এক বা দেড় কিলোমিটার আগে, গাড়ি দাঁড় করিয়ে জল আনতে গেল উল্টো ফুটপাথের দোকানে | জল নিয়ে রাস্তা পার হবার সময় একটা লরি এসে... কেমন করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কী যে হয়ে গেল বুঝবার আগেই সবাই ওকে ওই হাসপাতালে নিয়ে গেল | তোকে সেখানে দেখতে পাব, এ যে স্বপ্নেরও অতীত মালা! একটু অবাক হয়ে, ঐ অবস্থাতেও একজনকে

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে তুই ওই হাসপাতালের একজন ও.টি. নার্স | মিথ্যে বলব না, শুনে একটু ভয়ও পেয়েছিলাম |"

- "মণিমা" বলে জোরে কেঁদে উঠল মণিমালা | "আমি এতটা খারাপ নই |"

- "আজ আমি বুঝেছি মালা | আমি ভুল ছিলাম, পারলে আমাকে ক্ষমা করিস | তোকে দেখতে পেয়ে ডেকেছিলাম আমি, তুই শুনতে পাসনি বোধহয় তখন | তারপর উৎসকে বেড়ে দেওয়ার পর তোকে অনেক খুঁজেছি, মালা | কিন্তু তুই কখন হাসপাতাল থেকে চলে গেছিস, তা কেউ বলতে পারেনি আমাকে | পরে একজন এসে দেখিয়ে দিল তোর কোয়ার্টার |" বলতে বলতে, অঝোরে কাঁদতে লাগলেন ভদ্রমহিলা |

মণিমার দিকে তাকিয়ে মণিমালা বলল, "আমার কোনও কৃতিত্ব নেই এখানে | ডক্টর বাসু সত্যিই খুব ভাল ডাক্তার এবং ভাল মানুষও; আমাদের কাছে উনি ভগবান | আমি না থাকলেও, একই পরিষেবা পেতেন আপনারা |"

- "একটা সামান্য কারণে আজ তোরা দুজনে দুদিকে |" বললেন মণিমা |

- "সত্যিই কি সামান্য ছিল, মণিমা? সম্পর্কে বিশ্বাসটাই বোধহয় সবকিছু | যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে সম্পর্ক কীভাবে থাকে? অবিশ্বাস শব্দটাকে আমি ঘৃণা করি মণিমা, যা আজও আমাকে কুরে কুরে খায় | আজ আর এসব ভেবে কী লাভ, মণিমা? সব হারিয়ে একলা চলার মন্ত্রটা শিখে ফেলেছি এতদিনে | তাই কোনও অভিযোগ রাখিনি মনের মধ্যে |"

টুকটাক কথা চলার মাঝেই জোর করে মণিমাকে খাইয়ে দিল মণিমালা আর পদ্ম মিলে |

- "এবার আমি আসি |" বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা; তারপর বললেন, "একবার কি ভাববি মালা, আবার?"

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে, মণিমালা মণিমাকে প্রণাম করে, মণিমার হাতদুটি ধরে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, "শুধু যাবার আগে কথা দিন মা, আর কখনও আসবেন না এখানে |"

বিস্মিত মণিমা তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ মণিমালার দিকে |

মণিমালা বলে চলেছে, "আর উৎসও যেন জানতে না পারে কোনদিন এই হঠাৎ করে পাওয়া কিছুটা সময়ের কথা | ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম মা, কোনদিন যদি ভুল করেও দেখা হয়ে যায়, ফিরে যাব বিপরীত দিকে |"

- "মালা..." মণিমা শুধু একবার তাকালেন মণির দিকে | তারপর মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকলেন |

আর পেছনে ঘুরে দেখলেন না, কারণ তিনি জানেন, মণিমালাও তাঁরই মতো অঝোরে কাঁদছে |...

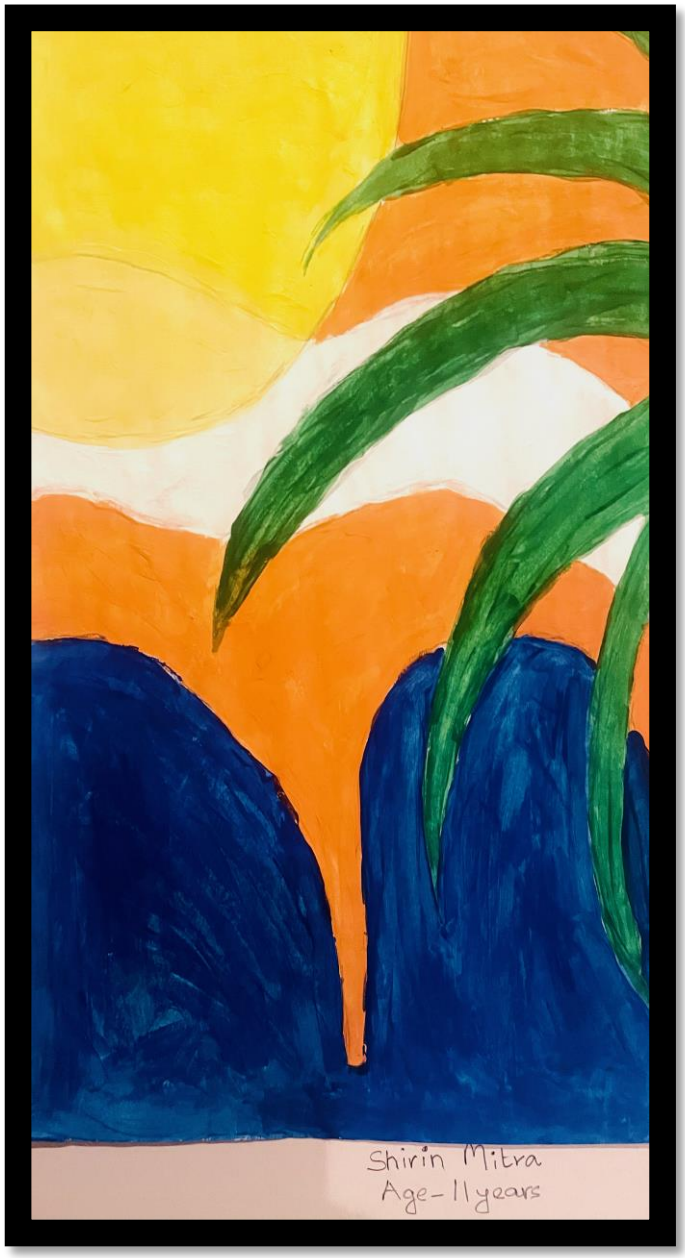

শিল্পী: শিরিন মিত্র (বয়স ১১)

রনিকার লক্ষ্যভেদ

শান্তনু চক্রবর্তী

ম্যাকালেন কনভেনশন সেন্টারের এই বিপুল জনসমাগমের মধ্য থেকে আমার মেয়েটিকে চিনে নিতে চাও তোমরা? খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়! এসো, চিনিয়ে দিই। তোমরা যারা এখানে আগে এসেছ, তারা নিশ্চয়ই দেখেছ প্রথম সারিগুলোতে ফ্যাকাল্টিরা বসেন, তার পেছনে পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্তরা, তার পেছনে যারা মাস্টার্স ডিগ্রী পেতে চলেছে তারা, আর সবার পেছনে ব্যাচেলর্স ডিগ্রীপ্রাপ্তরা। আমার মেয়ে রয়েছে ওই মাস্টার্সের দলে। ওর নিজের বাপ-মায়ের দুই ফ্যামিলি মিলিয়ে ওই প্রথম মাস্টার্স। ইংরেজিতে মাস্টার্স ডিগ্রী পাবে সে আজ। আরও ছ'মাস আগেই পেত যদি না...।

তিনটি কলাম করে সবাইকে বসানো হয়েছে, সে এই তিন কলামের মধ্যে মাঝের কলামটিতে, সাত নম্বর সারিতে; যদি ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়াও তো সাত নম্বর সারির এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত – হ্যাঁ, সাতজনকে ছেড়ে আট নম্বর চেয়ারটিতে রয়েছে সে। এছাড়া এই তিন কলামের ডানদিকে এবং বাঁদিকে রয়েছে ডিগ্রীপ্রাপ্তদের পরিবারবর্গ।

সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। গতকাল রাতেই এসে গিয়েছিল দানিয়েলার বোনেরা, সঙ্গে তাদের বরেরা, বাচ্চারা। সবাইকে এক বাড়ীতে ধরানো যায়নি, তাই কাউকে কাউকে থাকতে হ'ল রবের্তোর বাড়ীতে, কাউকে বা প্রতিবেশিনী ভ্যালেরিয়ার বাড়ী। ওরা সবাই, রবের্তোর ফ্যামিলি, ভ্যালেরিয়ার ফ্যামিলি, সঙ্গে দানিয়েলা, এরিবের্তো, রিগোবের্তো, আলবের্তো এবং সে, যার গ্র্যাজুয়েশন উপলক্ষ্যে এই পারিবারিক জমায়েত। সে-ই আজকের মধ্যমণি – দানিয়েলা ও আমার একমাত্র কন্যাসন্তান। এই জমায়েতে সব মিলিয়ে কম করেও ছাব্বিশ সাতাশজন মানুষ! ঠিকঠাক সংখ্যাটা বলতে পারব না! কিন্তু এটুকু বলতে পারি যে এদের মধ্যে আমার মতো গর্বিত আর কেউ নেই। আমি মোটের ওপর মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। তামাউলিপাসের স্কুলে ক্লাস এইট অবধি আমার বিদ্যের দৌড়। তাই আমার বুদ্ধির জোর, স্মৃতিশক্তির জোর – কোনোটাই তেমন নেই। সেই আমার মেয়ে আজ এইখানে পৌঁছেছে – ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়! যাক, যা বলছিলাম, ওই ছাব্বিশ-সাতাশজনকে পাঁচ-পাঁচটি গাড়ী করে এখানে আসতে হয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গাটিতে সবাইকে পৌঁছে দিয়ে আমাদের মেয়ে চলে গেছে তৈরী হতে। মেয়ের সঙ্গে আমিও ঢুকেছিলাম গাউনের ওখানে। সেখানে আরও বেশ কিছু ছেলেমেয়ের সমাহার। অনেকেরই যথারীতি গাউন-টাউন পরা নিয়ে নানান রকম প্রশ্ন থাকে মনে। আমার মেয়ের অবশ্য তা নেই, কারণ এটি ওর প্রথমবার নয়। সেবার যখন বিএ ডিগ্রী পেল, তখন ওর মনেও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। সেবার অবশ্য কোভিডের জন্য কমেন্সমেন্ট এমন বন্ধ জায়গায় হয়নি, বাইরের মাঠে হয়েছিল। তবু রেডি হওয়ার জন্য ঘর তো ছিল! আমি গিয়েছিলাম সেই ঘরের দরজা পর্যন্ত। ও সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাবা, ঠিক আছে তো?" আর আজ আমি ওর সঙ্গে আসা সত্ত্বেও কাউকে এসব জিজ্ঞেস করবার কোনো ব্যাপার নেই। রেডি হয়ে শুধু একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়েই গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়ে। তিন বছর আগের খ্রীষ্টমাসে মিনিয়াপলিসের মল থেকে আমার কিনে আনা গোলাপী রঙের ড্রেসখানা সবুজ গাউনের তলায় চাপা পড়ে গেল।

ওরা তৈরী হয়ে নিজের নিজের আসনে এসে বসে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। এখনো সকাল ন'টা বাজেনি, ন'টা বাজলে আসবেন বিশিষ্ট অভ্যাগতরা, যাঁরা বসবেন ওই স্টেজ আলো করে। তার আগে এখনো মিনিট কুড়ি বাকী। এখনো ছাত্রছাত্রীরা গাউন পরে ঢুকছে, এই ঢোকার যেন শেষ নেই। মেয়ে কখনো কাউকে টেক্সট লিখছে, আবার মাঝে মাঝে কাউকে দেখলে হেসে একটু হাত নাড়ছে, একজনকে দেখে ও যেন একটু বেশীই খুশী হয়ে হাত নাড়ল। প্রথমে বুঝতে পারিনি, তারপর আর একটু কাছে এলে বোঝা গেল – এ আর কেউ নয়, রক্তিমা! রক্তিমা ছোট থাকতেই চলে এসেছিল ইন্ডিয়া থেকে ওর বাবা-মার সঙ্গে। রক্তিমা সরকার। দুজনেই ইমিগ্র্যান্ট বাবা-মায়ের সন্তান হওয়ায় বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরী হয়নি। রক্তিমা আর আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকে এক স্কুলেই পড়েছে, একই ক্লাসে। তারপর বড় হবার পর রক্তিমা এই ইউনিভার্সিটিতেই পড়েছে অঙ্ক নিয়ে, আর আমার মেয়ে পড়েছে ইংরেজি নিয়ে। অবশ্য আমার মেয়েও অঙ্কে কিছু কম ছিল না, কিন্তু একটা বিশেষ জেদের বশে ও ইংরেজি নিয়ে পড়েছিল। রক্তিমা মে মাসেই গ্র্যাজুয়েট করে গিয়েছিল, আজ এসেছে আমার মেয়ের গ্র্যাজুয়েশন

দেখতে | রক্তিমাকে দেখে আমার মেয়ে যখন হাসল, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ – ওর দাঁতে ব্রেসেস লাগানো! ওই ব্রেসেস লাগানোর জন্য ওকে নিয়ে আমিই গিয়েছিলাম অর্থোডোন্টিস্ট রিকার্দো গার্সিয়ার কাছে | এখনো মেয়ে এগুলো নিয়মিত পরছে, যত্ন করছে দাঁতের | এই ব্রেসেসসহই হাসলে ওকে এত মিষ্টি লাগে, আর যেদিন ব্রেসেস খুলবে, তখন তো কথাই নেই!

ন'টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগতরা ঢুকলেন, ওঁদের সম্মানে ইউনিভার্সিটির সঙ্গীত বিভাগের টীম থেকে নানান বাদ্যযন্ত্রে উঠল ঝনৎকার, সমবেত জনগণ সবাই উঠে দাঁড়িয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের অভিবাদন জানাল | অভ্যাগতরা একে একে স্টেজে গিয়ে নিজের নিজের আসনে বসলেন | প্রেসিডেন্ট গাই বেইলী, প্রভোস্ট, কলেজ অফ লিবারল আর্টসের ডিন, কলেজ অফ ফাইন আর্টসের ডিন, বিশেষ অতিথি মিস্টার ভরত প্যাটেল, এবং কলেজ অফ লিবারল আর্টসের সুমা কুম লাউডে মিস নাতালিয়া খিমেনেজ | এতগুলো কলেজ এবং সেগুলোর এতজন ছাত্রছাত্রী হওয়ায় সব কলেজের কমেন্সমেন্ট একই সঙ্গে হতে পারে না, আজ যেমন এই ৯টা-১১টা সেশনে শুধু দুটি কলেজেরই হবে – কলেজ অফ লিবারল আর্টস এবং কলেজ অফ ফাইন আর্টস | এরকম যে কোনো অনুষ্ঠানেই সংশ্লিষ্ট কলেজের আন্ডারগ্র্যাড থেকে কোনো এক সুমা কুম লাউডেকে বেছে নেওয়া হয়, যে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে – আজ তা বলবে নাতালিয়া | আমার মেয়েও আন্ডারগ্র্যাড এবং গ্র্যাড – দুবারই হয়েছে সুমা কুম লাউডে |

এবার আমি জানি কী হবে! একের পর এক বক্তা নিজের নিজের বক্তব্য রাখবেন | তারপর শেষে গিয়ে হবে ডিগ্রী বিতরণ | এই ফাঁকে চলো আমার মেয়ের এই পঁচিশ বছরের জীবনের ছোটখাটো ইতিবৃত্তটুকু তোমাদের শুনিয়ে দিই | হ্যাঁ, আজ থেকে তিনদিন আগে ও ওর পঁচিশ বছরের জন্মদিন পালন করেছে | সেদিন, অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর ছিল ওর ফাইনাল পরীক্ষার শেষ বিষয়ও বটে | তাই পরীক্ষা শেষ হবার দিন জন্মদিন হওয়ায় জমেছিলও বেশ | চার-পাঁচজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ওরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আর ফেরবার পথে চিলিস রেস্টুরেন্টে খেয়ে ফিরেছিল | তাহলে শুরু করা যাক –

ইউএস মেক্সিকো বর্ডারের তামাউলিপাস রাজ্যের রেনোসা শহরে জন্ম হয়েছিল আমার মেয়ে রনিকার; আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, ১৯৯৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর | অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল বর্ডারে যখন রয়েছি, তখন অন্য অনেকের মতো ইউএসএ-তে চলে আসা যাকই না! একবার এখানে এসে পড়লে জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে | আমার বন্ধু হোসে লুইস গোমেজ তো বেশ কয়েক বছর আগেই চলে গেছে | তখন থেকেই ও আমাকে বলছিল "চলে আয়" | আমি সবসময়ই 'কিন্তু কিন্তু' করছিলাম | চট করে নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়াও তো মুশকিল | এরপর আমার ভাই রবের্তোও একই কথা বলতে শুরু করল, যখন বর্ডারের ড্রাগ মাফিয়ার চক্করে পড়ে ওর বন্ধু ম্যানুয়েলকে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হ'ল | দানিয়েলাও তখন ইউএসএ-তে যাবার জন্য মনকে প্রায় মানিয়ে ফেলেছে | ওর বান্ধবী মারিয়া আর তাতিয়ানাও চলে গেছে ইউএস-মেক্সিকো বর্ডারের শহর এডিনবার্গে – টেক্সাসের দক্ষিণের ছোট্ট ইউনিভার্সিটি শহর এডিনবার্গ | ওদের ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই সেখানে পড়তে শুরু করেছে | আমি ভাবছিলাম আমাদের বড় ছেলে এরিবের্তো টুয়েলভটা পাস করুক... এসব ভাবতে ভাবতেই ঘটে গেল 'নাইন ইলেভেন'; নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে গেল | কড়াকড়ি শুরু হয়ে গেল সীমানায় | পোর্ট অফ এন্ট্রিগুলোতে নিরাপদে নিজেকে বাঁচিয়ে এ দেশে প্রবেশ করাটাই হয়ে গেল চ্যালেঞ্জ | তখনই রবের্তো বলল যে আর দেরী করা যাবে না | আর দেরী করলে ঢোকা যাবে না! আমিও ভেবে দেখলাম এখন আর এরিবের্তোর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই | এরিবের্তো ক্লাস টেন পাস করলেই বেরিয়ে যেতে হবে | এরিবের্তো তখন ষোল, রিগোবের্তো চোদ্দ, আলবের্তো নয় আর রনিকা সাড়ে চার | শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালের ২২শে জুন বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে সপরিবারে এসে পড়লাম এদেশে | রবের্তোর পরিবারও এল – রবের্তো, রবের্তোর স্ত্রী হুলিসা এবং ওদের তিন মেয়ে – তেরো বছরের কারিনা, বারো বছরের কালিসা ও এগারো বছরের কামিলা |

এসেই অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারিনি এই এডিনবার্গ শহরে | প্রথমে উঠলাম কাছের শহরগুলোর একটিতে – লা হোয়া | ভালভাবে গুছিয়ে বসতে কেটে গেল কয়েকটি দিন | শুনতাম

ইউএসএ-তে সবার বাড়ীতেই সেন্ট্রাল এসি থাকে, কিন্তু শুরুতেই আমাদের গরীব কলোনিয়ার বাড়ীতে এসি ছিল না। যা কিছু টাকাপয়সা সঙ্গে এনেছিলাম, তার দৌলতে শুধু একটা ঘরে এসি বসিয়ে দিলাম, যাতে এই গরমে দানিয়েলা সে ঘরে ছোট্ট আলবের্তো ও রনিকাকে নিয়ে একটু আরামে ঘুমোতে পারে। আমি দু'ছেলেকে নিয়ে অন্য এসি-বিহীন ঘরটি বেছে নিলাম। এখানে এসে নিজের বাপকে এটা-সেটায় সাহায্য করতে গিয়ে এরিবের্তোর পড়াশুনো থেকে মন উঠে গেল। বাপ-ছেলেতে মিলে দিন'ভর নানান ঠিকে কাজ নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে ওর আর পড়াশুনো হ'ল না। তবে বাকী তিনজনকে লা হোয়া স্কুল ডিস্ট্রিক্ট-এ ক্লাস নাইন, ফোর ও প্রি-কিন্ডারে ভর্তি করে দিলাম। হ্যাঁ, ছোট্ট রনিকাও বাইলিঙ্গুয়াল হওয়ায় প্রি-কিন্ডারে ভর্তি হবার চান্স পেয়ে গেল।

লাভের মধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এরিবের্তো অনেক রকম কাজ শিখে গেল – কার্পেন্টারের কাজ, ল্যান্ডস্কেপারের কাজ, ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ, প্লাম্বারের কাজ। এছাড়া ড্রাইভিংটা আমার ভালই জানা ছিল; তাই ছুটকো-ছাটকা ড্রাইভিংয়ের কাজও জুটতে লাগল। এর দেড় বছর পর যখন দানিয়েলা রনিকাদের এলিমেন্টারি স্কুলে জেনিটারের কাজ পেয়ে গেল, তখন মনে হ'ল এবারে বোধহয় আমরা এমন একটা বাড়ীতে যেতে পারি, যেখানে সেন্ট্রাল এসি থাকবে। এভাবেই আমরা উঠে এলাম এডিনবার্গ শহরে। লা হোয়া স্কুল ডিস্ট্রিক্ট থেকে চলে এলাম আমরা এডিনবার্গ স্কুল ডিস্ট্রিক্ট-এ। কিন্ডারের শেষটা রনিকা পড়ল এডিনবার্গের কারমেন আভিলা এলিমেন্টারি স্কুলে। সঙ্গে আলবের্তোও। আর রিগোবের্তো ভর্তি হ'ল এডিনবার্গ নর্থ হাই স্কুলে। আমাদের টাকা-পয়সার সমস্যা আস্তে আস্তে মিটতে চলেছে। এর আরও দেড় বছর পর রনিকা যখন টুতে উঠল, তখন আমার ওয়ালমার্টে স্থায়ী একটা চাকরি জুটে গেল। এইটিন হুইলার চালানোর দায়িত্ব। ওয়ালমার্টের ট্রাক নিয়ে সারা টেক্সাসের মধ্যে ছুটোছুটি করে মাল ডেলিভারির দায়িত্ব। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম। এবার হয়তো পাকাপাকিভাবে এ দেশে বসবাসের চিন্তা-ভাবনা শুরু করা যেতে পারে। এবার একটু বেশী টাকাও নিশ্চয় হাতে আসবে, তাই আরও কিছু কিছু জিনিস আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারি। এতদিন অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার ছিল, কিন্তু ডাক্তারের ইনসিওরেন্স ছিল না – সেটা হবে। দুটি গাড়ী ছিল – আমার ও দানিয়েলার; কিন্তু গাড়ীর ইনসিওরেন্স ছিল না – সেটা হবে। হয়তো এরিবের্তোর জন্য একটি গাড়ী নিলে সেটির ইন্সিওরেন্সের কথাও আমরা ভাবতে পারব। রিগোবের্তোরও লাইসেন্স হয়ে গেছে, কিন্তু ওকে বোধহয় এখনই গাড়ী দিতে পারব না। পরের বছর ইউনিভার্সিটিতে গেলে নাহয় ওকে কাছেই একটা ডর্ম জুটিয়ে দেব...।

এবার একটু বর্তমানে ফেরা যাক। হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট গাই বেইলীর স্পীচ শেষ হয়ে গেছে। এবারে প্রধান অতিথি ভরত প্যাটেল উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর স্পীচ শুরু হবে। শুনেছি উনি বেশ সম্পত্তিশালী লোক। বস্তুতঃ আমরা এখানে যত ইন্ডিয়ানদের কথা শুনি, তারা বেশীরভাগই ধনী। হয় ডাক্তার, নাহলে নার্স, নাহলে বিজনেসম্যান। ভরত প্যাটেলও তেমনি একজন বিজনেসম্যান। তবে উনি নিশ্চয় শুরুতেই এত ধনী ছিলেন না! শুনেছি অনেক খেটেখুটেই তিনি এই জায়গায় পৌঁছেছেন। সেই অভিজ্ঞতার কথাই তিনি নিশ্চয় শোনাবেন এবারে। আমি হয়তো তার এক চতুর্থাংশই বুঝতে পারব, এর বেশী নয়। হ্যাঁ, এখানে আসবার পর এতগুলো বছর কেটে গেলেও ইংরেজিটা রপ্ত করতে পারিনি। দানিয়েলারও একই সমস্যা। তাই আমরা দুজনে কোনো আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতে হলেই জিজ্ঞেস করে নিই এস্পানিওল জানে কিনা। নাহলে দোভাষী জুটিয়ে নিতে হয়। তবে এরিবের্তো কিছুটা কাজ চালানো গোছের বলতে পারে। রিগোবের্তো, আলবের্তো ও রনিকার ইংরেজি বলতে একটুও আটকায় না। রিগোবের্তো এদের তিনজনের মধ্যে একটু বেশী বয়সে আসায় ওর সামান্য অসুবিধে হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু পরিশ্রম করে আয়ত্ত করে নিয়েছে এই ভাষা। আলবের্তো ও রনিকার কোনো সমস্যা হয়নি, ওরা ঝরঝরে ইংরেজি বলতে পারে। শুধু তাই নয়, রনিকা তো ইংরেজিতে ডিগ্রীই করে নিল।

আবার ফিরে যাই অতীতে। ক্লাস টুতে পড়তে পড়তেই কারমেন আভিলা এলিমেন্টারি স্কুলের টিচাররা একদিন ফর্ম পাঠালেন বাড়ীতে – রনিকার জন্য জিটি-র ফর্ম। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। দানিয়েলা যদিও এখনো লা হোয়া স্কুলেই রয়ে গেছে, তবু একদিন সময় বার করে ও গেল রনিকাদের স্কুলে। তখনই রনিকার টিচার মিস চাভেস বললেন যে রনিকাকে ওঁরা

মনে করছেন জিটি মেটেরিয়াল, তাই ও যেন জিটি-র পরীক্ষাটা দিয়ে দেয়। দানিয়েলার নিজেরই প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হ'ল। এর দুদিন বাদে আমি এল পাসোর ওয়ালমার্টে মাল ডেলিভারি করে ফেরার পর যখন আমাকে সে বোঝাল, আমার বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল; বুঝলাম আমাদের মেয়েটা পড়াশুনোয় স্মার্ট। স্প্রিংয়ের শেষদিকে ও বসল জিটি পরীক্ষায়। আর টিচারদের আশাকে ব্যর্থ না করে রনিকা পরীক্ষায় সফলও হ'ল। এবারে ও এডিনবার্গ স্কুল ডিস্ট্রিক্টের নামকরা স্কুল নরমা লিন্ডা ট্রেভিনো এলিমেন্টারি স্কুলে পড়বে। এই স্কুলে এসেই রনিকার পরিচয় হয়েছিল রক্তিমার সঙ্গে এবং শিগগিরিই জানা গিয়েছিল ভরত প্যাটেল বা অন্যান্য ইন্ডিয়ানদের মতো রক্তিমারা মোটেও অত সচ্ছল নয়। কোনো একটা টিচিং অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে দিল্লী থেকে এখানে চলে এসেছিল রক্তিমার মা নন্দিনী সরকার। সঙ্গে স্বামী রাঘব সরকার ও দুই কন্যা চন্দ্রিমা ও রক্তিমা। সেটা দু'হাজার তিন সাল। টুয়েলভ পাসের পর রাঘবের হাতে কোনো চাকরি ছিল না। এমএ পাস নন্দিনী নিজের প্রেম অস্বীকার করতে না পেরে বিয়ে করে নিয়েছিল রাঘবকে। সুখের কথা হ'ল রাঘব ওর বৌকে শুরু থেকেই মাথায় করে রাখত। তাই যখন আমেরিকায় যাবার সুযোগ এল, রাঘব সানন্দে সায় দিয়েছিল তাতে। ওদের বাবা-মা হাতে কিছু টাকা-পয়সা তুলে দিয়েছিলেন যার দৌলতে আমেরিকায় এসে প্রথমেই এডিনবার্গ শহরে অ্যাপার্টমেন্ট জুটিয়ে নিতে এবং দুই মেয়েকে নরমা লিন্ডা ট্রেভিনো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে কোনো অসুবিধে হয়নি। চন্দ্রিমা ক্লাস থ্রীতে ও রক্তিমা কিন্ডারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এর বছরখানেক বাদে রাঘব গ্যাস স্টেশনে চাকরি পেয়ে গেলে ওরা দুই মেয়েকে নানান অ্যাক্টিভিটিতে দেওয়ার কথাও ভাবতে পেরেছিল।

হ্যাঁ, অ্যাক্টিভিটি! রক্তিমার সঙ্গে মেশামেশি শুরু করবার পর রনিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম ইন্ডিয়ান বাবা-মায়েদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনার কথা। দেশের চাকরি জলাঞ্জলি দিয়ে এদেশে এসে ভারতীয় বাবা-মায়েরা নিজেদের সন্তানের মাধ্যমে চরম তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। সে জন্য পড়াশুনো, খেলাধুলো, গানবাজনা – নানান জিনিসে তাদের চৌকস বানানোর প্রতিযোগিতা চলে। রক্তিমার কাছ থেকে জেনে রনিকাও এসবে আগ্রহী হ'ল। ওকে আমরা কুমনে দিলাম, দিলাম পিয়ানোয়, এমনকি চেসেও। এইট্রিন হুইলারের দৌলতে যে মোটা টাকা হাতে আসতে লাগল, সেটাকে ভালভাবেই কাজে লাগানো শুরু করলাম। এদিকে রিগোবের্তোও টুয়েলভ পাস করে ইউনিভার্সিটি অফ প্যান আমেরিকানে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি ইউনিভার্সিটির কাছের এক ডর্মে। ও নিজেই ওয়ার্ক স্টাডি জুটিয়ে নিজেরটা নিজে বুঝে নিতে পারছে। এরিবের্তোও নিয়মিত ল্যান্ডস্কেপারের কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে। হয়তো শিগগিরি বিয়েও করবে। একটি মেয়ের সঙ্গে ওকে প্রায়ই এখানে সেখানে দেখা যায়। আলবের্তোকে নিয়েই চিন্তা; ছেলেটার পড়াশুনোয় একদম মন নেই। কোনরকমে গড়াতে গড়াতে ক্লাস এইটে উঠেছে। আমরা নরমা লিন্ডা ট্রেভিনো স্কুলের কাছে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে নেওয়ায় ও জোনাল স্কুল বি এল গার্সায় পড়তে পারছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। টেনেটুনে যে পাস করে যাচ্ছে, ওই যথেষ্ট। তাই আলবের্তোর কথা বেশী না ভেবে যাকে নিয়ে ভাবলে কাজ হতে পারে, তাকে নিয়েই আমরা পড়লাম। রনিকাও আমাদের চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজে যারপরনাই চেষ্টা করে ভাল করতে লাগল সবকিছুতে। রক্তিমা-রনিকা জুটি নরমা লিন্ডা ট্রেভিনো স্কুলের গর্ব হয়ে উঠল। ইউ আই এল, চেস, স্পেলিং বী – সব কিছুতেই রনিকা-রক্তিমা থাকল স্কুলের প্রথম সারিতে।

ক্রমে ক্রমে একটার পর একটা বছর কেটে যেতে লাগল। এলিমেন্টারি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে দুজনে একটা বছর পড়ল বি এল গার্সায়, তারপর চলে এল এস টি পি এ-তে সেভেন, এইট পড়তে। এস টি পি এ হ'ল সাউথ টেক্সাস ইন্ডিপেনডেন্ট স্কুল ডিস্ট্রিক্টের মিডল স্কুল। এটিতে পড়লে এগিয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে। এস টি পি এ-র পর্ব চুকলে একই স্কুল ডিস্ট্রিক্টেরই হাই স্কুল, বেটা। সেখানেও ওরা একসঙ্গে। দুজনেরই প্রায় একই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড, দুজনেই অঙ্কে যথেষ্ট ভাল। ইউ আই এলে অঙ্কের প্রাইজ ওদের বাঁধা, দুজনেই অঙ্ক নিয়ে পড়বে এমনটাই ঠিকঠাক। এমন সময়... খুব সম্ভবত সেটি ক্লাস টেন – ওরা দুজনে মিলে টি এস এ নামে কোনো এক অ্যাক্টিভিটিতে একই টিমের টপে থেকে ডালাসের রিজিওনাল কম্পিটিশনে যাবার ছাড়পত্র আদায় করেছিল। স্কুল থেকে বাসে করে নিয়ে যাবে। দীর্ঘ দশ ঘন্টার যাত্রা। এই যাত্রার সময়ই একটি ঘটনা ঘটল।

ওদের সঙ্গে টিচার হিসেবে যাচ্ছিলেন মিসেস রাইট। যাত্রাপথে কোনো এক জায়গায় ওদের দাঁড়াতে হয়েছিল গ্যাস ভরার জন্য; সম্ভবত সেটা স্যান আন্তোনিও। সকাল আটটায় শুরু করে দুপুর বারোটায় স্যান আন্তোনিও পৌঁছে সবার খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কাছে যে মেক্সিকান রেস্টুরেন্ট ছিল, সেখানেই সবাই খেয়ে নেবে ঠিক হ'ল। সেখানে নেমে মিসেস রাইট এমন একটা কথা বললেন, যেটি রনিকার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। মিসেস রাইট হেসে বললেন, "এতক্ষণে বোধহয় রনিকার একটু কম্ফর্টেবল লাগবে। নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে!" এখানে উল্লেখ্য, সেই মেক্সিকান রেস্টুরেন্টের মালিক বা কর্মী কেউই ইংরেজি বলতে পারে না।

মিস্টার ভরত প্যাটেলের স্পীচ শেষ হয়ে গেছে। নিজের জীবনের সংগ্রাম ও উত্থানের কথা বলে অনেক হাততালি কুড়িয়ে নিলেন তিনি। এবারে সুমা কুম লাউডে নাতালিয়া খিমেনেজের স্পীচ। নাতালিয়া তার কাহিনী শুরু করল। অনেকটা আমাদের মতোই ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে এসে মাথা তুলে দাঁড়ানোর গল্প। আমি জানি এ গল্প কেমন, তাই বরং রনিকার জীবন কাহিনীতে ফিরে যাওয়া যাক।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম – মিসেস রাইটের কথাটা খচ করে বুকে বাঁধল রনিকার। হয়তো কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি একথা বলেননি। জন্মাবার পর প্রথম যে ভাষায় মানুষ কথা বলে, সেটাই সাধারণত তার নিজের ভাষা হয়, সেটাও ঠিক। কিন্তু সত্যিই কি রনিকা স্প্যানিশে কথা বলবার সুযোগ পেলে বেশী কম্ফর্টেবল ফীল করে? ও নিজে নিজের মনকে প্রশ্নটা করল এবং একাধিকবার প্রশ্ন করে সে যে উত্তরটা পেল, তা হ'ল – হ্যাঁ, ও জন্মের পর প্রথম কয়েক বছর স্প্যানিশ ছাড়া কিছু জানত না বটে, এখনো বাড়ীতে ও বাবা-মা, দাদা-বৌদি, কাকা-কাকী-কাজিনদের সঙ্গে স্প্যানিশই বলে, সেটাও ঠিক। কিন্তু প্রি-কিন্ডারে হাতেখড়ি হবার পর দিনের বেশীরভাগ সময় যে ভাষা বলে ওর সময় কাটে, সেটা তো ইংরেজি ভাষা! দিনরাত ও এই ভাষাতেই কথা বলছে, এই ভাষাতেই পড়াশুনো করছে, এই ভাষাতেই চিন্তা করছে! তারপরেও ও স্প্যানিশে বেশী কম্ফর্টেবল! এর পরও ইংরেজি ওর নিজের ভাষা নয়? নাহ, এটা অন্তত কিছুতেই মানতে পারল না রনিকা।

ডালাস থেকে ফেরার পথেই ও মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল – নাহ, অঙ্ক নয়, ইংরেজি নিয়েই ওকে পড়তে হবে। সবার কাছে প্রমাণ করতে হবে যে এটাই ওর ভাষা। এ ভাষায়ই ও সবচেয়ে কম্ফর্টেবল। ও ইংরেজি নিয়ে পড়বে এবং লোকজনকে পড়াবে। এই দেশে যারা জন্মেছে, তারা ওর কাছে এই ভাষা শিখবে; তবে ওর শান্তি, তৃপ্তি, লক্ষ্যভেদ – সবকিছু হবে। প্রথমে ও নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানাল রক্তিমাকে। রক্তিমা প্রথমে দুঃখ পেলেও শিগগিরিই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে উৎসাহিত করল রনিকাকে, বলল, "হ্যাঁ, তোকে পারতেই হবে রনিকা!" বাড়ী এসে আমাদেরও বলল। আমরা ওর বাপ-মা, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমরা আর কী বুঝব! মেয়ের কথাকেই সার বলে ধরে নিলাম।

এরপর একটার পর একটা বছর কেটে যেতে লাগল। রনিকা-রক্তিমা হাই স্কুল পাস করে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে গেল। ততদিনে ইউনিভার্সিটির নাম পাল্টে গেছে, এখন আর ইউ টি প্যান আমেরিকান নয়, যেটি থেকে ২০১০ সালে রিগোবের্তো ওর ফিজিওথেরাপীর ডিগ্রীটা নিয়েছিল। এখন নাম হ'ল ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস রিও গ্রান্দে ভ্যালি। এখানে এসে সবকিছু ঠিকঠাকই চলতে লাগল। একটার পর একটা জটিল কোর্সের বাধা পেরিয়ে ঠিক চার বছরে সুমা কুম লাউডে হয়ে গ্র্যাজুয়েট করল রনিকা। সেটা ২০২০। তারপর মাস্টার্স। কোভিড হওয়া সত্ত্বেও অনলাইন লার্নিং-এ অভ্যস্ত হতে এতটুকু অসুবিধে হ'ল না রনিকার। ওর মাস্টার্সের প্রথম সেমেস্টারও ভালই হ'ল। আর সেই সেমেস্টারের শেষে গিয়ে হ'ল আমাদের গ্রীন কার্ড। রনিকা টেন পাস করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা গ্রীন কার্ড অ্যাপ্লাই করেছিলাম – ছ'বছর গড়িয়ে আমরা এটি হাতে পেলাম। এতদিনের চেষ্টা-সাধনা সব সফল হ'ল। এখন থেকে আমরা এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা। নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে তাই একটু বেশী উল্লাসই দেখিয়ে ফেললাম আমি। এর ঠিক পরই রনিকার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যাতে ওকে পড়াশুনোটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হল। স্প্রিং সেমেস্টারে তিনটি কোর্স নেবে বলে ও যথারীতি রেজিস্টার করেছিল; কিন্তু উইথড্র করে নিয়েছিল। এরপর কয়েক মাস ধরে রক্তিমা ও বাড়ীর সবাইমিলে বোঝানোর পর ও আবার ফল সেমেস্টারের জন্য রেজিস্টার করল। এর পর আর কোনো বাধা আসেনি। আজ তাই ও ডিগ্রীটা পেতে চলেছে।

ইতিমধ্যে আরও কিছু কিছু জিনিস হয়েছে | রিগোবের্তোর ফিজিওথেরাপীর ডিগ্রী থাকায় এখন ও কাছেই একটি সংস্থায় ফিজিক্যাল থেরাপী অ্যাসিস্ট্যান্ট | বিয়ে-থা করেছে, একটি পুত্র সন্তানও হয়েছে | এরিবের্তোও সেই গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে – ওর দুটি ছেলে | ও এখন বেশ জনপ্রিয় ল্যান্ডস্কেপার | আলবের্তো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিয়েও এক বছর পড়ে ছেড়ে দিয়েছিল, এখন ও গ্রোসারি স্টোরে কাজ করে | ওর স্টেডি গার্লফ্রেন্ড রয়েছে, কবে বিয়ে-থা করবে জানি না | কিন্তু আমার মেয়েটার আজ অবধি কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই | ওর কাছে পড়াশুনো আগে, নিজের প্রতিজ্ঞাপূরণ আগে, তারপর সবকিছু |

নাতালিয়ার স্পীচ শেষ হয়েছে, এবারে ডিগ্রী বিতরণ শুরু হবে | প্রেসিডেন্ট গাই বেইলীর হাত থেকে ছেলেমেয়েরা ডিগ্রী নেবে, আমার মেয়েও নেবে | আমিও আর তোমাদের অতীতে ডুবিয়ে না রেখে বর্তমানে নিয়ে আসি | কী বলো?

প্রথমে কলেজ অফ ফাইন আর্টস | ছোট কলেজ | ডিগ্রীপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কম | গোটা দশেক মাস্টার্স এবং গোটা ত্রিশেক আন্ডারগ্র্যাডের পালা চুকতে মিনিট বারো-তেরোর বেশী লাগল না | এরপর কলেজ অফ লিবারল আর্টস | গোটা কলেজ মিলিয়ে সাতজন মতো পিএইচডি | তারপর শুরু হ'ল মাস্টার্স | এই একই কলেজ থেকে সাতটি মাস্টার্সের ডিগ্রি | রনিকারা তিন নম্বরে | ওদের পালা এলে একে একে উঠে দাঁড়াল ওরা এগারো জন – জ্যাকি আগিলার, লকি ব্রাউন, সারা চ্যাং, জন গঞ্জালেস, সিনডি এরেরা, রীটা হোগার্ড, দানিকা লোপেজ, রনিকা পেরালেস, আনিসা রেহমান, অ্যাশওয়েল স্মিথ, এবং সান হোয়ানিতা ভিয়াররেয়াল | এক এক করে স্টেজে উঠে প্রেসিডেন্ট বেইলীর হাত থেকে নিজের নিজের ডিগ্রী গ্রহণ করল ওরা | প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর ডিগ্রী গ্রহণের সময় অন্তত চার থেকে আটটি স্মার্টফোনের ক্যামেরা সক্রিয় হয়ে উঠল | ওরাও প্রত্যেকে বেইলীর সাথে হ্যান্ডশেক করে ডিগ্রী গ্রহণ করে দর্শকমণ্ডলীর দিকে দু'সেকেন্ড দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আরও পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল |

রনিকার মতো এদের প্রত্যেকের জীবনেই নিশ্চয়ই একটি করে কাহিনী রয়েছে | রনিকাকে দেখে যেমন তা বোঝার উপায় নেই, অন্যদের সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয় | আরও মিনিট কুড়ির মধ্যে শেষ হয়ে গেল আজকের এই সমাবর্তন পর্ব | অতিথি-অভ্যাগতরা বেরিয়ে গেলেন | এরপর জনতাও আস্তে আস্তে বিক্ষিপ্তভাবে বেরিয়ে যেতে শুরু করল | শুরু হ'ল আরও এক দফা ফটো নেওয়ার পালা | রনিকারাও বন্ধুরা মিলে ফটো নিল | বিশেষ করে ওরা পাঁচজন – যারা একই সঙ্গে ঢুকেছিল ও একই সঙ্গে গ্র্যাজুয়েট করল – সারা-রনিকা-দানিকা-আনিসা-জ্যাকি | নানান কারণে ওরা প্রত্যেকেই ছ'মাস পিছিয়ে দিয়ে আজ গ্র্যাজুয়েট করল | এরপর ওদের কেউ যাবে অন্য কোথাও পিএইচডি করতে, কেউ বা হয়তো এখানে থেকেই রিসার্চ করবে, কেউ বা আবার রনিকার মতো সার্টিফিকেশন করে টিচার হবার জন্য চেষ্টা-চরিত্র করবে |

ক্লাসমেটদের সঙ্গে ফটোর পর পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে ফটো | রনিকা ও রক্তিমা একসঙ্গে একাধিক ফটো নিল | তারপর রক্তিমাকে 'বাই' বলে নিজের পরিবারের সঙ্গে মিলন | মা-মাসীরা এবং অন্যান্য গুরুজনদের কাছ থেকে অনেক আদর পেল রনিকা | সেখানে আরও একগুচ্ছ ফটো | তারপর বেরোনোর পালা | দানিয়েলার বড় বোন ইয়োলান্দা, ছোট বোন ভেরোনিকা, ভেরোনিকার স্বামী মিগেল এবং তাঁদের একমাত্র কন্যা রক্সানা – প্রত্যেকেই বেশ প্রমাণ সাইজের | এবং প্রত্যেকেরই ইন্ডিয়ান খাবারের খুব শখ, বিশেষ করে গার্লিক নান আর চিকেন টিক্কা মাসালা | দানিয়েলাকে আগেই বলে রেখেছিল ওরা, তাই গাড়ীতে উঠেই দানিয়েলাকে ওরা আবার তা মনে করাল | রনিকা এই গাড়ীতেই এসেছিল, এই গাড়ীতেই ফিরবে | পেছনটা ভেরোনিকার ফ্যামিলিকে ছেড়ে দেওয়ায় সামনে দানিয়েলা ও ইয়োলান্দার মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে বসতে হ'ল রনিকাকে | দানিয়েলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নিয়ে যাব বলেছিলাম মনে পড়ে তোর?" রনিকা হেসে বলল, "কাবব গাইজ! কিন্তু মা তোমাকে কিন্তু একটুখানি সামলে-সুমলে খেতে হবে, মনে আছে তো?" দানিয়েলাও মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে গাড়ী স্টার্ট দিল |

অবশ্য ওই 'হ্যাঁ' যে নেহাত কথার কথা, সেটা দানিয়েলাও জানে, রনিকাও | তা খাওয়া-দাওয়া বেশ জম্পেশই হ'ল | রনিকার মাসতুতো বোন রক্সানা বয়সে রনিকার থেকে বছর চারেকের ছোট, কিন্তু সাইজে রনিকার দ্বিগুণ এবং খেল রনিকার চারগুণ | বস্তুত ও-ই সবচেয়ে বেশী খেল | অন্যরা বয়স হয়ে

যাওয়ায় ইচ্ছে থাকলেও বেশী খেতে পারল না | মিগেল বলল যে ও নাকি কম বয়সে এক সিটিংয়ে খান পনেরো বার্গার উড়িয়ে দিত | এখন খুব বেশী হলে তিনখানা, কখনো চারখানা | আজ দুটি সম্পূর্ণ গার্লিক নান খেয়েই ওকে থামতে হ'ল, মেয়ে রক্সানা সেখানে তিনখানা নান হাসতে হাসতে উড়িয়ে দিল |

খাওয়াদাওয়ার পর্ব চুকলে এরপর আর অন্য কোথাও যাওয়া নেই, সোজা বাড়ী | ভেরোনিকাদের ইংরেজি মুভি দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু রনিকার ইচ্ছে না করায় ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে তবেই ওরা বেরোতে পারল | এরিবের্তোরা এখনো ফেরেনি, এখান থেকে ওর স্ত্রী সেলেনার বাপের বাড়ী যাওয়ার কথা ওদের, ওখানে গেলে ফিরতে দেরী হবে | রিগোবের্তোরা এখানে থাকে না | ওরা থাকে আরও নর্থে | আর আলবের্তো ও তার গার্লফ্রেন্ড আনার কী প্ল্যান সেটা রনিকা জানে না, ওরাও ফেরেনি | তাই রনিকা এখন বাড়ীতে সম্পূর্ণ একা | এত ভিড়, এত কোলাহল, এত ফটো তোলা, এত খাওয়াদাওয়ার পর্ব সব এতক্ষণে থেমেছে | এখন বাড়ীতে একটা পিন পড়লেও যেন আওয়াজ পাওয়া যাবে | এরকম একটা পরিবেশই ও এতক্ষণ চাইছিল | একটু নিজের জন্য সময় | না, একটু ভুল হ'ল | শুধু নিজে নয়, নিজে এবং আরও একজন | আরও একজন যার ফটো ওর পড়ার টেবিলে রয়েছে | এই ফটো ওর ফোনেও রয়েছে, রয়েছে ল্যাপটপের ব্যাকগ্রাউন্ডে | দ্রুত চেঞ্জ করে নিয়ে ও টেবিলের ফটোটা হাতে তুলে নিল | ফটোর চোখে চোখ রেখে বলল, "বাবা, আমি তোমাকে ভুলিনি, ভুলিনি আমার প্রতিজ্ঞার কথাও; আমি পেরেছি |" তারপর ফটোটা বুকে নিয়ে নিঃশব্দ কান্নায় ডুবে গেল |

কান্না কেন? তাহলে একটা ঘটনা শোনাই তোমাদের | আজ থেকে দু'বছর আগে গ্রীন কার্ড হয়ে যাওয়ার খুশীতে রনিকার বাবা নিউ ইয়ার ডে-র সারা সন্ধ্যা জুড়ে খোলা আকাশের নীচে গোটা পঞ্চাশেক লোকের জন্য বারবিকিউ করেছিল | তারপর পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে সানন্দে খাইয়েছিল সেই বারবিকিউড চিকেন | এরপর পরোয়া না করেই রাত'ভর নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল নেশার আনন্দে | সকালে উঠেই ব্রাউন্সভিল ছুটতে হবে! সেখান থেকে স্যান আন্তোনিও – শেষ পর্যন্ত আর ঘুমোনোর সময় ছিল না | ওই মাতাল শরীরে পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে ভোর ছ'টা পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল | সাড়ে সাতটার মধ্যে ব্রাউন্সভিল পৌঁছাতে হবে এবং দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে স্যান আন্তোনিও | কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাউন্সভিলই হয়নি | ওয়েসলাকোর ওপর দিয়ে যাবার সময় ওয়েস্টগেট এগজিট পেরোতে না পেরোতেই ৭৫ মাইল বেগে যাওয়া এইট্টিন হুইলারটা একটা কার্ভে সজোরে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল বেমালুম | গাড়ীর পাঁচজন আরোহী ঘটনাস্থলেই মারা গেল | ওই গাড়ীর চালক উমবের্তো পেরালেস, অর্থাৎ আমি |

ইতি প্রিয়দর্শিনী

সুজয় দত্ত

কলেজ স্ট্রীট আজ কলেজ স্ট্রীটের মতো দেখাচ্ছে না মোটেই | সেই ভীড়ে ভীড়াক্কার রাস্তাঘাট, এখানে সেখানে মানুষের জটলা, এগোতে না পারা গাড়ীর হর্ণে মুখরিত প্রতিটা মোড় – কোথায় গেল সেসব? চারদিক বেশ ফাঁকাফাঁকা, সন্ধ্যের ঝলমলে আলোয় রাস্তার দুপাশের সারি সারি দোকানগুলো তাদের বইয়ের সম্ভার নিয়ে কেমন যেন নিঃঝুম, নিস্তব্ধ | অল্প কিছু খদ্দেরের আনাগোনা, সামান্য কেনাকাটা আর মাঝে মাঝে দোকানিদের উত্তেজিত আলোচনা কালকের মহাসম্মেলন নিয়ে | হ্যাঁ, মহানগরীর প্রাণকেন্দ্রে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যের শাসক দল তাদের বার্ষিক শহীদ দিবসের বিরাট জনসভা ডেকেছে কাল | দিকে দিকে নাকি মানুষের ঢল নামবে | তার উত্তরে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল দিয়ে রেখেছে পথ অবরোধ আর ঘেরাওয়ের হুমকি | খেলা জমে যাবে মনে হচ্ছে | সে খেলার 'মাঠ' তৈরী রাখতে শহরের পুলিশ আজ বিকেল থেকেই রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড আর 'ওয়ান ওয়ে' সাইন দিয়ে নিজেদের অতি সক্রিয়তা জাহির করছে | সেইজন্যই বোধহয় কলেজ স্ট্রীটের অতিপরিচিত চেহারাটা আজ গরহাজির |

বেছে বেছে আজই শুভ্রকেতনের এই বইপাড়ায় আসার সিদ্ধান্তের পিছনে অবশ্য অন্য কারণ | লন্ডন থেকে অল্পদিনের ছুটিতে কলকাতায় এসে পৌঁছানোর পর বেশ কয়েকদিন এত প্রচন্ড ব্যস্ততা ছিল ওর যে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায়নি | বহু দশকের পুরনো পৈতৃক বাড়ীটার টুকটাক মেরামতি, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ী নেমন্তন্ন আর অশীতিপর মা-বাবার চিকিৎসা-সংক্রান্ত কিছু জরুরী পদক্ষেপ ছাড়াও আরেকটা কাজ ওকে এ-ক'দিন ল্যাপটপ থেকে মাথা তুলতে দেয়নি | এই মাসের শেষেই ওর বহু প্রতীক্ষিত দুটো বই কলকাতার দুই প্রকাশনী থেকে ছেপে বেরোচ্ছে | না, অর্থনীতির জটিল তত্ত্বের বই নয় ওগুলো, যদিও সেটাই বিলেতের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর অধ্যাপনার ক্ষেত্র | একটা বই বাংলা কবিতার, অন্যটা ছোটগল্প আর রম্যরচনার | হ্যাঁ, ডঃ শুভ্রকেতন রায়ের একটি সমান্তরাল পরিচয় হ'ল সে একজন সাহিত্যিক | লেখার গুণে বিলেতের প্রবাসী বাংলা সাহিত্য জগতে এক সুপরিচিত নাম | বিলেত-আমেরিকার নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখে আসছে বেশ কয়েক বছর | তো, সেই আসন্ন বইদুটোর প্রুফ সংশোধন করতে গিয়ে কয়েকটা বিনিদ্র রজনী কাটাতে হ'ল ওকে | প্রচুর ছোটখাটো ভুল | সেসব উকুন বাছার মতো একটা একটা করে দাগিয়ে তবে শান্তি | সেই পর্বের শেষে আজ একটু ফুরসৎ পেয়েই ছুটে এসেছে এই চিরকালীন ভালবাসার জায়গায় – যা ওর জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সেই প্রেসিডেন্সী কলেজের দিনগুলো থেকে | কিংবা হয়তো তারও আগে থেকে |

- "স্যার, আপনি মনে হচ্ছে কবিতা-টবিতা পড়েন | দাঁড়ান, আপনার জন্যে একটা – অ্যাই সুবল, ওই ওপরের তাকের পেছনের কোণ থেকে নীল মলাটের বইটা নামা |"

ফুটপাথ-সংলগ্ন দোকানের সারির মধ্যে একটায় সাজিয়ে রাখা পুরনো কিছু বাংলা বইয়ের দিকে নজর পড়ায় সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল শুভ্রকেতন | তার মধ্যে লাল রেক্সিনে বাঁধানো 'বাংলা কবিতার হীরক সংগ্রহ' বইটা হাতে নিয়ে সাগ্রহে সূচীপত্রে চোখ বোলাতে দেখে দোকানির এই প্রতিক্রিয়া | কোনো এক ধুলোজমা আলমারির প্রত্যন্ত কোণ থেকে যে মোটাসোটা নীল বইটি বেরোল, সেটা একেবারে রত্নখনি | দুই জনপ্রিয় বাচিক শিল্পী উর্মিমালা বসু আর সৃজন সরকার সম্পাদিত সেরা কবিতা সংগ্রহ | আর বাক্যব্যয় না করে দ্রুত দাম মিটিয়ে পাশের খুপরি দোকানটায় গিয়ে দাঁড়ায় শুভ্রকেতন | কারণ জায়গার অভাবে সেই দোকানের সামনে ফুটপাথের ওপর যে বইগুলো স্তূপাকার করে রাখা, তার মধ্যে উঁকি মারছে একটা আস্ত তারাশঙ্কর রচনাসমগ্র | একটু পুরনো, হলদেটে, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? স্তূপের তলা থেকে তারাশঙ্কর উদ্ধার করতে গিয়ে আচমকা বেরিয়ে পড়ল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দু'খন্ড অনূদিত কবিতা | চোখ চকচক করে ওঠে শুভ্রকেতনের | এই কারণেই – স্রেফ এই কারণেই ইদানীং কালেভদ্রে কলেজ স্ট্রীটে আসার সুযোগ হলে নামকরা প্রকাশনীর বড় বড় দোকানগুলোয় না গিয়ে ফুটপাথের ধারের ছোট দোকানগুলোয় সময় কাটায় ও | এই হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ |

ক্রমে ক্রমে আশপাশের আরও গোটাতিনেক খুপরি দোকান থেকে পাওয়া নজরুলের 'সঞ্চিতা', জরাসন্ধের গল্পসংকলন,

জ্যোতির্ময় ঘোষের 'সাহিত্যে প্রগতির দর্শন', নবনীতা দেবসেনের 'ট্রাকবাহনে ম্যাকম্যাহন' ইত্যাদিতে ভরে উঠতে থাকে ঝুলি। দু'চারজন দোকানীর সাথে খুচরো আলাপচারিতায় উঠে আসে করোনা অতিমারী আর আমফান ঘূর্ণিঝড়ের জোড়া ধাক্কায় কলেজ স্ট্রীটের বই ব্যবসার বেহাল অবস্থার কথা। একজন সাচ্চা বইপ্রেমী হিসেবে মনে মনে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে শুভ্রকান্তি, আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে বলে "আপনারা এক কাজ করুন, কোনোভাবে বিদেশের বাজারটা ধরার চেষ্টা করুন। প্রবাসী বাঙালীদের একটা বড় অংশ এখনো ভাল বাংলা বই খুঁজে খুঁজে চড়া দামে কেনে। বিদেশের প্রচন্ড ব্যস্ত জীবনে পড়ার সময় কতটা পায় জানি না, কিন্তু লাইব্রেরীতে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখে দেয়। কলকাতার সবচেয়ে বড় পাবলিশিং হাউসগুলো ইতিমধ্যেই এর সুযোগ নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। আপনাদের সংগঠনকে বলুন সরাসরি প্রবাসী পাঠকদের সামনে একটা অপেক্ষাকৃত কমদামী বিকল্প খাড়া করতে। দেখবেন, অনেকেই আগ্রহী হবে।" এরকম অযাচিত উপদেশ পেয়ে আরো কৌতূহলী হয় দোকানীরা, জিজ্ঞেস করে ঠিক কোন পথে এগোলে এটা সম্ভব, কিভাবে শুরু করতে হবে, ইত্যাদি। কেউ কেউ বাড়িয়ে দেয় নিজেদের নাম-ঠিকানা লেখা কার্ড। কথোপকথন গড়াতে গড়াতে ঘড়ির কাঁটা কখন যে আটটা ছুঁয়েছে, খেয়াল হয়নি কারোরই। চমক ভাঙল হঠাৎই ঝরঝর করে বৃষ্টি শুরু হওয়ায়। দোকানীরা সব যে যার দোকানের ঝাঁপ ফেলতে ছুটল আর শুভ্রকেতন হাতের ছাতাটা খুলে ছাট বাঁচিয়ে ডানদিকে কফি হাউসের গলির মুখে একটা আধখোলা দোকানের শেডের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। এবং তখনই ঘটল সেই ঘটনাটা।

এ-দোকানে বাংলা বই নেই। শুধুই ইংরেজি। দিল্লী বোর্ড আর সেন্ট্রাল বোর্ডের পাঠ্যবইয়ে ঠাসা, বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষার গাইডও রয়েছে প্রচুর। তার সঙ্গে স্নাতক আর স্নাতকোত্তর স্তরের অল্প কিছু। এর মধ্যে থেকে উঁকি মারছে ইংরেজি সাহিত্যের টুকরো টুকরো মণিমুক্তো – শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ-ওথেলো-হ্যামলেট, ডিকেন্সের গল্পসংকলন, মার্ক টোয়েন, জেন অস্টেন, হেমিংওয়ে, আগাথা ক্রিস্টি, কোনান ডয়েল, স্টিফেন কিং, ইত্যাদি। সবই পুরনো বইয়ের রি-সেল। আনমনে চোখ বোলাতে থাকে শুভ্রকেতন। আরেঃ, বাঁদিকের ওপরের তাকটায় কোণের দিকে ওটা কী? লাল মলাট, ছেঁড়া ছেঁড়া বাঁধাই, হলদেটে পাতা, কিন্তু স্পাইনে লেখা নামটা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। – 'কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ রুমি'। কোলম্যান বার্কস-এর অনুবাদ। "রিয়েলি? দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি জালাল-আল-দিন মোহাম্মদ রুমি? ওয়ান্ডারফুল" – উৎফুল্ল স্বগতোক্তিটা করেই ও হাত বাড়ায় সেই তাকের দিকে। কিন্তু বইটা টেনে বার করতে গিয়ে মুহূর্তের অনবধানতায় তাকের সব বই হুড়মুড় করে মাটিতে ছড়িয়ে ফেলে। দোকানি ভেতরে কাজ করছিল, শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, আমি তুলছি" বলে গোছাতে থাকে। আর শুভ্রকেতনের ডান পায়ের কাছে যে রংচটা ঘিয়ে মলাটের ছোটখাটো বইটা ছিটকে পড়েছিল, সেটা ভদ্রতাবশতঃ কুড়িয়ে ফেরত দিতে গিয়ে ও যেন ইলেকট্রিক শক খায়। বইটা দুষ্প্রাপ্য কিছু নয়, প্যালগ্রেভের বহুলপঠিত গোল্ডেন ট্রেজারি। কিন্তু – কিন্তু প্রথম পাতায় ওটা কী লেখা? এও কি সম্ভব? ও স্বপ্ন দেখছে না তো? এ যে স্বপ্নেরও অতীত! নিয়তি কি তাহলে এটা দেখাবার জন্যই তাকে এই বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় প্রায় শুনশান বইপাড়ায় টেনে এনেছে? চারপাশের সব বাস্তবতা মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায় ওর চেতনা থেকে। স্মৃতির অতলে ডুব দেয় ও।

- "কেমন লাগল লেখাটা, জিজ্ঞেস করলে না তো?"

- "জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? কারো ভাল লাগলে সে নিজে থেকেই বলবে।"

- "তার মানে পাঠকের মতামত চাওয়ার সাহস নেই, এই তো?"

- "আচ্ছা, আমার সমালোচনা না করলে কী রাতে ঘুম হয় না তোমার?

- "উঁহুঁ, আমার অন্য কারণে রাতে ঘুম হয় না।"

- "কী কারণ?"

- "এইতো, এই প্রশ্নটা থেকেই বোঝা যায় কে ইকোনোমিস্ট আর কে সাহিত্যিক।"

- "মানে?"

- "একজন সাচ্চা সাহিত্যিককে তো ওই প্রশ্নের উত্তর বলে দিতে হয় না।"

- "ওঃ, সারাদিন শুধু শেলী-কীটস-ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়ে পড়ে মুখটাই একটা রোম্যান্টিক অ্যান্থোলজি হয়ে গেছে, সোজাসাপ্টা কথা আর বেরোয় না।"

- "ব্যস, মসজিদ অবধি দৌড় হয়ে গেল, আর কোনো নাম নিশ্চয়ই স্টকে নেই বাবুর? ব্লেক-কোলরিজ-গর্ডনের কবিতাও কিন্তু আমি কম পড়ি না।"

- "আমার দৌড়কে অতটা আন্ডার এস্টিমেট করবেন না ম্যাডাম; ব্লেক আর কোলরিজ তো আমাদের স্কুলের সিলেবাসেই ছিল। কিন্তু গর্ডনটা তো ঠিক মনে পড়ছে না –"

- "হি হি হি, ফান্ডায় আটকে গেল তো? জর্জ গর্ডন বায়রন। এবার বোঝা গেছে স্যার?"

- "ও, লর্ড বায়রন? সেই এডা লাভলেসের বাবা?"

- "এই রে, এবার নিশ্চয়ই কম্পিউটার সায়েন্স কপচানো শুরু হবে। আচ্ছা, এই এডা লাভলেস অঙ্ক আর কম্পিউটার নিয়ে কাজ করা ছাড়াও যে একজন ভাল লেখক ছিলেন, জানা আছে আশা করি?"

- "নাঃ, জানা নেই। সব জানা থাকলে আর তোমার কাছে শিখব কী?"

- "যাক, তাও ভাল, একজন নারীর কাছে শেখার কথা শুনলাম একজন পুরুষের মুখে।"

- "হোয়াট ডু ইউ মীন? আমার মধ্যে মেল্ শোভিনিজম কোথায় দেখলে তুমি? ক্যান ইউ গিভ মি অ্যান এক্সাম্পল?"

- "অমনি গায়ে লেগে গেল? কথাটা তোমাকে বলিনি। বলেছি তোমাদের পুরুষ জাতটাকে।"

- "এই ধরনের জেনারেলাইজেশন কিন্তু গ্রোস ওভার-সিমপ্লিফিকেশন। ঠিক আছে, পুরুষ জাতের হয়ে আমি চ্যালেঞ্জটা নিলাম। সারা জীবন ধরে প্রমাণ দেব একজন পুরুষ ঠিক কতটা –"

- "সারা জীবনের প্রশ্ন উঠছে কোত্থেকে?"

- "না, মানে, ইয়ে, আমি বলতে চাইছি –"

- "হি হি হি। আচ্ছা আচ্ছা, আর বোঝাতে হবে না। এবারে আমি কি বলতে পারি তোমার লেখাটা কেমন লেগেছে?"

- "হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই"

- "কনশাসলি অর আনকনশাসলি, এই লেখাটায় স্যামুয়েল বেকেটের মিনিমালিজম আর শার্ল বোদলেয়ার-স্টাইল ইম্প্রেশনিজম-এর এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলেছ তুমি।"

- "উরিঃ সাবাশ! আমি স্বপ্নেও ঐসব ভেবে লিখিনি। জাস্ট এমনি – অনেকদিন ধরেই মাথায় ঘুরছিল প্লটটা, তাই আরকি –। তবে তোমার এই মন্তব্য আমি শিরোধার্য করলাম। প্রচুর পজিটিভ এনার্জি পাব এটা থেকে, যখন লিখতে বসব –"

****

- "কী, লাইব্রেরীর এক কোণে লুকিয়ে লুকিয়ে কী হচ্ছে?"

- "উঃ, চমকে দিয়েছ। লুকোব কেন? একগাদা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই তো বসে আছি।"

- "মানে? কাউকেই তো দেখছি না। ভূতেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নাকি তোমার?"

- "ভূত? হি হি হি। তা বলতে পারো। এদের কেউই আর বেঁচে নেই। পল লরেন্স ডানবার, জেমস ল্যাংস্টন হিউজ, ওয়াল্ট হুইটম্যান –"

- "ও, আজ বুঝি যত রাজ্যের আমেরিকান কবিতা ঘাঁটা হচ্ছে? অনার্সের সেকেন্ড পেপারের সিলেবাসে ঐসব আছে নাকি?"

- "কী বলব বল তো এমন প্রশ্নের উত্তরে? আচ্ছা, আমি কি শুধু পরীক্ষার জন্য কবিতা পড়ি?"

- "সরি, সেটা মীন করিনি, কিন্তু এখন সন্ধ্যে সাতটা চল্লিশ। লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যাবে একটু পরে। আর দেরী করলে বাড়ী ফেরার বাস পাবে?"

- "না পেলে অটো নিয়ে নেব। রিক্সা আর অটো মিলিয়ে বাসের চেয়ে খুব বেশী সময় লাগবে না। একটু দাঁড়াও, এটা শেষ করতে দাও।"

- "ও বাবা, এ তো মোটা বই। শেষ হবে তাড়াতাড়ি? নামটা কী, দেখি। মন্তাজ অফ এ ড্রীম ডেফার্ড? কার ড্রীম?"

- "সেকি, শোনোনি এটার কথা কখনো? ল্যাংস্টন হিউজের বিখ্যাত বই।"

- "আচ্ছা, তুমি মিল্টন ফ্রীডম্যান আর পল স্যামুয়েলসনের নাম শুনেছ?"

- "হি হি হি, ব্যস, শুরু হয়ে গেল লড়াই। নাঃ, জানি না। কারা ওরা? নিশ্চয়ই বড় বড় ইকোনমিস্ট। বলেছি তো আমার অত বিদ্যে নেই। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, শুধু কবিতা পড়ি –"

- "হয়েছে, আর ন্যাকামি করতে হবে না। এবার ওঠো তো, আটটা বাজতে চলল, মাসীমা ওদিকে চিন্তা করবে। বইটা বাড়ী নিয়ে গেলেই তো হয় –"

- "সে-গুড়ে বালি। লাইব্রেরীর কার্ড আনতে ভুলে গেছি।"

- "ও, তা সেটা বললেই হতো এতক্ষণ। আমার কার্ডে নিয়ে

নিচ্ছি।"

- "সত্যি? থ্যাংকস। এই জন্যে তোমাকে এত্ত ভাল লাগে। বুঝলে?"

- "আই সী। শুধু এইজন্য?"

- "না, তা নয়, অন্য কারণেও লাগে। শুধু একটা জিনিস ছাড়া..."

- "এই রে, কী সেটা?"

- "বলব?"

- "বলে ফেলো, নাহলে তো কৌতূহলে রাতে ঘুম হবে না।"

- "একটু ঝগড়ুটে আছেন আপনি, স্যার। সোজাসাপ্টা কথাও আঁতে লেগে যায়।"

- "ধ্যাৎ, কোথায় আবার ঝগড়ুটে? তোমাতে আমাতে যেটা হয় সেটাকে বড়জোর ওই – কী যেন বলছিলে সেদিন কোন একটা কবিতা থেকে – লাভার্স কোয়ারেল না কোয়ারেল অফ লাভ, সেই।"

- "বটে! এমনিতে তো কবিতার কথা শুনলে নাক সিঁটকাও, কিন্তু ওই শব্দটা ঠিক মনে আছে। কার কোন কবিতায় আছে বল তো ওটা?"

- "দাঁড়াও, একটা রিক্সা ডাকি, সামনের ট্রামরাস্তার মোড় থেকে অটো নিয়ে নেব –"

- "আরে দূর, রিক্সা-ফিক্সা লাগবে না। চল না, হাঁটি। কই, বললে না তো কার কোন কবিতায় –"

- "জানলে তো বলব।"

- "তিনিও আমেরিকান কবি। রবার্ট লি ফ্রস্ট। ইন ফ্যাক্ট তাঁর সমাধিতে যে এপিটাফ আছে, তাতে ওই কথাটা লেখা আছে – 'আই হ্যাড এ লাভার্স কোয়ারেল উইথ লাইফ।' কবিদের ব্যাপারই আলাদা – তাদের কবরও কাব্যিক।"

- "আচ্ছা আচ্ছা, ওসব কবর-টবরের কথা না বললেই নয়? ফ্রস্টের কবিতা তো আমাদের মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক, দুটোর সিলেবাসেই ছিল। কি যেন সেই – 'স্টপিং বাই দ্য উডস' আর 'দ্য রোড নট টেকেন'।"

- "হ্যাঁ, 'স্টপিং বাই দ্য উডস অন এ স্নোয়ি ইভনিং'। সেই যে সেই বিখ্যাত লাইন – 'বাট আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কীপ, অ্যান্ড মাইলস্ টু গো বিফোর আই স্লিপ'।"

- "হুঁ, আমাদেরও আজ ঘুমোবার আগে অনেক মাইল হাঁটতে হবে মনে হচ্ছে। ট্রামরাস্তার মোড়ে একটাও অটো নেই। অটো-স্ট্যান্ডেও না।"

- "হি হি হি। হোক না। উই টু হ্যাভ প্রমিসেস টু কীপ – রাইট?"

****

- "তুমি জিজ্ঞেস করার আগেই বলি, তোমার চিঠিটা পেয়েছি। সে এক কান্ড! পড়বি তো পড়, টুসির হাতে পড়েছে। কলেজ থেকে ফেরার পথে সিঁড়ির নীচে লেটারবক্স থেকে চিঠিগুলো ও-ই এনেছিল। এমন বিচ্ছু মেয়ে, চিঠি খুলে পড়েটড়ে তারপর রাতে শুতে যাবার আগে আমার ঘরে এসে বলে – দাদা, এই নে।"

- "হি হি হি, ভালই তো। ওতে তো আর যুবতী মেয়ের কান লাল হয়ে যাওয়ার মতো কোনো কথা লেখা ছিল না, একটা কবিতা ছিল শুধু।"

- "তা ঠিক। আমার জন্মদিনের সেরা সারপ্রাইজ ওটা। যদিও আসল দিনের একদিন আগেই পৌঁছে গেছে। তো, কার কবিতা ওটা? শক্তি? সুনীল? অলোকরঞ্জন? দারুণ লাগল। নামটাও অনবদ্য।"

- "হিঃ হিঃ হিঃ। কার কবিতা বলো তো?"

- "আরে, জানোই তো আমার অত সাহিত্যজ্ঞান নেই –"

- "বলছি, কিন্তু শোনার পর কবিকে দই-ফুচকা খাওয়াবে তো?"

- "মানে!!"

- "কবিতাটা আমার। অর্থাৎ অনুবাদটা আমার। একচুয়ালি ওটা ল্যাংস্টন হিউজের জীবনের শেষ কবিতা – 'দ্য প্যান্থার অ্যান্ড দ্য ল্যাশ'। তাই বাংলায় নাম দিয়েছি 'চিতা ও চাবুক'। অবশ্য চিতা পড়ে লোকে প্রথমে ভাবতে পারে শ্মশানের চিতার কথা বলছি –"

- "ওঃ, রাতদিন মুখে অলক্ষুণে কথা! কিন্তু – কিন্তু – তুমি তো, মানে, বাংলায় কবিতা –"

- "কী? শেষ করো কথাটা। আমি বাংলায় অষ্টরম্ভা, তাই তো? হি হি হি।"

- "না না, তা নয়, তবু কবিতার অনুবাদ কি চাট্টিখানি কথা? তোমার এই গুণটার কথা এতদিন..."

- "তো, এবার দই-ফুচকা হয়ে যাক? এই লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটায় মিনিট দশেক হাঁটলেই যে মোড়টা পড়ে, ওখানেই 'জলযোগ' বলে দোকানটায় –"

- "উঁহু, আজ তো দই-ফুচকা হবে না। অন্য জিনিস হবে।"

- "কী?"
- "জানতে হলে আরেকটু কাছে আসতে হবে | এই যে, এইরকম করে –"
- "অ্যাই, অ্যাই, কী হচ্ছে কী এটা, লাইব্রেরীর মধ্যে? ছাড়ো..."
- "এখন রাত পৌনে আটটা ডার্লিং | এই বৃষ্টির রাতে লাইব্রেরীতে জনপ্রাণী নেই | উঁহু, উঁহু, ঠোঁট সরিয়ে নিলে হয় কখনো? লজ্জাটা কাকে, শুনি?"
- "আঃ! কী হ্যাংলামি হচ্ছে? ছাড়ো না –"
- "হ্যাংলাই তো আমি | সত্যিটা যখন জেনেই গেলে, আর তো ছাড়ার প্রশ্ন নেই | এইভাবে – এইভাবে ধরে রেখে দেব |"
- "ছাড়ো, লক্ষ্মী সোনা, প্লীজ, দেরী হয়ে যাচ্ছে –"
- "কিসের দেরী? সারাজীবন ঠিক এমনি করে জড়িয়ে থাকব তোমাকে |"
- "সব দুষ্টুমি একদিনে করে ফেললে এরপর তো –"
- "একী! এটা কী?"
- "কী হ'ল?"
- "এটা কী তোমার বুকে? এই যে, এখানে, শক্ত মতো?"
- "ওহ | ও কিছু না | ওটা তো অনেকদিন ধরেই –"
- "কী বলছ কী প্রিয়দর্শিনী? অনেকদিন ধরে মানে? এতদিন কাউকে কিচ্ছু জানাওনি!"
- "মানে? কী জানাব? ওতে তো ব্যথা-ট্যথা কিছু নেই |"
- "তুমি, তুমি – চলো, এক্ষুণি বাড়ী চলো, মাসীমার সঙ্গে কথা আছে আমার |"

****

"আমার শুভ্র,

এই চিঠিটা আর পোস্টে পাঠালাম না | আজ সুনন্দদা আর ওর স্ত্রী মানে চিত্রা এসেছিল আমাকে দেখতে | ওরা তো তোমার বাড়ীর কাছেই থাকে, তাই ওদের বললাম পৌঁছে দিতে | কারণ চিঠির সঙ্গে একটা ছোট্ট জিনিসও আছে | কাল কেমোথেরাপির চতুর্থ ডোজটা নিয়ে এসে ভীষণ দুর্বল লাগছিল | বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই চিঠিটা লিখতে কতবার যে হাত কেঁপে গেল | তোমার পিএইচডি-র ইন্টারভিউ কেমন হল? পরশু তো তোমার কলকাতায় ফেরার কথা, তাই না? চারদিন আসোনি এখানে, বড্ড মিস করেছি তোমাকে | বাড়ীতে সারাক্ষণ কেমন যেন একটা শোকের আবহ, ভাল লাগে না | এখন তো কোথাও যাওয়ারও উপায় নেই | অপারেশনের দিন ঠিক হয়ে গেছে | যাইহোক, গত সপ্তাহে যে বলেছিলাম না, আমার একটা প্রাণভোমরা তোমায় সঁপে দিয়ে যাব? সেটাই সুনন্দদার হাত দিয়ে পাঠিয়েছি | আমার প্রথম ট্যুইশানির টাকায় কেনা প্যালগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি' বইটা | যত্ন করে রেখো, আর হ্যাঁ, প্লীজ একটু পাতা উল্টে দেখো | ইকোনোমিস্টদের কবিতা পড়া নিষিদ্ধ – এরকম কোনো 'হিপোক্র্যাটিক ওথ' নিতে হয় না তোমাদের আশা করি |

জানি, আমি যাওয়ার কথা লিখলাম বলে তুমি রাগ করবে | কিন্তু আমি তো আর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নই যে মরণকে হাত নেড়ে বলব "আমার এখন সময় নেই, যাও" | থাক ওসব কথা এখন | কলকাতায় ফিরেই আমাকে খবর দিও কিন্তু | দেখা হবে | আমার কাছে তুমি যা যা চাও, চেয়েছ, চাইবে বলে ঠিক করে রেখেছ – সব পাঠালাম এই চিঠির মধ্যে |

ইতি,

প্রিয়দর্শিনী

****

শুভ্র ইন্টারভিউয়ের পর কলকাতায় ফেরে ৯ই আগস্ট | বইটা ওর হাতে আসে ১০ই আগস্ট | তার ঠিক দুদিন আগে, সেই অভিশপ্ত ৮/৮/৮৮-র বিকেলে, ক্যান্সার জিতে যায় চিরদিনের মতো | বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবেদন মঞ্জুরের খবর আসে ৬/৪/৮৯-এ | কলকাতা-লন্ডন ফ্লাইটের যাত্রী তালিকায় 'শুভ্রকেতন রায়' নামটি দেখা যায় ৫/৭/৮৯-এ | সঙ্গে বইপত্র কিছুই ছিল না, সেসব গড়িয়াহাটের বাড়ীতেই রয়ে গিয়েছিল | ১/৩/৯০-এ শ্রী সলিল কুমার রায় চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর সরকারী আবাসন ছেড়ে কৈখালির নতুন বাড়ীতে উঠে যাওয়ার সময় জলের দরে বিক্রি হয়ে যায় ওগুলো |

জন্মদিন

জয়শ্রী বাগচী

আজ ডাক্তার রায়ের আবাসনে ওঁর নির্দিষ্ট চেম্বারটি আনন্দে মুখরিত | ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনির দল চারিদিকে হৈচৈ করে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে আর ডাক্তার গিন্নী, মিসেস রায়ও যে অনেকদিন পর সবাইকে নিয়ে বেশ গর্ব অনুভব করছেন তা দেখলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে|

রজনীগন্ধা আর গোলাপের ঝাড়ের মৃদু সুবাস পরিবেশকে আরো মোহনীয় করে তুলেছে| লাল টুকটুকে টেবিলক্লথে ঢাকা ছোট্ট টিপয়ের উপর দেওয়ালে আটকানো ডাক্তার সাহেবের ছয় ফুটের সাদাকালো একটি দীর্ঘ প্রতিকৃতি – কী উজ্জ্বল হাসি হাসি সেই অতি পরিচিত মুখটি, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মনে হচ্ছে এই বুঝি বলে উঠবেন 'কি হে, আছ কেমন? সব ভাল তো...?' পাশের দেওয়ালে ডাক্তারবাবুর বিভিন্ন বয়সের ছোট, বড় নানা মাপের নানা ভঙ্গিতে কত ছবি ঝকঝকে আলোয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে | চেম্বার সংলগ্ন টেরেসটিও ফুল ও লতাপাতায় সুসজ্জিত এবং প্রজ্জ্বলিত|

আজ এই বাড়িতে ডাক্তার সাহেবের পরিচিত কিছু বন্ধুবান্ধব ও কিছু রুগী এবং চেনাজানা অনেকেই নিমন্ত্রিত অতিথি; তবে তার সঠিক কারণ সকলেরই অজানা| এত আন্তরিকভাবে মিসেস রায় প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাই কেউই উপেক্ষা করতে পারেনি, আর কেউ জানতেও পারেনি সে নিজে ছাড়া আর কেউ নিমন্ত্রিত কিনা| তাই যথাসময়ে ডাক্তারের আবাসনে পৌঁছে এত সমারোহ ও জনসমাগম দেখে সকলেই হতচকিত| নির্দিষ্ট সময় বলা ছিল সন্ধ্যে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে| মোটামুটি সকলেই সময়মতো পৌঁছে আসনে বসে পড়েছে|

ডাক্তারের একমাত্র ছেলে ঘোষণা করল – "আজ বাবার জন্মদিনে আমরা একত্র হয়ে মিনিট দুয়েক বাবাকে স্মরণ করে নীরবতা পালন করব | তারপর একটু স্মৃতিচারণ – খুবই ঘরোয়াভাবে যার যেমন ইচ্ছে হবে... |"

নীরবতার পর অনুষ্ঠান শুরু হ'ল নাতি-নাতনির সমবেত গানে| ঘনিষ্ঠ দু'একজন ডাক্তার সাহেবের নানা গুণের কথা ও অমায়িক ব্যবহারের অনেক ঘটনার উল্লেখ করল | মিসেস রায় রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনালেন|

জন্মদিনে কেন মৃত্যুর কথা বললেন তার একটু ব্যাখ্যাও দিলেন – রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো বলেছেন "মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান|" মৃত্যু না ঘটলে নবজন্ম হতে পারে না| মৃত্যু ও জন্ম একই সূতোর দুটি ধার| জীবন চক্রেরই একটা অঙ্গ মৃত্যু অন্যটি জন্ম, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত... ইত্যাদি|

এরপর পঞ্চব্যঞ্জনে আহার, অবশ্যই দই-মিষ্টি সহযোগে| বেশ হৈ হৈ রব চারিদিকে, সকলেই গুঞ্জন মুখরিত, আনন্দিত|

কোন কিছুতেই নিন্দুকের অভাব হয় না এ তো জানা কথা; তারা বলাবলি করল, 'বাবা বেঁচে থাকতে তো কোনদিনই জন্মদিন-টিনের বালাই দেখিনি তাহলে মৃত্যুর তিন চার বছর পরে এত সমারোহ কীসের?' কেউ বলল, 'আরে বিদেশ থেকে ছেলে-মেয়ে-বৌ-নাতি-নাতনি এসেছে কিনা, সেসব জাহির করতেই এত আয়োজন|' কেউ বা বলল, 'আরে ওসব কিছু না, ডাক্তার মারা যাবার পর শ্রাদ্ধ-শান্তি কিছুই হয়েছে বলে মনে হয় না| কীসে যে উনি মারা গেছেন তাই-ই কেউ জানে না| হঠাৎই স্বামী-স্ত্রী উধাও হয়ে গিয়েছিল, আর ছেলে-মেয়েরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল| বাবা অসুস্থ হলেও কেউ আমল দেয়নি | ডাক্তার রায়ের চিকিৎসা ঠিকমতো হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারেও সন্দেহ আছে | ডাক্তারের তো ভাইবোন নেই, স্ত্রীর বাপের বাড়িও শুনেছি খুব সচ্ছল নয়, তবে ডাক্তার সাহেবের রোজগার ভাল ছিল, কিন্তু দান-ধ্যানেই সব খরচ করে ফেলেছিলেন| উনি তো ভাল মানুষ ছিলেন খুব, অথচ নিজেকে প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই চলে যেতে হ'ল...' ইত্যাদি আরো অনেক কথা|

মিসেস রায়ের কানে সবকিছুই ঢুকছিল, তবু না শোনার ভান করে ব্যস্ততার অভিনয় করে চলছিলেন | এসব কথার চর্চা অনেকদিন ধরেই যে লোকে করছিল সে সবই মিসেস রায়ের জানা | আজকের অনুষ্ঠানে এই সবকিছুর একটা যোগ্য জবাব দেবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন| তাই খাওয়াদাওয়া যখন প্রায় শেষের দিকে মিসেস রায় হঠাৎই সবাইকে সম্বোধন করে বলতে শুরু করলেন – "আমি জানি আপনাদের প্রিয় ডাক্তার বন্ধুর মৃত্যু নিয়ে সকলেরই মনে নানান প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে | আজ থেকে চার বছর আগে যখন 'কোভিড উনিশ' এক মহামারির আকার নিয়ে সারা বিশ্বে নরমেধের খেলায় মেতে উঠেছিল, যখন রোগ নিরাময়ের কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, যখন

ঘরে ঘরে মানুষ ভয়ে-আতঙ্কে দিশাহারা, যখন পথঘাট, দোকান-বাজার, অফিস-কাছারি, বিনোদন, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ঘরবন্দী করেও প্রাণে বাঁচতে পারছিল না, তখন একদল সমাজসেবী ডাক্তার, নার্স, পুলিশ তারই মধ্যে বিপর্যস্ত রোগগ্রস্তকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাঁচিয়ে তুলতে প্রচেষ্ট হয়েছিলেন | সেই দলে ডাক্তার রায়ও নাম লিখিয়ে ফেলেছিলেন | আমি ছাড়া আর কেউ জানতেও পারেনি তিনি কোথায় | সকলে ধরেই নিয়েছিল আমার সঙ্গে তিনিও বোধহয় বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন আমার অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের পরিচর্যার জন্য |

চারিদিকে মহামারির ওই ভয়াবহতা ওঁর ভেতরের ডাক্তার সত্তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল | নাওয়া খাওয়া ভুলে অদ্ভুত এক উদভ্রান্ততায় দিন কাটাচ্ছিলেন | নিজের ওই ছোট্ট ক্লিনিকে বসে কীভাবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না | তখনই এক ডাক্তার সহপাঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বাঁকুড়ার এক হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়ে চলে যান সেখানে | বিভিন্ন হাসপাতালের অনেক ডাক্তারই সেইসময় আতঙ্কিত হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তাই হয়তো উনি সহজেই ওখানে যোগ দিতে পেরেছিলেন |

জানেন, আমিও ওঁর ওই মহৎ উদ্দেশ্য থেকে ওঁকে নিরস্ত করতে পারিনি, ভেবেছি ডাক্তার সাহেব আত্মরক্ষা করতে পারবেন | একজন ডাক্তারের মূলমন্ত্র নিজের জীবন তুচ্ছ করে অন্যের জীবন দান করা | এটাই তো ডাক্তারি বিদ্যার প্রথম পাঠ – আমি সেই সিদ্ধান্তে বাধ সাধার কে?

সুদূর আমেরিকাতে বসেও প্রথমদিকে আমি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলাম, দিনের শেষে একবার আমাদের কথা হতোই | পরে ওঁর ব্যস্ততায় মাঝে মাঝে দু'চার দিন পর পর হতো | তারপর অন্য কলিগ মারফৎ, একদিন সেটাও কমে গেল | শুধু ভাল থাকার খবরটুকু পেতাম | শেষে তাও বন্ধ হ'ল | বুঝতে পেরেছিলাম সকলেই ব্যতিব্যস্ত, কে আর কাকে খবর দেবে! মুখ বুজে সব সহ্য করা ছাড়া আমারও কোনো উপায় ছিল না | ছেলে-মেয়েরা কেউই তো কিছু জানত না; তাছাড়া আসন্ন প্রসবাকে এসব জানানো উচিত হতো না |"

মিসেস রায় এবারে একটু নীরব হলেন, হয়তো সেই দিনের দুঃখ কষ্টের স্মৃতিচারণ ওঁকে আবেগমথিত করে তুলছিল, তাই বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ আপনিই থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছিল |

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলেছিলেন "যেদিন আমার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করে হাসপাতাল থেকে সেই চরম দুঃসংবাদটি আমার কাছে এসে পৌঁছেছিল – জানেন সেদিনও আমার চুপ করে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না | আমার এই নাতনি তখন সদ্যজাত, কয়েক মুহূর্ত আগেই সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে..." আবেগে আবারও মিসেস রায় থেমে গেলেন | কিছুক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন, "আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না, আমার সেদিন দুঃখ বা আনন্দ কোনো অনুভূতিই যেন মনকে নাড়া দেয়নি; শুধু ভেবেছিলাম আমি এদেশে থাকলেই বা কী করতে পারতাম... | তখন তো শহরে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্রই মানুষের মৃতদেহকে জন্তু জানোয়ারের মতো লরি বোঝাই করে ভাগাড়ে নিয়ে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, নয়তো নদীর জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিল | আমি পরবাসে থেকে তবু মনকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছি, কিন্তু এদেশে থাকলে এ ঘটনার জন্য নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারতাম না মনে হয় | হয়তো এভাবেই ডাক্তার সাহেব আমাদের সুরক্ষিত রেখে নিজের কর্তব্য করে চলে গেলেন |

আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারেননি | আমার এই নাতনির মাধ্যমেই আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন | আজ আমার এই নাতনির জন্মদিন মানে আপনাদের ডাক্তার সাহেবের চলে গিয়ে আবার ফিরে আসার দিন, আর তাই এই আয়োজন | এটাই আমার বিশ্বাস |"

এরপরে এক চরম নিস্তব্ধতায় সবাই একে একে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল; শুধু কাঁচের প্লেট-বাটির সঙ্গে চামচের টুংটাং শব্দ সেই নিঃশব্দতা ভেদ করে মিসেস রায়ের মনে এক পরম শান্তি মধুর নিক্কণে বেজে বেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল |

বাংলা ভাষাটা অনেকটা ইংরেজির মতন

বলাকা ঘোষাল

মিতা বৌদির বাড়ি গিয়ে তার হবু বউমার সঙ্গে যখন আলাপ হ'ল, দেখলাম বাড়ির সবাই নিজেদের মধ্যেও হিন্দিতে কথা বলছেন, যাতে এই অবাঙালি মেয়েটির খারাপ না লাগে | খুবই সুন্দর এই মনোভাব | অথচ এই মেয়েটির বহু বছরের যাতায়াত এই বাড়িতে | সে কি একটুও বাংলা রপ্ত করেনি? এক্কেবারেই কি বোঝে না? বিয়ের পরে কি পুরো পরিবারটাই চিরকালের মতন হিন্দিভাষী হয়ে যাবে তাহলে?

মেয়েটি খুব সুন্দর, ভদ্র | একটু আলাপ হলে জিজ্ঞেস করেই বসলাম সে বাংলা শেখবার চেষ্টা করছে কিনা বা সেরকম কোনও পরিকল্পনা আছে কিনা |

বলল, "না, বাংলাভাষা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়; কেননা ওই 'অ' উচ্চারণটা আমার ঠিক আসে না | ওটা খুবই 'অজীব!'

হতবাক হলাম বললে কম বলা হবে | এতটাই অজীব যে বলবার চেষ্টাও সে করে না! তাই প্রত্যুত্তরে যা বললাম তাতে ওর এবং ওর সঙ্গে আমার নিজেরও সেরকমই অবাক হবার পালা | বললাম, "সে ঠিকই বলেছ, বাংলাভাষাটা অনেকটা ইংরেজির মতন কিনা, তাই অনেকেরই বলতে অসুবিধে হয়ে থাকে |"

আমার মুখ থেকে ফট করে বেরিয়ে গেল, "রাইট, ইট ইজ এ লট লাইক ইংলিশ, উইথ ইটস স্ট্রেঞ্জ 'অ' সাউন্ড |"

শুনে মেয়েটা কী বলবে ভেবে পেল না | এমন বিদ্ঘুটে কথা সে কোনও জন্মে শুনেছে কিনা সন্দেহ | তবু চোয়ালটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই সামলে নিয়েছে | আমিও এই প্রথমবার না ভেবেই বলে ফেলেছি কথাটা | এই বাংলা আবার কবে থেকে ইংরেজির মতন হ'ল রে বাবা! ভাবলাম ওকে একটু বিস্তার না করলে চলছে না |

অ উচ্চারণ হয়তো সারা ভারতে একমাত্র বাংলা আর আসামেই হয়ে থাকে | এই ক্ষেত্রে ঠোঁটদুটো বেশ বড় রকমের গোলাকৃত হয়ে একটু এগিয়ে আসে | খেয়াল করলে দেখা যাবে ইংরেজিতেও ঠিক তাই | হিন্দি অ বলতে ঠোঁট কিঞ্চিৎ ফাঁক করলেই চলে | ওই 'অজীব' কথাটাই ধরা যাক | হিন্দিতে "জীব" বলতে যতটা ঠোঁট ফাঁক করতে হয় ঠিক ততটাই মুখ খুললে অজীবও বলা চলে | বাংলায় কিন্তু তা হবে না | অ বলতে হবে ঠোঁটদুটো বেশ এগিয়ে | এখনই চেষ্টা করে দেখুন না জীব আর অজীব দুটো পর পর বলে দেখে |

অজীব অ

এবার আসি ইংরেজিতে – সেখানে তো অ-এর ছড়াছড়ি! Aww থেকে awesome, সব ওই অ-এর দলে | কই, সে বেলায় তো কেউ বলে না "হমসে ইংলিশ নেহি বোলা যাতা, উওহ অ উচ্চারণ কে লিয়ে"| অথচ এই একই মানুষ 'জল' বলতে গিয়ে যেন নাজেহাল | হয় বলবে জোল, বা ওই ছোট্ট করে ঠোঁট ফাঁক করা জ্যল | এই বেলা অ উচ্চারণ করতেই পারে না | আর সেটা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণাও করে |

ইংরেজির alphabet ধরেই এগোনো যাক এবার, দেখা যাবে কতগুলো রোজকার কথা আছে জল-এর সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে; যেগুলো গোটা দেশ নিত্য বলে চলেছে – all, ball, call, doll, fall, gall, hall! আর Jall বলে কোন কথা নেই ইংরেজিতে! ওটা বাংলার কপালে জুটেছে | Kall বলে দুই ভাষাতেই কোন অর্থবহ শব্দ নেই যদিও, তবু অথেন্টিক উচ্চারণ করবার নেশায় অবাঙালিরা কোলকাতাকে ইদানীং সর্বত্র call-kata উচ্চারণ করে থাকেন | বাঙালির কান মরমে মরে গেলেও আমরা সেই উচ্চারণ শুধরে দিই না | অবাঙালিদের শুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা দেখেই আমরা গদগদ হয়ে এদের ক্ষমা করে থাকি | তারা পরম উৎসাহে রবিকে ডাকে Raw-bee আর ললিতাকে Law-lee-ta – এই ভুলগুলো আমাদের বদান্যতায় প্রচলন হয়ে গেছে | আমাদের এই অহেতুক বদান্যতায় একটা জিনিস প্রমাণ হয়ে গেছে যে সারা ভারতের সবাই দিব্যি অ উচ্চারণ করতে পারে | জল কে জোল বলবার আর কোনও যুক্তি টিকবে না |

ইংরেজির alphabet-এ আরও এগিয়ে যাওয়া যাক | Mall, Paul, tall, wall – মল? ভারতীয়রা চিরাচরিত মলত্যাগ ছেড়ে দিয়ে আজকাল মল-এর দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছেন সবচেয়ে বেশী | আর zall বলে ইংরেজির শব্দকোষে কিছু নেই, তাই বাঙ্গালরা ওটা নিয়ে নিয়েছেন জলের পরিবর্তে |

এই অ উচ্চারণের জন্য ইংরেজি বলতে অসুবিধে হচ্ছে সেটা কেউ বলেছে কী? সেটা হয়তো সাহেব-প্রীতির সংকেত | চাকরির বাজারে 'জব' বলতে অসুবিধে নেই, যত দোষ সব 'জল'-এ | সাহেবের ছেলেকে অনায়াসে 'জন' বলতে পারে

সবাই | কিন্তু যম বলতে গেলে বেরোয় "ইয়ম"| বব, রড, রব, ডগ, ব্লগ – সবেতেই অ লুকিয়ে আছে | Kaur পাঞ্জাবী নাম, দিব্যি ঘোরে মুখে মুখে | কিন্তু দেবতারা বর দিতে গেলে বলে, "বেটা, ব্যর মাঙ্গো"|

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় ছোটদের স্কুলে হাস্যকৌতুক নাটকে একটা বাঙালির ক্যারেক্টার রাখবেই, যাতে দর্শক খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে পারে | ভুল হিন্দি, অদ্ভুত বাংলা মিশিয়ে সে এক আজব চরিত্র! নাটকের প্লট আর অভিনয় যাই হোক না কেন, বাঙালির চরিত্রের কল্যাণে নাটক উতরে যায় ভালই |

খাওয়া না পান?

বাঙালিরা তরল পদার্থও 'খায়' বলে আরেক হাসির কান্ড | জল 'পান'-এর বিধান থাকলেও সেটি জলখাবার | পানীয় দ্রব্য পাতি জল নয়, বেশ উঁচুতলার উপাদেয় তরল | কিন্তু এখানেও ইংরেজির সঙ্গে মিল | সেই ভাষাতেও কনসিউম কথাটা তরল, নরম, শক্ত, সবকিছুই গলাধঃকরণ বোঝায় | আমরাও মার খাই, বকা খাই, জল খাই, জলে পড়ে খাবি খাই | একটা শব্দেই বাজিমাত!

ক্রিয়া শব্দের গণতন্ত্র

ইউ-এর সঙ্গে ক্রিয়া শব্দ, লিঙ্গ বা বচনের উপর নির্ভর করে না | He went, she went, they went. বাংলাতেও তাই | যদু গিয়েছিল, মধু গিয়েছিল, যদুর সাথে মধুও গিয়েছিল, এমনকি তাদের পুরো পরিবারও গিয়েছিল |

আমাদের ভাষায় এককালে তুই, তুমি, আপনি অনেক গতে বাঁধা ছিল | কিন্তু সময়ের সাথে সাথে 'আপনি' বলা আপনিই খসে গিয়ে তুমি ও তুই-কে জায়গা করে দিয়েছে | সম্বোধনের সিংহাসনে এখন ওরাই বিরাজ করছে – স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তো বটেই, এমনকি কর্পোরেটের বড় কর্তা ও জুনিয়রদের মধ্যেও | এখন শ্বশুর-শাশুড়িও বিয়ের পর থেকেই বউমাকে সস্নেহে তুই বলে থাকেন | এর পর হয়তো বউমারাও আল্হাদে গদগদ হয়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে তুই বলবে | তখন ইউ আর তুই-এ কোনও তফাৎই থাকবে না | সেটা বাংলার জিত না ইংরেজির জিত বলা মুশকিল | তবে এই একীকরণে মানুষে মানুষে ব্যবধান যে কমেছে সেটা মানতেই হবে |

বানানো বানান

বাংলার সাথে ইংরেজির যদি আরেকটা মিল শুনতে চান, তা হ'ল উদ্ভট বানানের | এই দুই ভাষায় বানানের কোনও যুক্তি নেই | স্রেফ মুখস্থ বিদ্যাই ভরসা | কেন? তা জানা নেই | কিন্তু এই 'কেন' শব্দটাই একটা ভাল উদাহরণ | কেন-র বানান কেন কেন হ'ল, কেউ জানেন কী? 'ক্যানো' হলে ভাল হতো না কি? আর যেন-টা য্যানো? কোরে না লিখে আমরা করে লিখি, অথচ জোড়ে-কে জড়ে লিখতে নারাজ |

ইংরেজির ডবল 'ও' দিয়ে যে কত রকমের বিদ্ঘুটে উচ্চারণ! গো আর ডু এর রহস্য তো সমাধান হবেই না | হিন্দি কিন্তু যেমনটি লেখা, ঠিক তেমনটি বলা | ফরাসী, স্প্যানিশও কতকটা তাই, উচ্চারণের নিয়মের গন্ডির মধ্যে থাকলে বেশ সহজেই গড়গড়িয়ে পড়া যায় | ইংরেজির টাফ, রাফ-এর সঙ্গে bough-এর বানান এক হলেও এর উচ্চারণ কেন 'বাও' হতে গেল সেটা রহস্যই থেকে যাবে |

উফ্, পৃথিবীর উল্টোদিকের দেশ, অথচ যেন একটা ফন্দি করে কঠিন করেছে ভাষাদুটোকে |

বাংলাকে নিয়ে সবচেয়ে রঙ্গ করে কারা? যাদের আমরা চলতি ভাষায় বলি হিন্দুস্তানি | হিন্দি ভাষার অনেক গুণাগুণ আছে ঠিকই, কিন্তু জল খাওয়া নিয়ে তাদের এত ব্যঙ্গ অনেকেরই যেন আর সহ্য হয় না | আমরা নাহয় জল শরীরে ঢোকাই বলে 'খাওয়া' বলি | কিন্তু এঁরা যারা পুলিশকে স্ত্রীলিঙ্গের খাতে ফেলেছেন...! রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাট্টাকাট্টা ইয়া গোঁফওয়ালা কনস্টেবলকে দেখে যারা কিনা বলে "পুলিস খড়ি হ্যায়" তাদের আমাদের জল খাওয়া দেখে হাসবার অধিকার কি এতটুকুও থাকা উচিৎ? আর পেল্লাই গাড়ির হর্ণ শুনে বলে কিনা, "গাড়ি বুলা রহি হ্যায় |" কেন বাবা, হঠাৎ বুলাচ্ছে, আর কাকেই বা খামোখা বুলাচ্ছে? আমার তো মনে হয় সে চেঁচাচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত হবার প্রতিবাদে | হর্ণ না বাজিয়ে বরং যদি মারত একটু গুঁতো তো বোঝা যেত গাড়ির গায়ে কেমন পুরুষালী শক্তি |

বাংলার মতনই ইংরেজিও এসবের ধার ধারে না | লিঙ্গ-বর্জিত ক্রিয়া শব্দ অন্তত পুলিশদের মান রেখেছে | আর সুখলতা রাও-এর 'হাসিখুশি' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন "হাওয়াগাড়ি যায়, বলদ পালায়, গড়ায় খানায় |" ওই হাওয়া-গাড়ি হ'ল মোটর কার, আর তার হাঁকডাক দেখে রাস্তার বলদ পালাতে গিয়ে খন্দে পড়ে গেছে দেখে কেউ অন্তত গাড়িকে

স্ত্রীলিঙ্গের মান দিয়ে অবলা ভাববে না।

এখন ইংরেজিটা বাংলার মতন মনে হচ্ছে না অনেকটা? আমার মুখ ফসকে কথাটা বেশ যুক্তিগতভাবেই নির্গত হয়েছিল ভেবে মজাই লেগেছিল বটে।

ভেবে দেখলাম, নেহাতই কাকতালীয় হয়তো যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি আফ্রিকার বড় পেনিন্সুলা ডিঙিয়ে আবার ভারতের পেনিন্সুলা কাটিয়ে, এই সুদূর বাংলায় এসে নোঙর ফেলল!

নাকি দুই ভাষার এই জব্বর মিলেরও একটা সূক্ষ্ম ভুমিকা রয়েছে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে!

বড়দি

অযান্ত্রিক

"আপনি নিজে বুঝতে পারছেন মিস্টার পাল, আপনি কী বলছেন? আপনার ছেলের কাছ থেকে আমরা কতটা ড্রাগস পেয়েছি আপনি জানেন? একজন দায়িত্বশীল আইনের লোক হয়েও আপনি শুধুমাত্র নিজের ছেলেকে বাঁচানোর জন্য এমন সব আইনের ফাঁক ফোঁকর বার করছেন? আপনার কি মনে হয় না, আপনি অন্যায় করছেন? শুধুমাত্র এই ধরনের মানুষগুলোর জন্য কত পরিবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কত ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, আপনি জানেন না? তার পরেও আপনি বলবেন, ভুল করে ফেলেছে। কোনটা ভুল মিস্টার পাল, বলবেন? পয়সার তো কোনো অভাব আপনার নেই, অতএব পেটের দায়ে করে ফেলেছে বলতে পারবেন না। আর – একটা তিরিশ বছরের ছেলেকে কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে এই পথে নামিয়েছে সেটা আমায় বিশ্বাস করতে বলেন?" প্রচণ্ড উত্তেজনায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে থামলেন, ডিসিপি নার্কটিক্স মৌলিপি সামন্ত। গতকাল রাতে লালবাজার নার্কটিক্স ডিপার্টমেন্ট ট্যাংরার একটা নাইট ক্লাব রেইড করে তিন চারজন ড্রাগস পেডলারকে ধরেছে, সাত্যকি পাল তাদেরই একজন। হাইকোর্টের বিখ্যাত ক্রিমিনাল লইয়ার দিবাকর পাল, আর উমারানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৈত্রেয়ী পালের একমাত্র ছেলে।

আজ স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায়, সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন বড়দি, ফোনটাও বন্ধ। বিকেলে খাতাপত্র, প্যাকেট চেক করে বিএলআর অফিসে পাঠিয়ে বেরোলেন এই বড়দি, মৈত্রেয়ী পাল। অটোতে উঠেই মনে পড়ল সারাদিন ওঁর ফোনটা বন্ধ রাখা আছে। ফোনটা অন করতেই মৈত্রেয়ী দেবী দেখলেন সারাদিনে প্রায় গোটাকুড়ি কল অ্যালার্ট এসেছে দিবাকরের নম্বর থেকে, আর একটা অচেনা নম্বর থেকেও। দিবাকর সাধারণত এত কল করে না; তাহলে কি সাত্যকির কিছু হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে রিং ব্যাক করে দেখলেন, রিং হয়ে যাচ্ছে, কেউ তুলছে না, হয়তো এজলাসে আছে। আজ দশ বছর উনি আর দিবাকর পাল আলাদা থাকেন। কোর্টে সেপারেশনর সময় ছেলেটা নিজের ইচ্ছেতেই বাবার কাছে থাকতে চাওয়ায় উনি আর জোর

করেননি | এখন সপ্তাহে দুবার ছেলের সাথে কথা হয় | প্রথম প্রথম ন'মাসে ছ'মাসে একদিনের জন্য মায়ের কাছে আসত, কিন্তু এখন আর আসে না |

মৈত্রেয়ী দেবী একবার সাত্যকিকেও ফোন করলেন | ওরও ফোন বন্ধ | বড়লোকী আদব কায়দায় অভ্যস্ত ছেলেটা হয়তো ঘুমাচ্ছে | অটোটা ততক্ষণে কালিকাপুর, আদর্শ নগর অটো স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছে | মৈত্রেয়ী দেবী অটোর ভাড়া মিটিয়ে অচেনা নম্বরটায় ফোন করলেন, 'ট্রু কলার'-এ তার নাম দেখে একটু চমকেই গেলেন বড়দি; ডিসিপি মৌলিপি সামন্ত? পুলিশের লোক? ওঁকে ফোন করেছিল কেন? এইসব ভাবনার মধ্যেই উল্টোদিক থেকে ভেসে এল, "কেমন আছেন মিস? আমাকে চিনতে পারলেন? আমি মৌ, আপনার ছাত্রী |"

গলাটায় কেমন একটা সম্ভ্রম আছে, যেমন ওঁর সব ছাত্রীরই থাকে; সেটা কান এড়ালো না বড়দি, মৈত্রেয়ী পালের | উনি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, "ভাল আছি রে বাবা, তুই কেমন আছিস? কিন্তু কিছু মনে করিস না বাবা, আমি না তোকে ঠিক বুঝতে পারছি না; আসলে বয়স হচ্ছে তো!" নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বেশ শান্ত গলায় বললেন মৈত্রেয়ী দেবী |

- "চিনতে পারলেন না মিস? আচ্ছা আপনার আদর্শ নগরের বাড়িতে কাজ করত শান্তামাসি, তাকে মনে আছে তো? তার সাথে আসত তার ছোট্ট একটা মেয়ে, মনে পড়ছে মিস? আমি সেই মৌ | মা পড়াশুনা ছাড়িয়ে দিয়েছিল বলে আপনি আবার স্কুলে ভর্তি করে উচ্চমাধ্যমিক অবধি বিনা পয়সায় পড়ালেন, ভুলে গেলেন সব?" বেশ উচ্ছলভাবে বলল মেয়েটি |

- "হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, তা এতদিন বাদে মনে পড়ল মিসকে? কোথায় ছিলি এতদিন? আর শান্তা কেমন আছে? বাবা, ভাই? সেই যে তোরা হঠাৎ করে চলে গেলি তারপর তো কোনো খবরই নেই?"

- "এতদিন দিল্লিতে ছিলাম মিস | এই মাসখানেক আগে কলকাতায় এসেছি, মা ভাল আছে, আমার কাছেই আছে | বাবা, ভাই আলাদা থাকে মিস, সেই আগের মতোই | আসলে আমি একটা অন্য কারণে আপনাকে ফোন করেছিলাম | আপনি একবার লালবাজার থানায় আসতে পারবেন, এক্ষুনি?"

- "মানে? কী ব্যাপার? কী হয়েছে?" একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে বললেন বড়দি |

- "আসলে মিস, গতকাল রাতে আমরা ট্যাংরার একটা নাইট ক্লাব থেকে টুবাইকে মানে, সাত্যকিকে অ্যারেস্ট করেছি, একটা ড্রাগস পেডলিং; যদিও দিবাকর স্যার এখানে আছেন, তবুও..." শেষের কথাগুলো আর শুনতে পেলেন না বড়দি | টুবাই তাঁর একমাত্র ছেলে, অ্যারেস্ট হয়েছে | মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল | সামনেই একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, "চলো, তাড়াতাড়ি লালবাজারে চলো, যত তাড়াতাড়ি পারো |"

ড্রাইভারও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটিয়ে দিল পুলিশ সদর দপ্তরের দিকে | গাড়ির পিছনের সিটে বসে উৎকণ্ঠায় প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে বড়দির | চোখটা বন্ধ করে সিটে গা এলিয়ে দিতেই ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল – টুবাই তখন ছোট; দিবাকর মিথ্যে প্রমাণ জোগাড় করে আসামীদের খালাস করিয়ে নেওয়ার জন্য রোজ বাড়িতে সমাজ বিরোধীদের আনাগোনা লেগেই থাকত, আর সেই নিয়ে রোজ চলত দুজনের মধ্যে অশান্তি | সেই সময় ওদের বাড়িতে কাজ করত শান্তা | রোজ আসত সারা গায়ে আঘাতের দাগ নিয়ে | ওর স্বামী আর দুটো ছেলেই ছিল মাতাল, সমাজ বিরোধী | মেয়েটাকে শান্তা নিয়ে আসত, বলত – 'মেয়েটা কাজ শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে স্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছি |' মৈত্রেয়ী দেবীর বেশ মনে আছে, উনিই বুঝিয়েছিলেন প্রতিবাদ করতে গেলে শিরদাঁড়া লাগে, আর শিক্ষাই কেবলমাত্র মানুষকে শিরদাঁড়া গড়ে দিতে পারে | মেয়েটাকে জোর করে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন, পড়িয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন | বুঝিয়েছিলেন অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে মেনে নেয় দুজনেই সমান অপরাধী | কাউকেই ক্ষমা করা উচিত নয় | ওঁর কথাতেই তো একদিন শান্তা তার স্বামী আর ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল | তারপরই ওরা এখান থেকে চলে যায় | সেই মেয়ে আজ এত বড় হয়ে গেছে | ভাবতেও গর্ব হয় |

গাড়িটা থামল | ড্রাইভার পিছন ফিরে বলল, "লালবাজারে এসে গেছি দিদি | নামবেন না?"

বড়দি চোখ খুলে বললেন, "না, ফেরৎ চলো, যেখান থেকে উঠেছিলাম সেখানেই ফিরে চলো | ভুল পথে চলে এসেছিলাম ভাই, কিছু মনে করো না |"

ফিশটেল বার্নার

বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক মহারাজ অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্রের বৌদ্ধভূমি ও প্রাগাধুনিক অপ্রগতিশীল লাল্লু যাদবের পাটনার প্রমোদভূমির মধ্যে বহুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শহরের কাঠামোর বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি | উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে জলাভূমি থাকার দরুণ রাজপথ, প্রজাপথ, রেলপথ সব পথেরই পূর্ব-পশ্চিম বিস্তার | বনেদি পাড়ার অশোক রাজপথ আর মেছুয়াটুলির রাজেন্দ্র সরণি সমান্তরালভাবে পাটনার জাতিভেদকে বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও মাঝে মাঝে কতকগুলি উত্তর-দক্ষিণ যোজক রাস্তা তাদের মধ্যে যোগাযোগ না ঘটিয়ে ছাড়ে না| বনেদি পাড়ার বাবুরা মাছের থলি হাতে নিয়ে আর মেছুয়াটুলির মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে প্রায়ই বকেয়া বচসা করে এইসব যোজক রাস্তাগুলির ফুটপাথে | সেইরকম এক যোজক রাস্তা খাজাঞ্চি রোডের গলিতে আমাদের ভাড়া বাড়ি | পাশে বাড়ি সংলগ্ন খোলা নালী | বর্ষাকালে পাটনার খোলা নালীগুলোতে জোয়ার আসে | সেসময় এই নালীগুলো আমাদের নৌকা ভাসানো প্রতিযোগিতার আধার | প্রতিযোগিতা হলেও সকলেই খেলোয়াড় সুলভ | মেজদার কাজ হ'ল সকলের জন্য নৌকা বানানো | সেজদার কাজ নৌকাডুবি হলে নৌকা উদ্ধার করা | পাড়ার বন্ধু গাবলুর কাজ বৃষ্টিতে নৌকার উপর ছাতা ধরে নৌকানুসরণ করা | আর আমার কাজ নালী ওরফে বৈতরণী পার করা আর নৌকাডুবির হিসেব রাখা | নৌকাডুবির নৌকা উদ্ধারের মহৎ কাজে নালীর সাথে সেজদার বিশেষ যোগাযোগের ফলস্বরূপ ছোটবেলায় টাইফয়েড হয় | যমে-মানুষে ছ'মাস যুদ্ধ করে প্রাণ বাঁচলেও সেজদার স্মরণশক্তি কিছুটা ক্ষীয়মান হয়ে পড়ে |

স্কুল ফাইনালে তৃতীয় চেষ্টায় পাস করে সেজদা যোগ দেয় 'পাটলিপুত্র সায়েন্স ইকুইপমেন্ট' কম্পানির সেলসম্যান চাকরিতে | নিয়মিত ব্যায়াম-কুস্তি আর নিয়মনিষ্ঠ ছোলা-ছাতু সেবনে সেজদার ভীমবৎ শক্তি | সে একহাতে কেমিক্যাল ব্যালেন্স আর অন্য হাতে ফিজিক্যাল ব্যালেন্স নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে বিভিন্ন স্কুলে ডেমন্সট্রেশন দিত তার কম্পানির দাঁড়িপাল্লার চরম ভারসাম্যের | বলা বাহুল্য তার ডেমন্সট্রেশনে দাঁড়িপাল্লা ভারসাম্য চ্যুত না হলেও বহু সায়েন্স টিচারের মানসিক ভারসাম্য চ্যুত হয়েছিল |

বড়দিনের ছুটি | কর্ম-তালিকায় দুটি কাজ – ক্রিকেট খেলা আর গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন | স্কুলের অসমতল মাঠে গুডলেংথ ক্রিকেট বলও 'বীমার' হয়ে তেড়ে আসে | ক্রিকেটের নিয়মানুসারে স্থানীয় বর্মে কাজ চলে না; 'ম্যান ইন দ্য আয়রন ম্যাস্ক'-এর প্রয়োজন | প্রতি সন্ধ্যায় ক্রিকেট খেলার পর কাজ হ'ল বাড়ি এসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চুন-হলুদ লাগানো | দূর থেকে দেখে লোকে ভাবত যে ছেলেটার জনডিস্ হয়েছে; হাত-পা সবই হলদে | প্রায় রাত্রেই দুঃস্বপ্ন দেখি – রক্তিম ক্রিকেট বলটা উল্কার মতো ছুটে আসছে আমার ব্রহ্মতালু লক্ষ্য করে, আর আমি প্রাণপণে ছুটছি | অনেকবার 'নো বল, নো বল' বলে গলদঘর্ম হয়ে ঘুম ভেঙে গেছে | সন্ধ্যেবেলা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙ্গ হয়ে যখন জলতরঙ্গ বাজছে তখন বড়দার তত্ত্বাবধানে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন | যাদব চক্রবর্তীর পাটিগণিতের তৈলাক্ত বংশদন্ড এবং বাঁদরের অঙ্ক সমাধান করা – সতেরো ফুট তৈলাক্ত বংশদন্ডে বাঁদর যদি সাত ফুট উঠিয়া আবার সাড়ে চার ফুট পিছলাইয়া পড়ে তবে... ইত্যাদি | ভাবতাম বাঁদরের কি আর কোনও কাজ নেই? তবুও যদি বাঁশের মাথায় কলার কাঁদি ঝুলত... তাছাড়া কারই বা সময় আছে বসে বসে সতেরো ফুট বাঁশে তেল লাগাবার!

ছুটির মাঝামাঝি প্রাণ যখন এক্কেবারে ওষ্ঠাগত তখন হঠাৎ দৈববাণী হ'ল যে সেজদা ট্যুরে ছাপরায় যাবে | রাত্রে তার বাইসেপে রেড়ির তেল মালিশ করতে করতে ভয়ে ভয়ে জ্ঞাপন করলাম –

"হে রাম, লক্ষণ হইবে তোমার সেবক
দূর ছাপরা বনবাসে |
কহ কহ লবে সাথে
বল বল বঞ্চিত করিবে না তব সেবাদাসে |"

ঘুম জড়ানো গলায় উত্তর এল, "কোমরটা দে, ঘুম পেয়েছে | ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না |"

গঙ্গার ওপারে ছাপরা | মহেন্দ্রু জাহাজ ঘাটের জন্য সাইকেল রিক্সা ডেকে এনেছি | বাবার প্রিয় সারথি রামখিলায়নজীর রিক্সা | মাশুল বেশি, ক্ষণে ক্ষণে চেন খুলে যায়

আর তৈলাভাবে চাকায় সারাক্ষণ একটা ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ | সাইকেল রিক্সার গায়ে আঁকা হনুমানজী গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে সূর্যদেবতাকে বগলদাবা করবার জন্য তাড়া করছে | ছবির নিচে বড় বড় হরফে লেখা –

'ইয়ে রিক্সা নেহি
পবনরথ হ্যায় |
যাঁহা চলোগে
হনুমানজী সাথ হ্যায় |'

মালের ঠেলায় বসবার জায়গা নেই | কেমিক্যাল ব্যালেন্স, ফিজিক্যাল ব্যালেন্স, রংচটা টিনের স্যুটকেস ভর্তি তিনখানা থ্রি-পিস্-স্যুট, তাছাড়া একটা ইয়া বড় চটের বস্তা – ভেতরে কি জানি কী আছে, সারাক্ষণ টং টং আওয়াজ করছে | যেখানে ছাপরার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হলদে ধুতি, লাল মোজা, বুটজুতো আর ফতুয়া পরে জজসাহেবী করেন সেখানে সেজদা থ্রি-পিস্-স্যুট পরে হাঁটলে রাস্তার লেড়ে কুকুরগুলো নিশ্চয়ই 'এলিয়েন' ভেবে তাড়া করবে | ভয়ার্ত গলায় শুধালাম, "বস্তাটাতে কী আছে রে?" গুরুগম্ভীর গলায় সেজদা জানাল, "কম্পানির নতুন প্রোডাক্ট লাইন – ফিশটেল বার্নার |" যেভাবে বলল তাতে কিছুই বোধগম্য হ'ল না | মাছের তেল নাকি মাছের ল্যাজ! ভাবলাম বার্নারটা বোধহয় মাছের তেলে জ্বলে, কারণ মাছের ল্যাজের সঙ্গে প্রদীপের কী সম্বন্ধ কিছুতেই ঠাহর করতে পারলাম না | হঠাৎ দেখি রামখিলায়নজীকে সিটে বসিয়ে সেজদা নিজেই সাইকেল রিক্সা চালাতে শুরু করেছে | জিজ্ঞেস করে জানলাম সে নাকি আজ ব্যায়াম করবার সময় পায়নি, সেজন্য এটাই ওর আজকের দৈনিক ব্যায়ামের অঙ্গ |

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে | পাটনায় নতুন নিয়ম হয়েছে যে গোধূলি লগ্নে সাইকেল রিক্সাতে কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালাতে হবে | খাজাঞ্চি রোড আর অশোক রাজপথের মোড়ে বাঁদর-টুপিপরা ট্র্যাফিক পুলিশ চেঁচিয়ে উঠেছে, "এ রিক্সা, রোকো রোকো, রিক্সামে লাইট নেহি হ্যায় |" পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে সাঁই সাঁই করে রিক্সাটা হাঁকিয়ে সেজদা উত্তর দিয়েছে, "ক্যায়সে রোকেঙ্গে? ব্রেক ভি নেহি হ্যায়!"

শীতের গঙ্গার চর বাঁচিয়ে জাহাজ পৌঁছাতে প্রায় তিন ঘন্টা লেট হ'ল | সেজদা থার্ড ক্লাস টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে কট কট করে ছোলা খাচ্ছে | কখন সেই দুপুরে ভাত খেয়েছি, আমার পেটে তখন ধেড়ে ইঁদুর ডন-বৈঠক দিচ্ছে | জাহাজ ঘাটের পাঞ্জাবী ধাবা থেকে ভুর ভুর করে মাংস আর ঘিয়ে ভাজা পরোটার গন্ধ আমাকে চাইনীজ টর্চার করছে | আমতা আমতা করে সেজদার কাছে জানতে চাইলাম ডিনারের কী ব্যবস্থা করেছে |

উত্তরে দুটি কথা – "ছোলা খাবি?" করুণ কণ্ঠে জানালাম যে কাঁচা ছোলা খেলে আমার পেট কামড়ায় | ইচ্ছে করছিল সবল কণ্ঠে বলি, 'তোমার আর ঘোড়া-ছাগলের ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই |' বিপাকে পড়লে ডিপ্লোম্যাটিক হতেই হয়!

সবে বলতে শুরু করেছি, "ওই পাঞ্জাবী ধাবা থেকে মা..." কথাটা লুফে নিয়ে সেজদা আদেশ দিল, "ঠিক বলেছিস | যা দু'আনার ডাল কিনে আন | তড়কা দিতে বলবি; আর একটা এক্সট্রা ভাঁড় |" সেজদা যে 'মা' শুনতে 'ডা' শুনবে সেটা আমারই দুর্ভাগ্য! বচসা করে কোনও লাভ নেই; পড়েছি যবনের হাতে, 'ডাল' খেতে হবে সাথে | তবে যবনরা অনেক ভাল | তারা মাংস ভালবাসে আর ডাল দুচক্ষে দেখতে পারে না | ডাল আনতে আনতে দেখলাম সেজদা টিনের স্যুটকেস থেকে একটা গোটা পাঁউরুটি বের করেছে | ব্রিটানিয়ার স্লাইসড্ ব্রেড নয়, হিমু মিঞার বেকারিতে তৈরী 'শাহজাহান' ব্র্যান্ড | নরসিংহের মতো এক খাবলা রুটি ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে বলল, "নে নে, ডাল-রুটি খেয়ে নে | দারা সিং ডাল-রুটি ছাড়া অন্য কিছুই খেত না |"

জাহাজের থার্ড ক্লাসের পাটাতনে ফিজিক্যাল ব্যালেন্স, কেমিক্যাল ব্যালেন্স, চটের বস্তাভর্তি ফিশটেল বার্নার আর টিনের স্যুটকেসটা দিয়ে একটা গুহা তৈরী করে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লাম | তবুও পৌষ মাসে পাটনায় পুবের হাড়-কাঁপুনি বাতাস থেকে নিস্তার পেলাম না | ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে অবশ্যম্ভাবী ডবল নিউমোনিয়া জপ করতে করতে সোনপুর ঘাটে পৌঁছালাম | ঘাট থেকে রেল-স্টেশনে যেতে উঁচু খাড়াই | প্রথমটা জলাভূমির কাদা, মাঝখানটা মরুভূমির বালি আর শেষে পার্বত্য অঞ্চলের বড় বড় পাথরের নুড়ি | 'কুলি' বলে চেঁচাতেই এক ধমক দিয়ে সেজদা জ্ঞান দিল, "কুলি ডাকে অসুস্থ লোকেরা | ইয়ং ম্যান, ম্যাস্কুলার বডি – আমরা কুলি নেব? ছিঃ ছিঃ! তুই ব্যালেন্স করে দু'হাতে এইদুটো ব্যালেন্স নে, আর আমি বস্তাটা পিঠে নিয়ে স্যুটকেসটা আঙুলে ঝুলিয়ে নিচ্ছি |"

খাড়াই অবস্টাকল কোর্সের মধ্যে দিয়ে ব্যালেন্সদুটোকে টানতে টানতে আধমরা হয়ে সোনপুরের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছালাম। কাদার প্রলেপ, বালির ছিটে নুড়ির আঘাতে বিধ্বস্ত ব্যালেন্সগুলোর আর কোনও স্বতন্ত্রতা রইল না। ফিজিক্যাল আর কেমিক্যাল মিলেমিশে 'কমিক্যাল' ব্যালেন্স'-এ পরিণত হ'ল। গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাকি সোনপুরের নাম সবথেকে লম্বা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উল্লিখিত আছে। বোকার মতন তিনটে প্ল্যাটফর্ম পাশাপাশি না করে একটানা করলে যে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া যায় সে তত্ত্বটা বিহারী এক্সিকিউটিভ সিভিল এঞ্জিনিয়ারবাবুর জানা ছিল। বোকামির গোল্ড মেডেলের এটাই স্বাক্ষর, আর যাত্রীদের বাপান্ত।

ছাপরা লোকাল আসবে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ঘুমচোখে একহাতে ফিজিক্যাল আর এক হাতে কেমিক্যাল ব্যালেন্স ঝুলিয়ে তিন ফারলং হেঁটে ট্রেনে চড়লাম। ট্রেন ঠাসা, বসার জায়গা নেই। সেজদা নিজে টিনের স্যুটকেসের ওপর বসে আমাকে বসালো ফিশটেল বার্নারের বস্তার ওপর। ছোট লাইনের ছাপরা এক্সপ্রেসের ঝাঁকুনিতে সারারাত মাছের ল্যাজের কাঁটাগুলো আমার পশ্চাৎদেশকে জর্জরিত করল।

সকালে ছাপরা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে প্রাতঃকর্ম সেরে সেজদা থ্রি-পিস্-স্যুট পরে বেরিয়ে আসতেই ময়লা উর্দিপরা ওয়েটার সেলাম ঠুকল। বোধহয় আশা করেছিল কিছু বকশিশ পাবে; কিন্তু সে গুড়ে বালি! ভয় হ'ল সেজদা না আবার বকশিশ হিসেবে তাকে কিছু ছোলা দিয়ে দারা সিংয়ের জীবনস্মৃতি আওড়ায়।

ক্ষিধে পেয়েছে। ব্রেকফাস্টের কথা বলতেই সেজদা এক্কেবারে সাহেবি কায়দায় ওয়েটারকে অর্ডার দিল, "টু টি প্লিজ।" ফিসফিস করে বললাম, "শুধু চা, পিত্তি পড়বে যে! অম্বল হবে। হেভি ব্রেকফাস্ট দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন।" কে শোনে কার কথা! দেখি আবার সেই শাহজাহান ব্রেড বার করেছে। বললাম, "রুটিটা তো শাহজাহান ব্রেড থেকে লেড়ে বিস্কুটে পরিণত হয়েছে।" গম্ভীর হয়ে সেজদা উত্তর দিল, "চা-টা কেন আনিয়েছি? চায়ে ডুবিয়ে খেয়ে নে।"

ব্রেকফাস্ট সেরে মালপত্তর নিয়ে টমটমে চড়ে 'সেন্ট টমাস কনভেন্ট' স্কুলে পৌঁছালাম। দেখি প্রিন্সিপ্যাল পাদ্রীসাহেব লুঙ্গির ওপর একটা সাদা আলখাল্লা পরে নিমের দাতঁন দিয়ে দাঁত মাজছেন। স্কুল কম্পাউন্ডটা একটা চিড়িয়াখানা – গাধা, শুয়োর, কুকুর, গরু, মুরগি, বেতো ঘোড়া সব চরে বেড়াচ্ছে। পাদ্রীসাহেবের প্রভাতের প্রথম কাজ হ'ল জন্তু-জানোয়ার ভাগানো। স্কুলে সেন্ট টমাসের স্ট্যাচুটা বহু বছরের বৃষ্টিতে কালো হয়ে ট্যানজেনিয়ার আদিবাসীর রূপ ধারণ করেছে।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সেজদা পাদ্রীসাহেবকে সুপ্রভাত জানিয়ে নিজের পরিচয় দিল। তার উত্তরে ঠাট ভোজপুরি হিন্দিতে পাদ্রীসাহেব সেজদাকে আদেশ দিলেন স্কুলের পিছনের পাড়া থেকে বিজ্ঞানবাবু ওরফে শ্রী শ্রীবাস্তব যাদবকে ডেকে আনতে। সেজদার থ্রি-পিস্ স্যুটের অবমাননা সহ্য করতে না পেরে আমিই গেলাম বিজ্ঞানবাবুকে ডাকতে। গিয়ে দেখি বিজ্ঞানবাবু গরুর দুধ দুইছেন। খবর নিয়ে জানলাম তিনি নাকি শ্রীকৃষ্ণের ডিরেক্ট বংশধর; গো-সেবাই তাঁর প্রধান ধর্ম, বিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি নিমিত্ত মাত্র।

ল্যাবরেটরিতে ডেমন্সট্রেশন আরম্ভ হয়েছে। ছাত্ররা সব গ্যালারিতে। ল্যাব টেবিলের সামনের চেয়ারে প্রিন্সিপ্যাল পাদ্রীসাহেব ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা। টেবিলের পিছনে চারজন সায়েন্স টিচার – ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি ও জ্যুলজি; আর তাঁদের মধ্যে জাজ্বল্যমান আমার সেজদা। আমি ছাত্রদের গ্যালারির এক কোণে জবুথবু হয়ে বসে আছি। বলা বাহুল্য সকল জনতার মধ্যে থ্রি-পিস্ স্যুটপরা আমার সেজদাকেই সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। টেবিলের একপ্রান্তে ফিজিক্যাল ব্যালেন্স, অন্য প্রান্তে কেমিক্যাল ব্যালেন্স আর মাঝখানে টেবিল জুড়ে সারি সারি ফিশটেল বার্নার সাজানো। আমি জীবনে এই প্রথম ফিশটেল বার্নার দেখলাম। বুনসেন বার্নারের ছুঁচো মুখটা কেউ যেন হাতুড়ি মেরে ভোঁতা করে দিয়েছে, অনেকটা যেন বোয়াল মাছের মুখের মতো। ভাবলাম এই বস্তুটাকে 'বোয়াল মাউথ' না বলে 'ফিশটেল' বলা হয় কেন? সেজদার লেকচার সবটা সরল করে বুঝিয়ে দিল। দাঁড়িপাল্লা ও ফিশটেল বার্নারই বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ... এই গূঢ় তত্ত্বটা সেজদা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল। দেখি পাদ্রীসাহেব হাই তুলে তুড়ি বাজাচ্ছেন আর ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এই প্রথম একটানা ইংরেজি বক্তৃতা শুনছে। বক্তৃতার শেষে ঝঞ্ঝার মতো হাততালির প্রতিদানে সেজদা ওয়েস্টকোটের দু'পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে বার বার হেঁট হয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সেদিন খুব গর্ব বোধ

করেছিলাম সেজদার এই অভূতপূর্ব হাবভাব দেখে। ঠিক যেন 'গন উইথ দ্য উইন্ড'-এর ক্লার্ক গেবল।

এরপর এল আসল পালা। বহু চেষ্টা করেও ব্যালেন্সগুলোকে সমতুল্য করা গেল না। চারজন সায়েন্স টিচার আর সেজদার ঘন্টাখানেক ধস্তাধস্তির পর দেখা গেল সারা ল্যাব-টেবিল জুড়ে প্রচুর ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। ব্যালেন্সদুটোকে বিধ্বস্ত করার অপরাধে সেজদার রদ্দার চিন্তায় হঠাৎই আমার পিঠটা কনকন করতে লাগল। একখানা চটের বস্তা আনিয়ে দুটো ব্যালেন্সের ভগ্নাবশেষ ঝেঁটিয়ে তাতে ভরে বাইরে করিডোরে রাখা হ'ল। এবার ফিশটেল বার্নারের কেরামতি! সেজদা ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে তিমিমাছের ল্যাজের ইয়া বড় একটা ছবি এঁকে দিল। ভাবলাম এ তো এক্কেবারে পি সি সরকারের ম্যাজিক, ঐটুকু বোয়াল মাছের মুখ থেকে অত বড় তিমিমাছের ল্যাজ বেরিয়ে আসবে! আশপাশের ছেলেগুলো সামনে ঝুঁকে জুলজুল করে চেয়ে আছে আসল ম্যাজিক দেখার জন্য। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব উত্তেজনায় তাঁর লম্বা সাদা দাড়িতে বার বার হাত বোলাচ্ছেন। গ্যাসের টিউব সংলগ্ন হয়েছে ফিশটেল বার্নারে। কেমিস্ট্রি অধ্যাপক শ্রী শ্রীবাস্তব উদ্বোধন করবেন এই অবাস্তব যন্ত্রটিকে। ওয়ান-টু-থ্রি – দেশলাই জ্বালিয়ে ঝুঁকে পড়ে আগুন জ্বালাতেই একটা লকলকে রক্তিম অগ্নিশিখা তেড়ে এসেছে বিজ্ঞানবাবুর ফতুয়া লক্ষ্য করে। ফিশটেল বার্নারটা আহত কেউটে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে শুরু করেছে। আর সেই ভেটকির মুখ থেকে লেলিহান শিখা কখনও ডাইনে, কখনও বামে, কখনও ঊর্ধ্বে উঠে শিবের তান্ডব নৃত্য শুরু করেছে। বটানির অধ্যাপিকা শ্রীমতী পল্লবী প্রসাদ বিকারে জল নিয়ে বিকারগ্রস্ত শ্রীবাস্তবের বুকে জলের ছিটে দিচ্ছেন তাঁর বুকের আগুন নেভাবার প্রচেষ্টায়। ফিজিক্সের অধ্যাপক শ্রী রামবাহাদুর সিং গ্যাস ট্যাঙ্কের মেন ভ্যালভ বন্ধ করার অজুহাতে হল থেকে পলায়ন করেছেন। জ্যুলজির অধ্যাপক শ্রী পশুপতিনাথ দুবে একলাফে ছাত্রীদের গ্যালারিতে। আর পাদ্রী প্রিন্সিপ্যাল সাহেব নিজের লম্বা সাদা দাড়ি আলখাল্লার ভেতরে লুকিয়ে রেখে করিডোর থেকে হলঘরে উঁকিঝুঁকি মারছেন। শুধু ছেলেগুলো এই অভাবনীয় ম্যাজিক দেখে প্রাণখুলে হাততালি দিচ্ছে।

দুটো চটের বস্তা আর টিনের স্যুটকেসটা নিয়ে সেজদা আর আমি পরের দিন পাটনায় ফিরে গেলাম। সোনপুর স্টেশনে সেজদা নিজেই পুরি আর শালপাতার ঠোঙায় আলুর তরকারি এনে আমাকে ঘুম থেকে তুলে নিজে হাতে খাওয়ালো।

তার পরের দিন ট্রিপ রিপোর্ট দিতে গিয়ে ম্যানেজার সেজদাকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন, আর সেজদার এক মাসের মাইনে কেটে নিলেন।

বছরখানেক ধরে বহু জায়গায় চাকরির চেষ্টা করে বিফল হয়ে সেজদা শেষে আর্মিতে যোগদান করল। পোস্টিং হ'ল সুদূর জোজিলা পাসে।

এরপর বেশ অনেক বছর সেজদার সঙ্গে দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে আমি স্কুল ফাইনাল পাস করে কলেজে ঢুকেছি। পাটনা সায়েন্স কলেজের কেমিস্ট্রি ল্যাবে কাজ করতে করতে একদিন দূরের টেবিলে একটা জ্বলন্ত ফিশটেল বার্নার দেখেছিলাম। তার নীলাভ শিখার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়ি। দেখি ছাপরায় ব্ল্যাকবোর্ডে সেজদার আঁকা তিমিমাছের ল্যাজটা সমস্ত হলঘর জুড়ে খেলা করছে। সত্যিই ম্যাজিক!

সেজদার জিনিসপত্রভরা বস্তাদুটো বাড়ির কয়লা গুদামে পড়ে ছিল, কেউ খেয়ালই করেনি। সেই গুদাম থেকে একখানা ফিশটেল বার্নার নিয়ে অনেকগুলো মাস চেষ্টা চরিত্রের পর ঠিক তিমিমাছের ল্যাজের মতোই আগুনের শিখা বার করতে পেরেছিলাম।

ছ'বছর পর যুদ্ধ শেষে সেজদা যখন বাড়ি ফিরল, তখন সেই বছরে তার জন্মদিনে এক কেজি ছোলা, একখানা শাহজাহান ব্রেড আর ওই ফিশটেল বার্নারটা উপহার দিয়েছিলাম।

আশীর্বাদ

আনন্দিতা চৌধুরী

ফুটপাথে ভিড় করে মানুষ | চোখে মুখে সবারই অসহায় অপেক্ষা | বাস আসেনি অনেকক্ষণ, আসবে কিনা তারও কোনো ঠিক নেই | এক একটা অটো কোনো ঘুরপথে যদি বা এসে পড়ছে, তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পঞ্চাশটা লোক | কোথায় নাকি বেপরোয়া কোন লরি একটি শিশুকে ধাক্কা মেরে পালিয়েছে... মারমুখি জনতার প্রতিবাদে দোকানপাট ভাঙচুর, রাস্তা অবরোধ, যানবাহন বন্ধ | অফিসফেরত মানুষগুলোর মনে শিশু আর তার পরিবারের লোকজনের প্রতি সহানুভূতি ছাপিয়ে নিজেদের বাড়ি ফেরার দুর্ভাবনাই প্রধান এখন |

আর দাঁড়িয়ে থেকে কিছু লাভ আছে... নাকি বাড়ির দিকে হাঁটতেই শুরু করে দেবে... ভাবছিল মণিমালা | অনেকটা পথ... অন্তত খানিকটা এগোলে যদি রিকশা টিকশা কিছু পাওয়া যায় | 'বৌদি বৌদি' ডাকটা যে তার উদ্দেশ্যে সেটা বুঝতে একটু সময় লাগে | তাকে দেখলে বিবাহিতা তো মনে হয় না... রাস্তাঘাটে অচেনা লোক দিদিই ডাকে আজকাল | ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা গাড়ি, ড্রাইভারের মুখটি চেনা | ড্রাইভার দিলীপদা | আর পেছনে... বুকটা ধক করে ওঠে মণিমালার... নাহ, সে নয় | তবে পেছনে বসা তার শ্বশুরমশাই | মানে... প্রাক্তন শ্বশুরমশাই, সুবিমলবাবু |

- "উঠে এসো... বাড়ি পৌঁছে দিই | আজ বাস অটো পাওয়ার কোনো আশা নেই | এসো |"

মণিমালার ইচ্ছে হয় না বলে দেয় | ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে ওদের দিতে চাওয়া সব কিছুতেই সে না করে দিয়েছে; এখনও করতে চায় | কিন্তু আজ রাস্তার যা অবস্থা! আকাশটাও কালো করে আসছে | বেশি দেরি হলে মা আজকাল এত অস্থির হয়ে পড়ে! ভয় মেয়ের শারীরিক নিরাপত্তার | আবার বিয়েভাঙা মেয়ে দেরি করে বাড়ি ফিরলে পাড়ার লোকের লকলকে জিভেরও | কী করবে এখন! দিলীপদা দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে – একপ্রকার বাধ্য হয়েই পিছনের সিটে উঠে বসে মণিমালা | বাস স্টপে ভিড়ের ঈর্ষাভরা চোখের সামনে বেশ অস্বস্তি লাগে যদিও |

- "কেমন আছ, মণিমালা?"

ঠিকই তো | বাড়ির সবাই তাকে মণি ডাকলেও, উনি সব সময়ে পুরো নামে ডাকতেন তাকে | তাকিয়ে দেখে মণিমালা | খুব একটা লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল না কখনোই, কিন্তু এতটা শীর্ণও ছিল কি? অসুখবিসুখ হয়েছিল নাকি!

- "আপনি ভাল আছেন?"

সামনে থেকে আগেভাগে উত্তর দেয় দিলীপ, "বড় হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল বৌদি, যমে মানুষে টানাটানি..."

- "আহ্, ও সব কথা থাক দিলীপ | তোমার বাবা-মা কেমন আছেন মণিমালা?"

মণিমালার ইচ্ছে হয় বলে, মধ্যবিত্তের একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে পাকাপাকিভাবে ফিরে এলে তার বাবা-মা যেমন থাকে, তেমনই আছেন |

মুখে বলে, "ঠিকই আছেন |"

প্রাক্তন শাশুড়ির কথা জানতে চাওয়া তার উচিৎ কি? কিন্তু কীভাবে? মা সে ডাকতে চায় না আর | বাড়ির সবাই কেমন আছেন – বলবে? না না, তাহলে তো ভাববে তার কথা জানতে চাইছে | উফ্, কেন যে মরতে গাড়িতে উঠতে গেল মণিমালা! আয়না দিয়ে মাঝে মাঝেই তাকে দেখছে দিলীপদা | কৌতূহল বশ মানছে না বোঝাই যাচ্ছে | বিয়ের পরদিন ফুল সাজানো গাড়িতে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার সময় সারথির আসনে ছিল এই দিলীপদাই | আবার সেদিন যখন মণিমালা ও বাড়ির পর্ব চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, ছুটে এসেছিল দিলীপদা |

- "আমায় দিন বৌদি, গাড়িতে রাখি, আমি পৌঁছে দিই আপনাকে | কোথায় যাবেন, বাপের বাড়ি?"

মণিমালা বলেছিল, "দরকার নেই; আপনি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন বরং |"

আচ্ছা, দিলীপদা জানত না? তার ফুলে যাওয়া মুখ, ভারী ব্যাগ তুলতে ব্যথা পাওয়া হাত... সব লক্ষ্য করেছিল? চিৎকার শুনেছিল সুদীপের? বলে বেড়িয়েছিল সবাইকে?

উফ্... কেন আবার ওইসব ভাবছে! আর তাছাড়া কারো কিছু জানার আর কীই বা বাকি আছে! এখন নাহয় ওইসব ভুলে ভদ্রতা করে কোনমতে পথটুকু কাটিয়ে দিতে চেষ্টা করা যাক |

- "কেমন আছেন দিলীপদা? মেয়ের কোন ক্লাস হ'ল?"
- "এগারো ক্লাস বৌদি | মাধ্যমিকে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে |"
- "বাহ্! কী পড়ছে?"

মণিমালা যে নেহাত নিরুপায় হয়েই গাড়িতে উঠেছে, খুবই অস্বস্তিতে আছে এবং নেহাত ভদ্রতাবশত কথাবার্তা চালাচ্ছে, নেমে যেতে পারলে বাঁচে – বুঝতে পারেন সুবিমলবাবু। তবু, ওঁর নিজের কিন্তু ভাল লাগছে। ভাগ্যিস ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় রাস্তা আটকে ঘুরপথে এদিকে এসে পড়েছিলেন। মেয়েটার অফিস যে আজকাল এদিকে সেটাও তো জানা ছিল না। অন্তত দেখা তো হ'ল। মাঝে মাঝেই মনে হতো, মনে হয় মেয়েটার কথা। খোঁজ নিতে ইচ্ছে করে। কোন মুখে নেবেন! ছেলেটা... তাঁর নিজের ছেলেটা এই মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিল।

হ্যাঁ, উনি তাই মানেন। ছেলে মানে কিনা জানেন না, ছেলের মা মানেন না মোটেই, কিন্তু উনি নিজে অপরাধ বোধ কাটাতে পারেন না, পারেননি কোনোদিন।

কত ধুমধাম করে বাড়িতে এনেছিলেন মেয়েটাকে... কত আলো, কত গান, কত হাসি-গল্প-খাওয়া-দাওয়া! শুকনো মুখে, ছল ছল চোখে, দিলীপের ডেকে দেওয়া ট্যাক্সিতে উঠে যেদিন চলে গেল মেয়েটা দুটো স্যুটকেস আর দুটো ব্যাগ নিয়ে সেদিন লজ্জায় সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেননি উনি। রুমা অবশ্য বলেছিল, 'যাচ্ছ যাও, ঠিক সুড়সুড় করে ফিরতে হবে।' উনি শুধু বলতে পেরেছিলেন, 'ছিঃ রুমা, ছিঃ!'

মণিমালার বাবার সহকর্মী, আর ওদিকে তার শাশুড়ির দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়সূত্রে আসে সম্বন্ধটি। ছেলের পড়াশোনা, বাড়িঘর, চাকরি, মেয়ের রূপ, পড়াশোনা, আজকাল চাকরিও... এইটুকুই তো দেখা হয়। এখানেও হ'ল। সব দিক মিলে যাওয়ায় বিয়েটাও হয়েই যায়। যেটা তখন কারো মনে হয়নি জানা প্রয়োজন বা জানানোর প্রয়োজন... সেটা হ'ল ছেলেটির স্বভাব।

সুদীপের মা গদগদ হয়ে বলেন এবং চিরকাল বলে এসেছেন, 'আমার বাবুর ছোট থেকেই যা রাগ না... কোনো কিছু মনের মতো না হলেই জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে, ভেঙে ফেলে একাকার কাণ্ড। ব্যাটাছেলের রাগ – বাবা!

এই তাণ্ডব রাগের প্রথম প্রকাশ মণিমালা দেখে বিয়ের মাসকয়েক পরে। অফিসে ইয়ার এন্ডিংয়ের কাজ চলছে, ফিরতে রাত হচ্ছে মণিমালার। সেদিন সুদীপ হঠাৎ সিনেমার টিকিট কেটে, জানায় তাকে। অনেক চেষ্টা করেও ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারে না মণিমালা। বাড়ি ফিরে দেখে আবহাওয়া থমথমে। শাশুড়ির মুখ ভার, "শুধু অফিস অফিস করলেই চলে না মণি, বরের মনটাও একটু বুঝতে হয়।" নিজেদের ঘরে ঢুকতেই শুরু হয় বাবুর চিৎকার। ওদের দুজনের সঙ্গে আরেক বন্ধু দম্পতির নাকি যাওয়ার কথা ছিল, তাদের সামনে সম্মান হানি হয়েছে তার। নিজেকে কী মনে করে মণি, কোথায় কী করে বেড়াচ্ছিল মণি অফিসের নামে... ইত্যাদি। চিরকাল ঠাণ্ডা, শান্ত-চুপচাপ পরিবারের মেয়ে মণিমালা; এই চিৎকার চেঁচামেচি দেখার অভ্যাস নেই, স্তম্ভিত হয়ে যায় সে।

এর পর থেকে প্রায়ই ছোট ছোট কারণে ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ভাঙা, ভাতের থালা ঠেলে ফেলা, দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা বাড়ি না ফেরা, ফোন না ধরা... জেরবার হয়ে যেত মণিমালা। কিসে যে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কিসে সুদীপ রেগে যাবে, সেই টেনশনে, আতঙ্কে কেমন সিঁটিয়ে থাকত সে। মেপে মেপে পা ফেলতে ফেলতে, হিসেব করে কথা বলতে বলতে তার স্বাভাবিক হাসিখুশি স্বভাবটাই যেন হারিয়ে যেতে বসেছিল। প্রতিবার শাশুড়ি বলতেন, "জানো তো ওর মাথা গরম; রাগিয়ে না দিলেই পারো। একটু মন জুগিয়ে চললে ক্ষতি কী!" শ্বশুরমশাই প্রতিবার বকাবকি করতেন, তিরস্কার করতেন ছেলেকে। প্রতিবারের ঘটনার পর কাচুমাচু মুখ করে 'সরি' বলত সুদীপ।

কিন্তু সেইবার... সেইদিন... শুধু গলা নয়, হাত তুলল সুদীপ। কেন, আর মনে নেই মণিমালার। শুধু মনে আছে মুচড়ে ধরা কব্জি আর চড় পড়া গালে অসহ্য ব্যথা, তার থেকেও অসহ্য বিস্ময়। তার মতো, তাদের মতো "ভদ্র শিক্ষিত চাকুরিরতা" মেয়েও বরের হাতে মার খায়!

ছুটে এসেছিলেন শ্বশুর, শাশুড়ি। সুদীপ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থেকে নিজের ব্যাগ গোছাতে শুরু করে মণিমালা।

শ্বশুরমশাই বারবার বলেন, "একটু ভেবে দেখো মণিমালা, জানি ও অন্যায় করেছে, তবু আর একবার... আমি কথা বলব ওর সঙ্গে।" শাশুড়ি বলেন, "বেশি দেমাক দেখিয়ে বেরিয়ে গেলে কিন্তু এই বাড়ীতে আর..."

না, ওই বাড়িতে আর ফেরেনি মণিমালা। কিছু চায়নি,

নেয়নি, মামলার তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি ছাড়া | ভোলার চেষ্টা করেছে সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো | কিন্তু আজ স্মৃতি আবার ভিড় করে আসে, অতীতে তলিয়ে যায় মণিমালা |

পাশের একটা গাড়ির জোর হর্ণে চটক ভেঙে হঠাৎ দেখে বাড়ির কাছের বড় রাস্তায় এসে গেছে গাড়িটা | থামাতে বলে মণিমালা | বাড়ি অবধি নিয়ে যাওয়া মানেই বাবা-মায়ের অজস্র প্রশ্ন; তার চেয়ে এখানে নেমে যাওয়াই ভাল |

যাওয়ার সময় পিছন ফিরে একবার তাকিয়ে মণিমালা বলে, "সাবধানে থাকবেন | আসি | আসি দিলীপদা |"

তার হেঁটে চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকেন সুবিমলবাবু | মেয়েটা একবারও বাবা বলে ডাকল না আজ | ডাকত আগে | খুব মিষ্টি করে ডাকত | নাম ধরে ডাকলে কখনও শুধু 'আসছি' কিংবা 'কি' বলে সাড়া দিত না | সবসময় বলত 'হ্যাঁ বাবা, আসছি বাবা, যাই বাবা'| 'বাবা খেতে দিয়েছি আসুন', 'বাবা, চা খাবেন' 'বাবা, এই যে আজকের কাগজটা'| বকাবকিও করত – 'কেন মনে করে প্রেসারের ওষুধটা খাননি বাবা' 'বাবা, এত রাত জেগে টিভি দেখছেন কেন? শুতে যান'...

অনেক সময় শুধু এই 'বাবা' ডাকটা শোনার জন্যই উনি মণিমালাকে ডাকাডাকি করতেন | ছেলের সময় নেই, মর্জিও নেই বাবার কাছে এসে দু'দণ্ড কথা বলার; সে ধারেকাছে ঘেঁষেই না বিশেষ | এই পরের মেয়ের মুখে 'বাবা' ডাকে তাই প্রাণটা জুড়োত |

আজ ডাকল না | একবারও না | কেনই বা ডাকবে! বিয়ের পরদিন যখন আনতে গিয়েছিলেন, মণিমালার মা-মাসি-কাকিরা কান্নাকাটি করছিল | মণিমালার চোখেও জল দেখেছিলেন | মণিমালার বাবা অশোকবাবুর চোখদুটো শুকনো, মুখে কোনো কথা নেই, শুধু দুই হাত দিয়ে সুবিমলবাবুর দুটি হাত চেপে ধরেছিলেন | কী বলছিল হাতদুটো? 'আমার প্রাণটা সঁপে দিলাম আপনাদের হাতে | আমার তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমার ছোট্ট পুতুল, আমার চোখের মণি, আমার আদরের ধন তুলে দিলাম আপনাদের হাতে | ভাল রাখবেন, যত্নে রাখবেন | এতদিন আমি রেখেছি, আজ থেকে ওকে ভাল রাখার দায়িত্ব আপনাদের |

সুবিমলবাবুর নিজের দুই হাত মুঠোয় ধরা ওই দুটি হাতকে নীরবে বলেছিল, 'হ্যাঁ রাখব | শপথ করছি ওকে ভাল রাখার দায়িত্ব আজ থেকে আমার, আমার ছেলের, আমার পরিবারের'|

বাবা হওয়ার সেই অঙ্গীকার রাখতে পারেননি | তাই 'বাবা' ডাক শোনার অধিকারও হারিয়েছেন সুবিমলবাবু |

তবু, মেয়েটার এই সোজা হেঁটে যাওয়াটা দেখে ভাল লাগল | মনে মনে বলেন, 'বাঁচো মা, মাথা উঁচু করে বাঁচো'!

ভূমধ্যসাগরে কলকাতা

সফিক আহমেদ

১

শখ হয়েছিল স্পেন দেখব | কোথাও যাওয়ার আগে একটু আধটু গবেষণা করা দরকার, তাই পড়াশোনা শুরু করলাম দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের এই দেশ নিয়ে|

দেশটির মূল ভূখন্ডের দক্ষিণে জিব্রাল্টার, দক্ষিণ এবং পূর্বে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে ফ্রান্স, অ্যান্ডোরা এবং বিস্কে উপসাগর, আর পশ্চিমে পর্তুগাল এবং অ্যাটলান্টিক মহাসাগর|

ভূমধ্যসাগর স্পেনের পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলকে স্নান করায়; অ্যাটলান্টিক মহাসাগর ঘিরে আছে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, কোস্টা দে লা লুজ (আন্দালুসিয়া) এবং গ্যালিসিয়ার অংশকে| এইটুকু পড়াশোনা করে চলে গেলাম এক ট্রাভেল এজেন্টের কাছে| 'উঠল বাই তো কটক যাই'-এর মতো এক্ষুনি স্পেনে যেতে চাই | কারণটাও অদ্ভুত – হঠাৎ অফিসে গিয়ে শুনলাম আমাকে ছুটি নিতে হবে, কেননা একটা বড়সড়ো প্রজেক্টের কাজ আসতে দেরি হচ্ছে | শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটা হামেশাই হয় উত্তর আমেরিকাতে | কখনো ছুটি থেকে ফিরে আসতে অনুরোধ করে, কখনো বলে কাজের চাপ কম তাই ছুটি কাটাও | দু'দশক এদেশে থাকার পর এই জরুরি বা অনির্ধারিত ছুটি কাটানোতে বেশ রপ্ত হয়ে গেছি|

করিতকর্মা ট্রাভেল-এজেন্ট অনেক খুঁজে বার করল মাদ্রিদ, সেভিল, গ্রানাডা এবং বার্সেলোনায় ৯ দিনের স্পেন সফর| 'ইউরেকা' বলে প্লাস্টিকের কার্ড ঘষে কিনে ফেললাম প্যাকেজ ট্যুর, আর পরেরদিন প্লেনে চেপে মাদ্রিদ | শুরু হ'ল আমার স্পেন সফর|

স্পেনে জীবন যেন একটা উৎসব, আর নিজেকে সবসময় এই উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি মনে হয় | সিয়েস্তার অবসর, বিকেলে ফ্ল্যামেঙ্কো, গভীর রাতে Tapas বার | Tapas বারে পানীয়সহ স্ন্যাকস পরিবেশন করা হয় | ভিড়ে সরগরম প্লাজাগুলো ঝলমলে আলো জ্বেলে যেন রাতের স্বপ্নপুরী!

শুরু হয় বেড়ানো | স্পেনের মধ্য দিয়ে ৯ দিনের ভ্রমণ | মাদ্রিদ থেকে সেভিল, গ্রানাডা থেকে ভ্যালেন্সিয়া, একটা মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা | বার্সেলোনায় গাউদির মাস্টারপিস, টলেডোর মধ্যযুগীয় ধনসম্পদ এবং আন্দালুসিয়ান সমতল ভূমিগুলি দেখার মতো | মাদ্রিদের প্রেমে পড়তে বেশি সময় লাগে না|

এই সুন্দর রাজধানীটিতে কয়েক শতাব্দী আগে রাজা তৃতীয় চার্লস পুনর্জীবন দিয়েছিলেন | শহরটা এখনও আগের মতোই সুন্দর | সূর্যাস্তের সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ফুটবল-পাগল শহরটাকে জেগে উঠতে দেখা যায় | এই শহরের দর্শনীয় জায়গাগুলোতে হেঁটে বেড়ানোয় একটা মাদকতা আছে | সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যা থেকেই খুঁজে পাওয়া যায় শহরের ঝকমকে নাইট-লাইফ, যেখানে স্থানীয়রা রাতের অনেকগুলো ঘন্টা কাটিয়ে দেয়|

মাদ্রিদের প্রাণকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে গ্রান ভিয়া যাওয়ার পথে সিবেলস ফাউন্টেন, রয়্যাল প্যালেস এবং পাসেও দে লা কাস্তেলানা দেখে বিকেলে নিজের মতো সময় কাটানো|

ইউনেস্কো-তালিকাভুক্ত শহর সেগোভিয়াতে রোমান জলাশয় আর আলকাজারের দুর্গ যেন রূপকথার দেশে সময় কাটানো| প্রাচীন শহরের প্রাচীর এবং ঐতিহ্যবাহী তলোয়ার তৈরির দীর্ঘ উত্তরাধিকার নিয়ে পাহাড়ের চূড়ার শহর টলেডো | এখানে ইতিহাস জীবন্ত| প্রতিটি রাস্তায় সিনাগগ, ক্যাথেড্রাল আর গ্র্যান্ড প্লাজার দৃশ্য দেখা, স্টিলের ওয়ার্কশপে গিয়ে রোমান আমলের তলোয়ার তৈরির ঐতিহ্য আবিষ্কার করা | তারপর দক্ষিণে পুয়ের্তো ল্যাপিসে যাত্রা, যেখানে কাল্পনিক ডন কুইক্সোটকে একজন স্থানীয় সরাইখানার মালিক নাইট উপাধি দিয়েছিল | লা মাঞ্চার সমতলভূমি আন্দালুসিয়ার পাহাড়ে মিশে যায় আর শান্ত গ্রামগুলো তাদের নিজস্ব সময়ে চলে যায়|

পরের দুরাত্রি সেভিলে কাটানো | সেভিলের ঝলমলে শহরটা জীবনের স্পন্দন আর স্প্যানিশ উৎসাহে ভরপুর | সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ, চমৎকার আবহাওয়া আর ফ্ল্যামেনকোর বাড়ি – অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এটা কয়েক শতাব্দী ধরে রাজপরিবারের (এবং হাজার হাজার ভ্রমণকারীর) প্রিয় ছুটির জায়গা | ১৯২৯ সালে Ibero-আমেরিকান এক্সপোজিশনের জন্য নির্মিত মারিয়া লুইসা পার্ক শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত দর্শনীয় জায়গা | সেভিলের ওল্ড কোয়ার্টারে গলিগুলির গোলকধাঁধায় উদ্দেশ্য-মূলকভাবে হারিয়ে যাওয়া বা ১৪ শতকের গ্র্যান্ড মুরিশ আলকাজারে সময় কাটানোর অভিজ্ঞতা স্পেন ভ্রমণে একটা অন্য মাত্রা দেয়|

সকালে সেভিল থেকে গ্রানাডা যাত্রা | গ্রানাডা সেই সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, যখন মুররা সিয়েরা নেভাদার পাদদেশে শাসন করেছিল | উত্তর আফ্রিকায় নির্বাসিত হওয়ার আগে তাদের শেষ দুর্গ গ্রানাডা | এখনও মুরিশ স্থাপত্য এবং টেটেরিয়া টি-হাউসগুলোতে আরব প্রভাব দেখা যায় | আলবাইসিন কোয়ার্টার শহরের প্রাচীনতম এলাকা, যা আরব কোয়ার্টার নামেও পরিচিত | এর মুরিশ ইতিহাস আবিষ্কার করা আর গ্রানাডার উপর দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আলহাম্ব্রার সুরক্ষিত দুর্গ দেখা হ'ল | এখানে প্রাণবন্ত জিপসি নাচগান দেখা দিনের শেষের এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা |

পরের সকালে গুয়াডিক্সের পাহাড়ে মাটির নীচ থেকে উঠে আসা জাদুকরী সাদা চিমনি দেখলাম | এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে শহরের ট্রোগ্লোডিটাসের প্রজন্ম বসবাস করছে | আধুনিক শহর ভ্যালেন্সিয়া বা স্থানীয় ভাষায় 'বাহ-লেন-থি-এ'-তে যাওয়ার আগে এই গুহাবাসীদের দেখে এক দারুণ অভিজ্ঞতা হ'ল | শিল্প ও বিজ্ঞানের অনন্য শহর ভ্যালেন্সিয়া | আধুনিক বিনোদন কেন্দ্রে সংস্কৃতি আর বিজ্ঞানের সহাবস্থান দেখলে আশ্চর্য হতে হয় |

এরপর লেভান্ট অঞ্চলে পেনিসকোলা, 'দ্য সিটি ইন দ্য সি'-তে মনোরম ভ্রমণ | এখানে বিশাল টেম্পলার দুর্গ, একসময় স্প্যানিশ পোপের প্রাসাদ হিসাবে ব্যবহার হয়েছিল | হলিউড ফিল্ম, এল সিড-এ বিখ্যাত হয়েছিল এই দুর্গ |

তারপর সুন্দর কোস্টা দৌরাদা ধরে বার্সেলোনার রৌদ্রস্নাত উপকূলে পৌঁছানো | রাস্তার পারফর্মার এবং শিল্পীদের দেখতে দেখতে পথ চলা, গাউদির অবিশ্বাস্য লা সাগ্রাদা ফ্যামিলিয়া এবং প্লাসা দে কাতালুনিয়া, মন্টজুইকের শীর্ষ থেকে শহরের সবচেয়ে অত্যাশ্চর্য দৃশ্য, স্প্যানিশ আর্ট নুভেউ স্থপতি আন্তোনি গাউদির বিখ্যাত মুখোশ, মন্টসেরাট পর্বতমালার মঠে কালো ম্যাডোনা দেখা, গথিক কোয়ার্টারের পাতায়ভরা গলিতে হাঁটা – সবটাই অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা |

সূর্যাস্তের পরে, অ্যাডভেঞ্চার চালিয়ে যাওয়া আর নতুন ভ্রমণ বন্ধুদের সাথে সমুদ্র উপকূলের বার-এ কাভা, স্পেনের সবথেকে জনপ্রিয় স্পার্কলিং ওয়াইন উপভোগ করতে করতে দিনের শেষে সন্ধ্যা আর অনেক রাত পর্যন্ত সময় কেটে যায় |

এত লম্বা স্পেন! ইম্পেরিয়াল শহর টোলেডো আর সোনালী সবুজ ল্যান্ডস্কেপের মধ্য দিয়ে আমাদের দুর্দান্ত দুঃসাহসিক অভিযান শেষ হয়ে গেছে, এইবার বাড়ি ফেরার পালা |

২

'পায়ের তলায় সর্ষে' প্রবাদ অনুযায়ী আমার স্পেন ভ্রমণ শেষ হয়েও শেষ হ'ল না | শেষ থেকে আবার শুরু, বার্সেলোনা থেকে মেডিটেরেনিয়ান ক্রুস শুরু হ'ল এবার | স্পেনের মাটি ছেড়ে ঢুকে পড়লাম জলে ভাসা একটা আস্ত শহরে | সাতদিন, সাতরাত্রি জলে ভাসতে ভাসতে নতুন নতুন গল্প খুঁজে পেতাম যা আমার মনে গেঁথে আছে |

প্রথম সন্ধ্যায় জাহাজের খোলে বিশাল বলরুমে ইন্ট্রোডাকশন পার্টি | জাহাজে সারাদিন বিকিনি, বারমুডা আর হাওয়াইয়ান শার্ট পরে ঘুরলেও সন্ধ্যাবেলায় বলরুমে ফর্মাল ড্রেস যেন কর্পোরেট পার্টির আবহাওয়া | মৃদুস্বরে বাজছে Neil Diamond-এর গাওয়া Sweet Caroline, Pharrell Williams-এর গাওয়া Happy, Frank Sinatra-র গাওয়া Come Fly with Me, চারিদিকে সুসজ্জিত মহিলাদের পারফিউমের সুগন্ধ, সার্ভারদের হাতে হাতে ঘুরছে ফিঙ্গার ফুডস আর শ্যাম্পেন | দেখা গেল ব্যবসায়ী প্রমোশন | বিভিন্ন কাউন্টারে উগ্র পোশাকে সজ্জিত মডেলরা জাহাজে কী কী উপায়ে খরচ করা যায় তার ফিরিস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সবাই কিছু না কিছু জিনিস ফ্রী দিচ্ছে | যেমন ফুট কেয়ার সেন্টারে একজোড়া অর্থোপেডিক সোল কিনলে আপনার সহযাত্রীর লাগুক বা না লাগুক এক জোড়া সোল ফ্রী, হেয়ার salon-এ চুল কাটলে ভুরু তোলা ফ্রী | আরো দামি হেয়ার স্টাইল করলে আরো কী না কী ফ্রীতে বিলিয়ে দিচ্ছে, জাহাজের মল-এ প্যান্ট কিনলে জামা ফ্রী, ড্রেস কিনলে অন্তর্বাস ফ্রী, অন্তর্বাস কিনলে কি ফ্রী সেটা উহ্য রেখেছে | ক্যাসিনোতে ৫০০ ডলারের টোকেন কিনলে ৫০০ ডলার ফ্রী, এইরকম খরচ আর ফ্রীর দোলাচলে ভাসতে ভাসতে একটা কাউন্টারে দেখলাম বেশ ভিড় | ভিড় ঠেলে কী আছে জানার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক | সিনেমার টিকিটের জন্য ভিড় উৎরে সামনে চলে যাওয়ার স্কিল আমাদের সহজাত | ভিড় কাটিয়ে সামনে গিয়ে দেখি 'মেডিটেরেনিয়ান ম্যাসাজ পার্লার অন ডেক' একটা বিশাল ফরচুন হুইল দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আর সবাই একবার করে সেটা ঘোরাচ্ছে | ডিস্কে প্রচুর শূন্য আর কিছু নম্বর আছে ১ আর ২ | শূন্য ছাড়া ভাগ্যচক্র যে নম্বরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে,

সেই নম্বরের একটা ক্যুপন সুন্দরী মডেল সহাস্যে হাতে দিয়ে বলছে ডেক পার্লারে ফোনে এই ক্যুপন নম্বর জানালে ফ্রী ম্যাসাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে।

আমার সুযোগ আসতেই জয় মা বলে কপাল ঠুকে সজোরে ঘুরিয়ে দিলাম ভাগ্যচক্র। বারকয়েক ঘুরে ০-১-০-২-০-০-১-০-২-এর শেষে গিয়ে শূন্যের খাদে পড়ার আগেই আটকে গেল। প্রবল হাততালিতে জানতে পারলাম আমি নাকি ২ ঘন্টা ফ্রী ম্যাসেজ অন ডেক-এর ভাগ্য অর্জন করেছি।

ভিড় কাটিয়ে বীরদর্পে ভাগ্যলক্ষ্মী ক্যুপন নিয়ে এগিয়ে গেলাম বার কাউন্টারে। এখন কর্পোরেট পার্টির চেহারা রক কন্সার্টের মতো হয়ে গেছে। বার কাউন্টারে কতকগুলো জিমন্যাস্ট ড্রিঙ্কস মিক্সিংয়ের খেলা দেখাচ্ছে। ছোটবেলা, সরি, বড়বেলার থেকে শেখা ধারণা যে কখনোই ড্রিঙ্কস মিক্স করবে না, হুইস্কি খেলে হুইস্কি, বীয়ার খেলে বীয়ার, ভদকা খেলে ভদকা – একনিষ্ঠ থাকতে হবে। বোদ্ধাদের সেই উপদেশ নস্যাৎ করে বার-টেন্ডার রাম, ভদকা, হুইস্কি, জিন, হাতের সামনে যা পাচ্ছে এক একটা লম্বা গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে, তারসঙ্গে কুচি কুচি বরফ রঙিন সিরাপ, গ্লাসের কানায় ধুলোবালির মতো নুন ঝাল টক মিষ্টি লাগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ককটেলের নাম নিয়ে। কোনো কোনো গ্লাসে আবার বাহারি ফল আঙুর, চেরি, আনারসের টুকরো দেখা যাচ্ছে। এখানেও স্কিল খাটিয়ে খানদুয়েক কি জানি কী ককটেল বাগিয়ে ফেললাম।

পার্টির শেষে ভাগ্যলক্ষ্মী ক্যুপন আর ককটেলের মৌতাতে জাহাজের খোলে খুঁজে খুঁজে নিজের কেবিনে ফেরা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের থেকেও দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল। জাহাজের সামনের দিকের লিফ্টে করে কেবিন নম্বর ১৩১২, তেরো তলার বারো নম্বর ঘরে যেতে হবে। সকাল থেকে বারকয়েক ঘরে বাইরে মানে কেবিনে আর ডেকে যাতায়াত করে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। লিফ্টে উঠে ককটেলের মৌতাতে কখন যে মনে ডিস্লেক্সিয়া হয়ে নম্বরগুলো উল্টে-পাল্টে ১২১৩ হয়ে গেল খেয়াল নেই। লিফ্টের ১২ নম্বর বোতাম টিপে ১২ তলার ১৩ নম্বর ঘরে পৌঁছে মিনিট পাঁচেক খুটখাট করে চাবি খোলার চেষ্টা করে ঘেমে নেয়ে উঠেছি। এমন সময় দরজা খুলে বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এল এক দশাসই চেহারার মানুষ, তার পেছনে আরেকজন, যে পুরুষও হতে পারে বা মহিলা। ওই যে আজকাল IJKLMNOP দিয়ে পরিচয় দেয় সেই রকম গোছের। মানুষটার মুখে তখন f-এর ফুলঝুরি। আমি f---ing মধ্যরাতে তার f---ing দরজায় কী করছি, আমার কি f---ing কোনো কাজ নেই ইত্যাদি। F-এর ধারাবর্ষণে জর্জরিত হয়ে জুলজুল চক্ষে তাকিয়ে থাকা দেখে মায়া পরবশ হয়ে সামনের দৈত্যাকার মানুষটাকে সরিয়ে সেই অর্ধ নারীশ্বর আমার হাতের চাবিটা নিয়ে পরীক্ষা করে বলল, "Honey, তুমি ভুল করেছ, তোমাকে যেতে হবে তেরো তলার বারো নম্বর কেবিনে, আর এটা বারো তলার তেরো নম্বর কেবিন।

ততক্ষণে f-এর ধারাবর্ষণে আর IJKLMNOP-এর মুখের হানি সম্ভাষণে আমার মৌতাত চটকে মৌচাকে ঢিল পড়ার পর যেমন হুল ফোটে সেই অবস্থা। কোনোরকমে সরি বলে তার হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে তড়াক করে ব্যাক জাম্প দিয়ে সোজা লিফ্টের দিকে। পিছন থেকে তখনও কানে আসছে সেই দৈত্যের অনেক নতুন নতুন f-এর প্রয়োগ আর অর্ধ নারীশ্বরের খিলখিল হাসি।

লিফ্ট এল কিন্তু তাতে বিশেষ জায়গা নেই। পার্টিফেরত নরনারী রসেবশে মশগুল, কোনরকমে একপাশে কাৎ হয়ে মহিলাদের মাঝে একটু জায়গা করে ঢুকে পড়লাম, আর নির্ভুলভাবে ১৩ নম্বর বোতাম টিপে দিলাম। তাই দেখে কী হাসি সবার – আমি নাকি f---ing অলস, একটা তলাও হেঁটে উঠতে পারি না। তারা তো আর জানে না আমার উপর কী ঝড় বয়ে গেছে।

যাইহোক, কানে ভার্চুয়াল তুলো গুঁজে লিফ্ট থেকে বেরিয়ে সটান পৌঁছে গেলাম তেরো তলার বারো নম্বর কেবিনে। একবার চাবি ঘোরাতেই কুটুস করে খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। আলো না জ্বালিয়ে কোনোরকমে জামাকাপড় বদলে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘুম আসছিল না, ব্যালকনির দিক থেকে আসা পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ছিল মুখে। ব্যালকনিতে আরাম কেদারায় বসে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলাম দিকচক্রবালের দিকে, রূপোলি চাঁদের প্রতিফলন দেখছিলাম নিকষ কালো জলের গহীন সমুদ্রে। এই ভাবের জগতের তাল হঠাৎই কেটে গেল একটা চিন্তায়, আমার ভাগ্যলক্ষ্মী লটারির টিকিট হারিয়ে ফেলিনি তো! তরাং করে উঠে শার্টের পকেট হাতড়ে দেখলাম আছে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী চিরকুট। নিশ্চিন্তমনে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ডুবে গেলাম গভীর ঘুমে।

৩

পরদিন একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠে পৌঁছে গেলাম ডেকের ব্রেকফাস্ট লবিতে। সারা পৃথিবীর খাবার থরে থরে সাজানো ব্রেকফাস্ট বুফেতে। দশদিন পদযাত্রার পর এই রাজকীয় ব্যবস্থা দেখে যারপরনাই আহ্লাদিত চিত্তে কফি আর খানকয়েক দেশ বিদেশের কুকি নিয়ে বসলাম ডেকের ধারে একটা চেয়ারে। দৈনন্দিন চা-বিস্কুটের বদলে কফি আর কুকি খাওয়ায় একটা আভিজাত্য আছে। থিন এরারুট, টোস্ট বিস্কুট বা Parle-G-এর বদলে কুকি! যা বিস্কুটও হতে পারে আবার কিশমিশ, ওটস, চকলেট চিপস, বাদামভর্তি বেকড ডেসার্টও বলা যেতে পারে। সকালের মিঠে রোদ্দুর আর সমুদ্রের হাওয়ায় ছোট ছোট কুকির টুকরো মুখে চালান করে ইতালিয়ান এসপ্রেসো আর স্টিমড মিল্ক দেওয়া ঘন latte-তে চুমুক দিয়ে অলস দিনটা শুরু হ'ল। বেলা একটু বাড়তে একের পর এক খাবার টেস্ট করা আর সঙ্গে শ্যাম্পেন আর ফলের রস দিয়ে তৈরী মিমোসাতে চুমুক। দূর সমুদ্রে অন্য জাহাজের ভেসে যাওয়া আর ভেঁপুর শব্দ, সীগাল আর আলবাট্রসের ঝাঁক সমুদ্রের জলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরার চেষ্টা, আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা সব যেন ক্যানভাসে আঁকা চিত্রপট। মিমোসার নেশা আর মৃদু হাওয়াতে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। তার মাঝেই ভাগ্যলক্ষ্মী লটারির টিকিটটা উড়তে উড়তে ক্যানভাসে ঢুকে পড়ল।

কেবিনে ফিরে জামার পকেট হাতড়ে উদ্ধার হ'ল প্রায় কুঁচকে যাওয়া লটারির টিকিট। কুঞ্চিত টিকিটের পিছনে লেখা ফোন নং দেখে ইন্টারকম থেকে ফোন করতেই ফোনের ওপারে সুরেলা গলায় উত্তর, "গুড মর্নিং স্যার, বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "ইয়ে মানে, কালকে বলরুমে আপনাদের ম্যাসাজ পার্লার স্টল থেকে একটা ক্যুপন পেয়েছিলাম তাই ভাবছিলাম এটা নিয়ে কী করতে হবে।"

ওপার থেকে রিনরিনে গলায় সোৎসাহে উত্তর, "আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না স্যার, যা করার আমরাই করব, একটু অপেক্ষা করুন আমি একবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রেজিস্টারটা দেখে নিচ্ছি। আপনার জন্য ১টা থেকে ৩টে একটা স্লট পাওয়া গেছে, আপনি পৌনে একটায় এসে আমাদের রিসেপশনে যোগাযোগ করুন। আশা করি আপনার অভিজ্ঞতা খুবই মনোরম হবে, ক্যুপনটা সঙ্গে আনতে ভুলবেন না কিন্তু। আমাদের পার্লার ১৫ তলায়, বোতে স্টারবোর্ড সাইডে। অপেক্ষায় থাকব।"

ফোনটা রেখে আমার গত রাতের ভুল গন্তব্যে পৌঁছানোর দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা মনে ভেসে উঠল। তাড়াতাড়ি জাহাজের ম্যাপ খুলে বোঝার চেষ্টা করলাম কোথায় যেতে হবে। ম্যাপ আর গুগলের সাহায্য নিয়ে বুঝলাম জাহাজের সবচেয়ে সামনের অংশকে 'বো' বলা হয়; জাহাজের বাঁদিকের অংশটিকে 'পোর্ট' আর ডানদিকটিকে 'স্টারবোর্ড'। অর্থাৎ ১৫ তলায় জাহাজের সামনের দিকে ম্যাসাজ পার্লার।

হাতে ঘন্টাখানেক সময় আছে ডেক-এ আরেকটা মিমোসা নিয়ে কিছু সময় কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম লটারির ভাগ্যানুসন্ধানে। নির্ভুলভাবে পৌঁছে দেখি রিসেপশনে সুবেশী ললনা গভীর মনোযোগে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কিবোর্ডে ঝড় তুলে কিছু একটা লিখছে। আমি পৌঁছাতে যুগল ভুরু তুলে আমার দিকে তাকাতেই আমার মনে ভেসে এল উর্দু শায়রির একটা লাইন – "জো উনকি আঁখোঁ সি ব্যায়ান হোতে হ্যায়... ওহ লাফজ শায়রি মেকাহা হোতে হ্যায়।"

আমি কিছু বলছি না দেখে মৃদু হেসে সে বলল, "হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ স্যার?"

ইতস্তত করে কোঁচকানো চিরকুটটা এগিয়ে দিলাম তার দিকে। "ওয়েলকাম টু হেভেন অন দ্য সি" বলে আমার নাম, ধাম, কেবিন নম্বর, ঠিকুজি কুষ্ঠি, কোনো অ্যালার্জি আছে কিনা, আমি রেসিস্ট কিনা অর্থাৎ কোনো বিশেষ দেশের মস্যুস-এ আমার আপত্তি আছে কিনা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের একটা প্রশ্নপত্র ক্লিপবোর্ডে আটকে আর একটা পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে বলল, "আরাম কেদারায় বসে এটা ভর্তি করে নিয়ে আসুন।"

আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল পাঁচতারা নার্সিংহোমে ডাক্তার দেখাতে এসেছি। পার্থক্য শুধু চারিদিকে ফুলের সুরভি আর এপ্রনপরা নার্সের বদলে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাই হীল আর রং-বেরঙের গাউনপরা মহিলারা। একজন ঠান্ডা শরবত জাতীয় পানীয় নিয়ে এসে বলে গেল, "প্লিজ, ফীল কমফর্টেবল।" বোধ হয় আমার জবুথবু আড়ষ্ট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তার চোখে পড়েছে। যাইহোক, সব প্রশ্নের সাধ্যমতো উত্তর দিয়ে কাউন্টারে মহিলার হস্তগত করার পর তিনি একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "আপনি ডানদিকের প্যাসেজের একদম শেষ ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন,

আমাদের হোস্টেস মানে সেবিকা আপনাকে গাইড করবে।"

যাওয়ার পথে বাঁদিকে একটা বড় ঘরের জানলা দিয়ে চোখে পড়ল স্বর্গের অপ্সরারা মর্ত্যে এসে গল্পগুজব করছে। নির্দিষ্ট ঘরে গেলাম। যদিও রেসিস্ট নই, তবু মনে হচ্ছিল অলিতে গলিতে থাই ম্যাসাজের যা প্রতিপত্তি তাতে অন্য কোনো মস্যুস এলেই ভাল। তবে ফ্রী ম্যাসাজে beggars cannot be choosers। আমার বরাত বরাবরই ভাল; মেঘ না চাইতেই জলের মতো কিছুক্ষণ পর দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল ইউরোপিয়ান সুন্দরী মস্যুস। মুচকি হেসে আমাকে নিয়ে চলল ম্যাসাজ রুমের দিকে। ঘরটা মনে হ'ল যেন অপারেশন থিয়েটার। মাথার উপর আলো, সার্জিকাল বেড। পাশে ডাক্তারের বসার টুল, যেটা উঁচুনিচু হয়। মাথার কাছে কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভূমধ্যসাগর। অপারেশনের রুগীরা যেমন পরে, তেমনি একটা পিঠখোলা আলখাল্লা বাড়িয়ে দিয়ে বলল আপনি পোশাক বদলে নিন, আমি পাঁচ মিনিট পর আসছি। আমার হাওয়াইয়ান শার্ট আর বারমুডা খুলে এপ্রন পরে তৈরী হয়ে সার্জিকাল বেডে অপেক্ষা করছি। দরজায় টোকা দিয়ে তিনি আবার আবির্ভূত হলেন।

ঘরে ফুলেল সুবাস, মৃদু মোহন বাঁশির সুর আর জলপ্রপাতের শব্দে একটা মোহময় পরিবেশ, যেটা অপারেশন থিয়েটারের সাথে খাপ খায় না। ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে। আমি বাধ্য ছেলের মতো উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। মুখটা গিয়ে পড়ল একটা ডোনাট বালিশের উপর। ডোনাটের ফুটো দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া আর মেঝের দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকার ব্যবস্থা আরকি!

ঘরের আলো একটু মৃদু করে দিয়ে শুরু হ'ল ম্যাসাজ। প্রথমে পদসেবা, কোমল হাতে আমার কর্কশ কেজো পায়ে যখন তেল লাগিয়ে ম্যাসাজ করছিল তখন বেশ কুণ্ঠা বোধ হচ্ছিল। পরিবেশ হালকা করতে সে টুকরো কথা শুরু করল। পরিচয় দিতে জানাল তার নাম আনাস্তাসিয়া, ম্যাসেডোনিয়া তার দেশ, বহুদিন দেশছাড়া, এই জলের বুকেই ভেসে বেড়ায় রুটিরুজির জন্য। এইটুকু শুনেই আমার মনে হ'ল এর মধ্যে একটা গল্প লুকিয়ে আছে। প্রশ্ন করলাম, "তোমার নামের মানে কি?"

উত্তর দিল, "আনাস্তাসিয়া হচ্ছে resurrection বা জীবন ফিরে পাওয়া।"

- "বাহ্, ভারি সুন্দর নাম তো! আরেকটু বলো তোমার নামের তাৎপর্য।"

- "আনাস্তাসিয়ার প্রকৃত অর্থ মাত্র কয়েকটা শব্দ দিয়ে বোঝানো যাবে না। আমার নাম আমার ভাগ্য, হৃদয়ের ইচ্ছা এবং ব্যক্তিত্ব; আনাস্তাসিয়া এমন একটা নাম, যা বোঝায় যে আমি আমার সময়ের চেয়ে এগিয়ে আছি। আমার ব্যক্তিত্বের একটা খারাপ দিক হ'ল জেদ। এই জেদই আমাকে দেশছাড়া করেছে।"

কথার বলার জন্য আনাস্তাসিয়ার হাত কিন্তু থেমে নেই। আমার দেহের একেকটা অংশ মনোযোগ দিয়ে ম্যাসাজ করছে, বাকি দেহ সম্পূর্ণ ঢাকা। গল্প এগোনোর জন্য বললাম, "তোমার দেশ সম্বন্ধে কিছু বলো।"

বেশ উৎসাহ নিয়ে মিষ্টি গলায় বক বক করতে শুরু করল সে। দেশের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে তার গলার স্বর ভারী হয়ে আসছিল। মনে হ'ল দেশের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

- "ম্যাসেডোনিয়া ল্যান্ড-লকড দেশ। এটা বলকান পেনিনসুলা, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত। এর চারধারে পূর্বে বুলগেরিয়া, দক্ষিণে গ্রীস, উত্তরে সার্বিয়া ও কসোভো এবং পশ্চিমে আলবেনিয়া। রাজধানী Skopje, আর দেশের 1.83 মিলিয়ন লোকের এক চতুর্থাংশের বাসস্থান। বাসিন্দাদের বেশিরভাগই জাতিগত ম্যাসেডোনিয়ান। Skopje আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ক্ষতচিহ্ন। এখানে সবচাইতে সুন্দর সূর্যাস্ত হয়। Skopje আমার শৈশব কৈশোরের সঙ্গী। যৌবনে আমি ছেড়ে এসেছি আমার পাড়া, আমার শহর, তাই Skopje-র স্মৃতি আমি বুকে নিয়ে ভেসে বেড়াই এই মহাসমুদ্রে।" আনাস্তাসিয়ার আর্দ্রস্বরে তার গভীর বেদনা ভেসে আসছিল। আর আমি রিভার্স শবাসনে ডোনাটের ফুটো দিয়ে ম্যাসাজ রুমের মাটিতে ম্যাসেডোনিয়ার মানচিত্র ফুটে উঠতে দেখছি। ততক্ষণে অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছে আমাদের আলাপ আলোচনা। গল্পের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মাঝে মাঝে 'হুঁ, হ্যাঁ' করা ছাড়া তাকে বাধা দিচ্ছিলাম না। তার হাত আমার সারা পিঠে ম্যাসাজ করছে আর অনর্গল বেরিয়ে আসছে ম্যাসেডোনিয়ার গল্প। এবার গল্পের একটু বিরতি, নির্দেশ এল পৃষ্ঠপ্রদর্শন ছেড়ে শবাসনে উপনীত হতে। চিৎ হয়ে মৃদু আলোয় পিট্ পিট্ করে তাকিয়ে দৃষ্টি ধাতস্থ হলে দেখতে গেলাম ম্যাসেডোনিয়ার আনাস্তাসিয়াকে। বিধি বাম, ভাল করে তাকানোর আগেই দুচোখে টপাটপ দুটো শশার টুকরো চাপিয়ে দিল দক্ষ হাতে। আমি অন্ধের হাতি দেখার মতো ম্যাসেডোনিয়া

দেখতে লাগলাম আনাস্তাসিয়ার ধারাবিবরণীতে | চোখে শশা, সারা মুখে কোনো এক ভেষজ ক্রিমের প্রলেপ ঘষে চলেছে, তার সঙ্গে অল্প অল্প গল্প | তার বাড়ি গাজীবাবা-য়, উত্তর ম্যাসেডোনিয়ার রাজধানীর দশটা পৌরসভার মধ্যে একটাতে | পৌরসভার নামটি এসেছে অটোমান কবি আশেক চেলেবির ডাকনাম থেকে | তুর্কি ভাষায় গাজী মানে 'যুদ্ধে অভিজ্ঞ' আর বাবা মানে 'বাবা'| সুপটু আঙুলগুলো আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মর্দনের সাথে শশাঢাকা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলছিল ম্যাসেডোনিয়ার ইতিহাস |

- "বলকান রোমা প্রধানত উত্তর ম্যাসেডোনিয়া, সার্বিয়া এবং বুলগেরিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের কিছু অংশে অবস্থিত, তবে এই দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় | অনেক সময়, যাযাবর জীবনধারার কারণে রোমানির জনসংখ্যার হিসেব সঠিক নয় | অনেকের পরিচয়পত্র নেই, কারণ তারা বৈষম্য বা নিপীড়নের ভয় পায় | রোমানিরা নিজেদের রোমা বলে, যার অর্থ তাদের ভাষায় 'পুরুষ'| রম ভারতীয় শব্দ, ডোম থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ নিম্ন বর্ণের ব্যক্তি, যিনি গান এবং নাচের মাধ্যমে তাঁর জীবিকা অর্জন করেন | রোমানি ভাষা তাই রোমানিদের নাম থেকে এসেছে | রোমানির শিকড় রয়েছে ভারতে | দশম শতাব্দীতে তারা পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে | চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বুলগেরিয়ার বলকান পর্বতমালায় বৃহৎ রোমানি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয় | কেউ কেউ যাযাবর হিসেবে বসবাস করতে থাকে; অন্যরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে | তারা যেখানেই থাকত না কেন, অ-রোমানিদের কাছে রহস্যময় এবং স্বতন্ত্র ছিল | তাদের সম্পর্কে কৌতূহল শেষ পর্যন্ত ঘৃণা ও বৈষম্যের দিকে নিয়ে যায় | বিংশ শতাব্দীতে নাৎসিদের হাতে অনেক রোমানি নিহত হয়েছিল | আজও তারা বৈষম্যের শিকার |

লোকেরা প্রায়শই ধরে নেয় যে সমস্ত রোমানির চুল, গায়ের রং এবং চোখ কালো | কিন্তু বলকান রোমানিদের মধ্যে হালকা রঙের ত্বক, স্বর্ণকেশী এবং নীল চোখও দেখতে পাওয়া যায় | সম্ভবত তাদের পূর্বপুরুষদের ইউরোপীয়ানদের সাথে সংমিশ্রণ হয়েছিল | ভারতে রয়ে যাওয়া রোমানিদের ছাড়া, বলকান রোমানিদের অনেকেই Skopje-তে বসতি স্থাপন করেছে | তারা প্রায়শই গ্রামে বা কাছাকাছি শহরে বাস করে | যদিও কেউ কেউ এখনও গাড়ি, ট্রাক এবং ট্রেলারের কাফেলা দিয়ে ভ্রমণ করে | অতীতে, রোমানিদের জমির মালিকানার অনুমতি ছিল না, তাই তারা অন্যান্য পেশা গড়ে তুলতে শুরু করে | এর মধ্যে ভাগ্য বলা, ঘোড়ার ব্যবসা, বাজার বিক্রি, বিনোদন, অ্যাক্রোব্যাটিক্স এবং ধাতু ও কাঠের কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল | তারা বিশেষ করে তাদের সঙ্গীত ক্ষমতা এবং নাচের জন্য পরিচিত | অনেকে বিয়ে এবং উৎসবে গান গায় | দুর্ভাগ্যক্রমে তারা ভিক্ষুক এবং চোর হিসাবেও পরিচিত | ছোটখাটো চুরি (সাধারণত শিশুদের দ্বারা), ভিক্ষাবৃত্তি এবং কালোবাজারি ব্যবসা কখনও কখনও পরিবারকে আয়ের যোগান দেয় | এই কুখ্যাতি তাদের প্রতি অনেক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে | অনেক দেশে, তারা চাকরিতে লাইনের শেষে থাকে | কিছু নারী গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে, কিন্তু তাদের খুব কম মজুরি দেওয়া হয় এবং কোনো স্বাস্থ্য সুবিধা দেওয়া হয় না | ন্যায়বিচার, বিশ্বস্ততা এবং নৈতিকতার মতো মূল্যবোধ রোমানি নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত | একজন রোমানির প্রধান আনুগত্য হ'ল তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি, যারা তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | বড় পরিবারের সদস্যরা সাধারণত একসাথে থাকে এবং যারা আলাদা বাড়িতে থাকে তারা প্রায়ই ফোন করে বা একে অপরের সাথে প্রতিদিন দেখা করে | পিতামাতারা কখনও কখনও বিবাহযোগ করে দেয়, এবং অল্পবয়সী দম্পতিরা সাধারণত কিশোর বয়সে বিয়ে করে | প্রায়শই তারা বিয়ের অনুষ্ঠান করার চেয়ে পালিয়ে যেতে পছন্দ করে | তাদের জীবনধারার স্বতন্ত্রতা তাদের অ-রোমানি থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে | অনেক রোমানি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাস বজায় রেখেছে | তারা বিশ্বাস করে ভূত, টিকটিকি এবং সাপ মানুষের ক্ষতি করতে সক্ষম | তাদের বিশ্বাস পুরুষদের 'দুষ্ট চোখ' দিয়ে অন্যদের অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে | তারা এও বিশ্বাস করে যে কিছু পুরুষের অসুস্থতা নিরাময় করার ক্ষমতাও রয়েছে |

রোমানিদের নিয়ে এত গল্প করছি কারণ আমার পূর্বপুরুষ রোমানি ছিল | সেইজন্যই বোধহয় আমি জলে, দেশদেশান্তরে ভেসে বেড়াই | কোথাও স্থায়ী ঘর বাঁধতে পারিনি |"

এবার একটু কথা বলার বিরতি, আর তার হাতও থেমে গেছে কিছুক্ষণের জন্য | মনে হয় স্মৃতিচারণে মন ভার হয়েছে আনাস্তাসিয়ার | হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, "আমি তো আমার কথা অনেকই বললাম, তুমি একটু তোমার গল্প বলো

যাতে আমি জানতে পারি আমি কার সাথে এত বকবক করছি।"

- "আমার জীবনে এত বৈচিত্র নেই আনাস্তাসিয়া, তবে আমিও এক অর্থে যাযাবর। বেদুইনরা যেমন জীবিকা আর জীবন ধারণের তাড়নায় একজায়গার সবুজ ঘাস ফুরিয়ে গেলে অন্য সবুজ প্রান্তরের খোঁজে চলে যায়, আমরাও আধুনিক যুগে অর্থনীতির দাস হয়ে যেখানে চাকরি সেখানে ছুটে যাই। আমাদেরও স্থায়ী বাড়ির কোন সংজ্ঞা নেই। দেশে দেশে ছড়িয়ে আছে আমার বাড়ি। আমি বাড়ি থেকে বাড়িতে যাই যখন আমেরিকা থেকে ক্যানাডা বা ভারতে যাই। তবে তোমার যেমন আদিবাড়ি গাজীবাবা, আমার বাড়ি কলকাতা।"

ভাবছিলাম কলকাতা সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেব। কিন্তু কলকাতার নাম শুনেই আনাস্তাসিয়া অদ্ভুতভাবে থমকে গেল। চকিতে আমার দুচোখের শশা সরিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল যেন আমি মঙ্গলগ্রহের জীব, বলল, "তুমি কলকাতার লোক? কলকাতা আমার প্রাণের শহর, যদিও যাইনি কখনো, কিন্তু পড়াশোনা করেছি কলকাতা নিয়ে।"

- "এত জায়গা থাকতে কলকাতা নিয়ে তোমার উৎসাহ কেন?"

- "কলকাতা, কলকাতা হ'ল মাদার টেরেসার শহর। এই বলে ভক্তিভরে তিনবার ক্রস করল অঙ্গুলি মুদ্রায়। মাদার টেরেসা আমার জীবনের সবথেকে বড় অনুপ্রেরণা; আর আমি কোনো একদিন তাঁর চলা পথে চলব নিশ্চয়ই। তাই পড়াশুনা করেছি মাদারকে নিয়ে। মাদার টেরেসা ২৬শে অগাস্ট, ১৯১০ সালে অটোমান সাম্রাজ্যের (বর্তমানে Skopje, উত্তর ম্যাসেডোনিয়া) উস্কুপে অ্যাগনেস গনশা বোজাক্সিউতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল আলবেনিয়ান বংশোদ্ভূত। বারো বছর বয়সে, তিনি দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের ডাক অনুভব করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁকে খ্রীষ্টের প্রেম ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একজন ধর্মপ্রচারক হতে হবে। আঠারো বছর বয়সে তিনি Skopje-তে তাঁর পিতামাতার বাড়ি ছেড়ে যান এবং ভারতে মিশনসহ আইরিশ নান সম্প্রদায়ের সিস্টারস অফ লরেটোতে যোগদান করেন। ডাবলিনে কয়েক মাসের প্রশিক্ষণের পর তাঁকে ভারতে পাঠানো হয়, যেখানে ২৪শে মে, ১৯৩১-এ, তিনি সন্ন্যাসিনী হিসেবে তাঁর প্রাথমিক শপথ নেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মাদার টেরেসা কলকাতার সেন্ট মেরি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন, কিন্তু কনভেন্টের দেওয়ালের বাইরে তিনি যে দুর্ভোগ ও দারিদ্র্য দেখেছিলেন তা তাঁর মনে এমন গভীর ছাপ ফেলেছিল যে ১৯৪৮ সালে তিনি তাঁর উর্ধ্বতনদের কাছ থেকে কনভেন্ট স্কুল ছেড়ে যাওয়ার এবং ভক্তি ও সেবামূলক কাজ করার অনুমতি পান কলকাতার বস্তিতে দরিদ্রদের সঙ্গে কাজ করার জন্য। যদিও তাঁর কোনও তহবিল ছিল না, তবুও তিনি ডিভাইন প্রোভিডেন্সের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং বস্তির শিশুদের জন্য একটি খোলা আকাশের স্কুল শুরু করেছিলেন। শীঘ্রই তাঁর সাথে স্বেচ্ছাসেবী সাহায্যকারীরা যোগ দেয় এবং আর্থিক সহায়তাও আসতে থাকে, যার জন্য তাঁর কাজের পরিধি প্রসারিত করা সম্ভব হয়েছিল। ৭ই অক্টোবর, ১৯৫০-এ, মাদার টেরেসা হোলি সি থেকে 'দ্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' শুরু করার অনুমতি পেয়েছিলেন, যার প্রাথমিক কাজ ছিল সেই ব্যক্তিদের ভালবাসা এবং যত্ন করা যাদের কেউ দেখাশোনা করতে প্রস্তুত ছিল না।"

এরপর স্বগতোক্তির মতো বলতে শুরু করল মাদারকে নিয়ে, "রক্তে আমি আলবেনিয়ান। নাগরিকত্বে ভারতীয়। বিশ্বাসে, আমি একজন ক্যাথলিক নান। আমি বিশ্বের এক সেবক। আমার হৃদয়ের হিসাবে আমি সম্পূর্ণরূপে যীশুর হৃদয়ের বাসিন্দা।"

আমার মনে তখন বেশ অপরাধবোধ হচ্ছিল। কলকাতায় আমার বাড়ির পাশেই ছিল প্রেমদান, মাদার টেরেসার দাতব্য প্রয়াসের বাড়ি, অবহেলিতদের চিকিৎসা সুবিধার জন্য মাদার টেরেসার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির উদ্যোগ। মাদারের কর্মক্ষেত্র পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল, অথচ আমি মাদারের জীবন নিয়ে এতটা ওয়াকিবহাল নই। তবুও মাদারই যেন ভূমধ্যসাগরে কলকাতা আর Skopje-র সেতুবন্ধন করে দিলেন।

দেখতে দেখতে দু'ঘন্টা পেরোনোর ঘন্টা বেজে গেল। একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম 'হেভেন অন দ্য সি' পার্লার থেকে।

ডেকে বসে ভাবতে লাগলাম সত্যি কী বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা দিয়ে যায় এই জীবন। তাই জীবন থাকতে জীবনকে নিয়ে অভিযোগ না করে জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করি ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করে।

নারী ও লিপস্টিক

রিমি পতি

আজকের নারী বাড়ি থেকে বেরুনোর আগে হাতে তুলে নেন একটি ছোট্ট ধাতব টিউব। টিউবের মধ্যে থাকা রঙিন অংশটি বৃত্তাকারে ঘুরে উপরে উঠে এলে সেটাকে নিজের ঠোঁটে বুলিয়ে রাঙিয়ে নেওয়ার মধ্যে আছে এক অদ্ভুত তৃপ্তি।

নিজের ঠোঁটকে আকর্ষণীয় করার ইচ্ছেটা সুপ্রাচীন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সর্বপ্রথম সুমেরীয় এক রানী হাতে তুলে নিয়েছিলেন সেই ওষ্ঠরঞ্জনী, সেটার আকার বা প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতি ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য ছিল একই। প্রাচীন মিশরেও লালমাটি ও আয়রন অক্সাইড মুখে লেপন করার প্রথা ছিল। এতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াও ত্বকের সুরক্ষা হতো সেখানের প্রখর সূর্যরশ্মি থেকে। কথিত আছে রানী ক্লিওপেট্রা, যিনি রূপচর্চার সব রহস্য জানতেন, তিনিও তাঁর বিখ্যাত নীল সুরমার রুপটানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঠোঁটজোড়া রাঙিয়ে নিতেন গাঢ় লাল রঞ্জক দিয়ে। সেই লাল রঙ তৈরি করা হতো লালমাটি, কারমাইন বিটলস ও পিঁপড়ে পিষে মাছের আঁশ ও মোম জাতীয় দ্রবণ মিশিয়ে।

প্রাচীন গ্রীস এবং ইতালিতেও ওষ্ঠরঞ্জনীর জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল। সেই সময় গ্রীসে পৃথিবীর আদিতম পেশায় কর্মরতা রমনীদের ওষ্ঠরঞ্জনীর ব্যবহার ছিল বাধ্যতামূলক, যাতে প্রকাশ্যেও তাঁরা আলাদাভাবে চিহ্নিত হন। সেই রঞ্জক তৈরির উপাদান হিসেবে ভেড়ার ঘাম থেকে কুমিরের বিষ্ঠা সবই ব্যবহার করা হয়েছে। সভ্যতার আদিকালে প্রসাধনীর ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গ ভেদাভেদ ছিল না।

মধ্যযুগে রানী এলিজাবেথই প্রথম শুরু করলেন ফ্যাকাসে, অতি সাদা মুখমন্ডলে রক্তিম ঠোঁটবিশিষ্ট সিগনেচার ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। শোনা যায় অন্তিম শয্যায়ও তাঁর মুখে আধইঞ্চি পুরু রঙের প্রলেপ ছিল। সীসাযুক্ত সেই রূপটান ছিল শরীরের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকারক এবং রানীর মৃত্যুর কারণ। সাধারণ মানুষ সেই রূপচর্চা থেকে বঞ্চিত থাকায় কিছুটা হলেও উপকৃত হয়েছিল। সেই একই দেশে ১৮'শ শতাব্দীতে দেখা গেল মুখে রঙ লাগানো অতি নিন্দনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। ওই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী তখন পূর্ণ মানুষ হিসেবে নয়, শিশুসুলভ মানসিকতা ও স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য আদৃতা। ভদ্র নারীর মুখে রঙ লাগিয়ে লাস্যময়ী হয়ে ওঠার বেয়াদপি আদৌ বরদাস্ত করা হতো না। সে সময় উত্তর আমেরিকায় ওষ্ঠরঞ্জনী ও ডাইনী অভিযোগ একাকার হয়ে সাধারণ মানুষের মনে একটি বিতৃষ্ণার ভাব এনে দেয়। ১৮৭০ সালে ফরাসী চিত্রকর এডওয়ার্ড মানের আঁকা প্রসাধনরতা রমণীর ছবি দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এর কারণ শুধুমাত্র অন্তর্বাস পরিহিত নারী নয়, সেই নারী প্রকাশ্যে হাতে নিয়েছেন ওষ্ঠরঞ্জনী।

১৮৮০ দশকে অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ডট প্রকাশ্যে বাইরে এলেন মুখে রুজ ও ঠোঁটে লাল রঙ লাগিয়ে। তা দেখামাত্র, সেকালের রক্ষণশীল সমাজে একটা ছিঃ ছিঃ রব উঠে।

সময়ের চাকা ঘুরতে থাকে; নারী হৃদয়ে গোপনে সেই লাল রঙের পূজা চলতেই থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঠোঁট রাঙানোর রঙ পাওয়া যেত ছোট গোল ডিবেয় ভরে বা পাতলা মোম কাগজে মুড়ে। ১৮৪০ সালে ফরাসী প্রসাধন কম্পানি 'গুয়েরলিন' বিশ্বের সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ওষ্ঠরঞ্জক বাজারে নিয়ে এল। হরিণের চর্বি, মোম, ক্যাস্টর অয়েলযুক্ত এই রঞ্জকের নাম ছিল 'লিকুইড ব্লুম অফ রোজ'। হাউস অব গুয়েরলিন তখন ফ্রান্সের সর্বপ্রসিদ্ধ প্রসাধন নির্মাতা। 'নে মব্লিয়েজ পাস' (ফরগেট মি নট) প্রথম আধুনিক লিপ-কালার। মনের মানুষকে বিমোহিত করতে ওষ্ঠরঞ্জনীর আকর্ষণ ক্ষমতা তখন স্বীকৃতি পেয়েছে জন-মানসে।

ভারতীয় নারী তখনও অন্তরালবর্তিনী; আলতা, সিঁদুর, বড়জোর হিমানী স্নো মাখা পর্যন্ত তাদের দৌড়। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতায় কেটি মিটারের 'এনামেল করা মুখের' উল্লেখ থাকলেও শরৎ সাহিত্যের সাধারণ মেয়েরা তখনও রূপটানের কৃত্রিম প্রলেপে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় শুধু মাত্র যৌন আবেদন নয়, লিপস্টিক হয়ে উঠল এক ধরনের বিদ্রোহের প্রতীক। তখনকার ফ্ল্যাপার গার্ল লুকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কান অবধি বব করা চুল, গোড়ালি ও পায়ের গোছ উন্মুক্ত ড্রেস এবং তার সঙ্গে অতি আবশ্যক প্রসাধনী ছিল রক্তিম বর্ণ লিপস্টিক রঞ্জিত ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। তৎকালীন এই উগ্র আধুনিকার অন্যতমা হলেন স্কট ফিটসজেরাল্ডের নায়িকা ডেজি বিউক্যানন। সেই উপন্যাসে আদিম লাল রঙ একই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসঘাতকতার

প্রতীক | নারীরা প্রকাশ্যে ব্যবহার করতে লাগলেন মরিস লেভি আবিষ্কৃত ধাতব টিউবে বন্দী আজকের সুপরিচিত লিপস্টিক | বয়ঃসন্ধির মেয়েরা তখনও লিপস্টিক ব্যবহারের অনুমতি পেত না | লিপস্টিক ছিল প্রাপ্তবয়স্ক নারীত্বের একটি বিশেষ অধিকার | বিলেতে সাফ্রোজেট রমণীরা মেয়েদের ভোটের অধিকারের জন্য তীব্র আন্দোলন করছিলেন | এলিজাবেথ স্ট্যান্টন বা শার্লট গিলম্যনের মতো নেত্রীরা প্রকাশ্যে তীব্র লাল লিপস্টিক লাগাতেন; যার ফলে পুরুষরা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতেন |

হলিউডে রূপালী পর্দার নায়িকা মেরিলিন মনরো লিপস্টিক রঞ্জিত ঠোঁটে চুম্বনের ভঙ্গিতে একটার পর একটা সুপার হিট ছবির পোস্টারে দেখা দিয়েছেন | হাওয়ায় বেসামাল ফ্রকের সেই আইকনিক পোস্টার কিন্তু ঠোঁটের লাল লিপস্টিক ছাড়া ভাবাই যায় না |

ওদিকে ষাটের দশকের শুরুতে মহানগর ছবির এক অবিস্মরণীয় পোস্টারে এই লিপস্টিক আবার দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের ঠোঁটে | অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এডিথ সিঁদুরের টিপপরা আরতিকে ঠোঁট রাঙিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং আরতিও ব্যাগে লিপস্টিক রাখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন | শুধুমাত্র একটা লিপস্টিককে কী আশ্চর্য নিপুণ হাতে প্রপ হিসেবে ব্যবহার করে সত্যজিৎ রায় কর্মরতা নারী ও গৃহবধূর মনের সংঘাতকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন পর্দায়!

মার্কিন দেশীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অ্যালেকজ্যান্ড্রিয়া কোর্টেজ যখন টুইট করে জানান, তাঁর প্রিয় লিপ কালারের নাম, তখন কয়েক মুহূর্তে সেই বিশেষ ব্র্যান্ডের লিপস্টিক ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় | এতে নেত্রীর নারীবাদী ভাবমূর্তি টাল খায় না | এই প্রসাধনীর ব্যবহারে পুরুষকে আকৃষ্ট করার কাঙালপনা নেই; শুধু আছে নিজেকে মেলে ধরে বক্তব্যকে জোরদার করার অকুণ্ঠ প্রয়াস |

পরিসমাপ্তিতে বলা যায়, একটি লাল ওষ্ঠরঞ্জককে শুধুমাত্র প্রসাধনী ভেবে হেয় করলে এর সুদীর্ঘ ইতিহাস এবং জনমানসে এর প্রভাবকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবা হবে | বাজারে যখন মন্দা দেখা দেয়, ক্রেতারা অন্যান্য বড় মাপের বিলাসদ্রব্য না কিনলেও এই একটি জিনিসে খরচ করে থাকেন | লাক্সারী ব্র্যান্ডের লিপস্টিক তখনও বিপুল পরিমাণে বিক্রি হয় কারণ ক্রেতারা এইটুকু বিলাসিতা নিজের জন্য রেখে নেন | এই বিলাসিতায় ক্রেতাকে অপরাধ বোধে ভুগতে হয় না | অর্থনীতির পরিভাষায় এর নাম 'লিপস্টিক এফেক্ট' | এই লিপস্টিক শুধুমাত্র প্রসাধনী নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারীর নিজস্ব স্বাধীনতার লড়াই | পুরুষশাসিত সমাজ চিরকাল তর্জনী তুলেছে স্বাধীনচেতা নারীর দিকে | নারী শরীরে কোন পোষাক বা প্রসাধনের আব্রু থাকে বা বিনষ্ট হয় তা স্থির করেন পুরুষ | আজও সেই লড়াই যে একই রকম প্রাসঙ্গিক তা ইরানের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাবলীর দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায় | নর্থ কোরিয়াতে চুলের বিভিন্ন রং-চং, মেয়েদের লাল লিপস্টিকের দিকে রক্তচক্ষু দেখায় রাষ্ট্রশক্তি কারণ এগুলো "অফিসিয়াল কালচারের" বিরুদ্ধাচরণ |

আজকাল 'টিকটক' জাতীয় গণমাধ্যমের একটি জনপ্রিয় বিষয় হ'ল নানা ধরনের রূপটান ব্যবহারের ভিডিও | এখানে জানা যায়, বিভিন্ন রঙের লিপস্টিক সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আই শ্যাডো, ব্লাশ সবই লাগানো যাবে এই একটি মাত্র উপকরণ দিয়ে | আধুনিক লিপস্টিক ঠোঁটের আর্দ্রতা বজায় রাখে, সূর্যের রশ্মি থেকে সুরক্ষা দেয়, এবং সবচাইতে জরুরি এর ব্যবহারে নারী নিজেকে সচেতন, সুসজ্জিত ও দুনিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত মনে করেন |

বিংশ শতাব্দীতে নারী স্বয়ং-সম্পূর্ণা | সে নিজের সম্মোহনী শক্তি বা সামাজিক অবস্থান বোঝাতে যে কোনও বস্তু ব্যবহার করতে পারে নিজের ইচ্ছায় | তার মধ্যে লিপস্টিক নিয়ে নিয়েছে নারীর প্রিয় বন্ধুর স্থান |

লাল সর্দারের মুক্তিপণ

নূপুর রায়চৌধুরী

ব্যাপারটা তো বেশ ভাল বলেই মনে হয়েছিল প্রথমে; কিন্তু... দাঁড়ান দাঁড়ান, ঘটনাটা আগে বলি তো আপনাকে। আমরা মানে বিল ড্রিসকোল এবং আমি যখন এই অপহরণের ছকটার কথা ভেবেছিলাম তখন আমরা ছিলাম দক্ষিণে, অ্যালাবামাতে। বলতে পারেন সেটা ছিল "এক মুহূর্তের ক্ষণিক উন্মাদনার সময়" যেমনটা বিল পরে স্বীকার করেছিল। কিন্তু সেটা আমরা বুঝতে পারি অনেক পরে। তা, সেখানে ছিল একটা শহর, তাকে বলা হতো সামিট – আগাপাছতলা সমতল, একেবারে প্যানকেকের মতো, একদম ঠিকঠাক নাম। আর সেখানে বাস করত যে কৃষকেরা, তারা ছিল নিরীহ এবং সুখী – যেন একটা মেপোলের চারপাশে জড়ো হওয়া হাসিখুশি মানুষের দল।

বিল এবং আমার কাছে মিলিয়ে প্রায় ছশো ডলার ছিল। পশ্চিম ইলিনয়ের একটি অসাধু ভূমি প্রকল্প থেকে সরে আসার জন্য আমাদের আর মাত্র দু'হাজার ডলারের প্রয়োজন। হোটেলের সামনের ধাপে দাঁড়িয়ে এটা নিয়ে কথা বললাম আমরা। আধা-গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলোতে, সন্তানদের প্রতি তাদের বাবা-মায়ের ভালবাসা খুব জোরদার হয়ে থাকে, আমরা বলাবলি করলাম। তাইজন্য এবং অন্যান্য কারণে অপহরণের কাজটা সেখানেই ভাল জমে, খবরের কাগজের চৌহদ্দির মধ্যে নয়, যেখানে সাদা পোশাকের রিপোর্টারদের পাঠানো হয়, এসব নিয়ে জল ঘোলা করার জন্য। আমরা জানতাম যে কয়েকজন কনস্টেবল, হয়তো গোটাকয়েক আলসে ব্লাডহাউন্ড, আর সাপ্তাহিক 'ফার্মার্স বাজেটে' বড়জোর দু'একটা রাগী রাগী লাইনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কিছু নিয়ে সামিট আমাদের পিছনে লাগতে আসবে না। ও ঠিক আছে।

আমরা আমাদের শিকার হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম ইবেনেজার ডরসেট নামের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের একমাত্র সন্তানকে। বাবা সম্মানীয় এবং টাকাপয়সার ব্যাপারে আঁটসাঁট। তিনি ছিলেন একজন বন্ধক ক্রেতা; কঠোর, একনিষ্ঠ তহবিল-সংগ্রাহক এবং একজন ফোরক্লোজার। বাচ্চাটা ছিল দশ বছর বয়সী মেচেতা দাগওয়ালা মুখের একটা ছেলে, যার মুখের ওই দাগগুলোই সবচেয়ে আগে নজরে আসে। আর তার চুলের রং – ট্রেন ধরতে গিয়ে নিউজ স্ট্যান্ড থেকে আপনি যখন ম্যাগাজিন কেনেন তার মলাটের রঙের মতোই।

বিল এবং আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, এবেনেজারকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, দু'হাজার ডলার মুক্তিপণের শেষ সেন্ট পর্যন্ত আমরা তার কাছ থেকে আদায় করতে পারব। তবে আমি আপনাকে পুরোটা না বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

সামিট থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে ঘন সিডারে আচ্ছাদিত একটা ছোট পাহাড় ছিল। পাহাড়ের পিছনে চূড়ার কাছে ছিল একটা গুহা। সেখানে আমরা সব রসদ জমিয়ে রাখলাম। সূর্যাস্তের পর এক সন্ধ্যায় আমরা একটা বগিতে করে বুড়ো ডরসেটের বাড়ির পাশ দিয়ে চালিয়ে গেলাম। ছেলেটা রাস্তায় ছিল। সে বেড়ার উপরে বসে থাকা একটা বিড়ালছানার দিকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল।

- "এই যে খোকা," বিল বলে, "তুমি কি এক ব্যাগ লজেন্স এবং একটা চমৎকার বেড়াতে যাওয়া চাও?"

ছেলেটা একটা ইঁটের টুকরো দিয়ে ধাঁ করে সোজা বিলের চোখে মেরে দিল।

- "এইজন্য বুড়োকে আরও পাঁচ'শ ডলার বাড়তি খসাতে হবে।" গাড়ির চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে বিল বলে।

ছেলেটা বক্সিং রিঙের ভালুকের মতো লড়াই করেছিল। অবশেষে আমরা তাকে কব্জা করে বগির ভিতরে এনে পিঠটান দিলাম। আমরা তাকে গুহায় নিয়ে গেলাম। তারপর আমি ঘোড়াটাকে সিডার গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরে আমি বগিটা তিন মাইল দূরের ছোট্ট গ্রামটাতে নিয়ে যাই, যেখান থেকে আমরা সেটা ভাড়া করেছিলাম। এরপর হেঁটে হেঁটে পাহাড়ে ফিরে গেলাম।

বিল তার মুখের আঁচড় আর ক্ষতগুলোর উপর ব্যান্ডেজ লাগাচ্ছিল। গুহার প্রবেশ পথের বড় পাথরটার পিছনে একটা আগুন জ্বলছিল। ছেলেটা ফুটন্ত কফির পাত্রটা লক্ষ্য করছিল। তার লাল চুলে গোঁজা ছিল দুটো বাজ পাখির লেজের পালক। আমি যখন উঠে আসি, তখন সে আমার দিকে একটা লাঠি দেখিয়ে বলে, "হা অভিশপ্ত সাদা মানুষ! তুমি কি সমতলের সন্ত্রাস লাল সর্দারের শিবিরে ঢোকার সাহস করো?"

- "এখন ও ঠিকঠাকই আছে।" বিল বলে। সে প্যান্টটা গুটিয়ে তার পায়ের আঘাতগুলো দেখতে থাকল। "আমরা নেটিভ

ইন্ডিয়ান খেলা খেলছি | বাফেলো বিলের অনুষ্ঠানকে শহরের মিটিং-এর মতোই উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলছি আমরা | আমি হচ্ছি লাল সর্দারের বন্দী, বুড়ো হ্যাঙ্ক ফাঁদারু | সকাল হলেই আমার মাথার তালু চেঁছে নেওয়া হবে | জেরোনিমোর দিব্যি, এই ছেলেটা কিছু শক্ত লাথি মারতে পারে বটে!"

হ্যাঁ মহাশয়, ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে সে জীবনের সবচেয়ে মজা পাচ্ছে | একটা গুহার মধ্যে ক্যাম্পিং করার মজায় সে ভুলেই গিয়েছিল আসলে সে নিজেই একজন বন্দী | সে আমার নাম দিয়েছে সাপচোখো, গুপ্তচর | সে আমাকে বলল, যে তার দলের বীররা যুদ্ধপথ থেকে ফিরে আসার পর, আমাকে ভোরবেলা লাঠিতে বেঁধে ঝলসানো হবে | এরপর আমরা রাতের খাবার খেতে বসলাম | সে তার মুখভর্তি করে লবণে জারিত শুকনো শূকরমাংস, রুটি আর ঝোল নিল | আর সেই সঙ্গে কথাও বলতে লাগল | তা, সেসময় সে যে বক্তৃতা দিল, তা অনেকটা এরকম ছিল – "এটা আমার পছন্দ হয়েছে | আমি আগে কখনো ক্যাম্পিং করিনি | একসময় আমার একটা পোষা অপসাম ছিল, এবং শেষ জন্মদিনে আমার বয়স ছিল নয় | আমার স্কুলে যেতে জঘন্য লাগে | জিমি ট্যালবটের মাসির ছিটছিট দাগওয়ালা মুরগির ডিমের ষোলখানা ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে | এই জঙ্গলে কি সত্যিকারের রেড ইন্ডিয়ান আছে? আমার আরেকটু ঝোল চাই | গাছ নড়ে বলে কি বাতাস বয়? আমাদের পাঁচটা কুকুরছানা ছিল | তোমার নাক এত লাল হ'ল কী করে হ্যাঙ্ক? আমার বাবার অনেক টাকা আছে | তারারা কি খুব গরম হয়? আমি শনিবার এড ওয়াকারকে দুবার বেত মেরেছি | আমি মেয়েদের পছন্দ করি না | যদি তুমি সুতো ব্যবহার না করতে পারো, তাহলে ব্যাঙ না ধরাই ভাল | ষাঁড়রা কি কোনো শব্দ করে? কমলালেবু গোল হয় কেন? এই গুহায় ঘুমানোর জন্য কি বিছানা আছে? আমোস মারের ছটা আঙুল | তোতাপাখি কথা বলতে পারে, কিন্তু বানর বা মাছ পারে না | বারো কততে হয়?"

কয়েক মিনিট বাদে বাদেই তার মনে পড়ে যায় যে সে একজন নাছোড়বান্দা রেড ইন্ডিয়ান | তখনই সে তার লাঠি-রাইফেল হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে গুহার মুখটাতে চলে যায় | সেখানে সে ঘৃণ্য সাদা চামড়ার যোদ্ধাদের খুঁজে বেড়ায় | থেকে থেকেই সে এমন যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়ে যে বুড়ো হ্যাঙ্ক ফাঁদারু কেঁপে কেঁপে ওঠে | শুরু থেকেই সেই ছেলে বিলকে একেবারে আতঙ্কিত করে তুলেছে |

- "লাল সর্দার," আমি তাকে বলি, "তুমি কি বাড়ি যেতে চাও?"

- "ওহ, কীসের জন্য?" সে বলে, "বাড়িতে কোনো মজা নেই | আমার স্কুলে যেতে বিচ্ছিরি লাগে | বাইরে ক্যাম্পিং করতে আমার ভাল লাগে, তুমি আমাকে আর বাসায় নিয়ে যাবে না তো, সাপচোখো, নেবে না তো?"

- "এখনই নয়," আমি বলি, "আমরা এই গুহায় আরো কিছু সময় থাকব |"

- "ঠিক আছে! সেটাই ভাল হবে | আমি আমার সারা জীবনে এমন মজা পাইনি |"

প্রায় এগারোটার সময় আমরা ঘুমাতে গেলাম | আমরা কিছু চওড়া কম্বল এবং লেপ বিছিয়ে দিলাম, আর আমাদের দুজনের মধ্যে লাল সর্দারকে রাখলাম | আমাদের মোটেও ভয় হয়নি যে সে পালিয়ে যাবে | সে আমাদের তিন ঘন্টা জাগিয়ে রাখল | মাঝে মাঝেই সে লাফ দিয়ে ওঠে আর তার রাইফেল নিতে চলে যায় |

- "ওই শোনো!" সে আমার আর বিলের কানের কাছে চিল চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে | যখনই কোনো ডালপালার মটমট বা পাতার মচমচ শব্দ হচ্ছিল, সে কল্পনা করছিল যে দুষ্টু লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে আসছে, আর তখনই সে ওরকম করছিল | অবশেষে আমি ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে তলিয়ে গেলাম | আমি স্বপ্নে দেখলাম যে লাল চুলের একটি হিংস্র জলদস্যু আমাকে অপহরণ করেছে এবং একটা গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে |

ভোরের দিকে, বিলের পর পর কতকগুলো ভয়ঙ্কর চিৎকারে আমি জেগে উঠলাম | এগুলো ঠিক চিৎকার, আর্তনাদ বা গর্জন ছিল না, যেরকমটা আপনি একজন পুরুষ মানুষের কাছ থেকে আশা করেন | সেগুলো যেন মেয়েদের উচ্চৈঃস্বরে কাকুতির মতো ছিল, ভূত বা শুঁয়োপোকা দেখলে যেমনটা করে তারা | সক্কাল সক্কাল গুহার মধ্যে একজন শক্তিশালী, মরিয়া, মোটা লোকের লাগামছাড়া ঐরকম চিৎকার শুনতে পাওয়া একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার | আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম কী হ'ল দেখার জন্য | দেখলাম লাল সর্দার বিলের বুকের উপর বসে আছে, তার এক হাতে বিলের চুল মুঠি করে ধরা | অন্যটায় একটা ধারালো ছুরি যা আমরা শুয়োরের শুকনো মাংস কাটার জন্য

ব্যবহার করছিলাম | খুব অধ্যবসায় এবং রীতিমতো বাস্তবতার সঙ্গে সে বিলের মাথার চামড়া ছাড়াবার চেষ্টায় ছিল; আগের দিন সন্ধ্যায় বিলকে সেই সাজা দেওয়া হয়েছিল | আমি ছেলেটার কাছ থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আবার শুইয়ে দিলাম | কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকেই বিলের মন পুরো ভেঙে গিয়েছিল | সে বিছানায় তার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু ছেলেটা যতক্ষণ আমাদের সাথে ছিল ততক্ষণ সে আর ঘুমানোর জন্য চোখ বন্ধ করল না | আমি আরও কিছুক্ষণ ঝিমোলাম | কিন্তু সূর্য ওঠার কাছটিতেই আমার মনে পড়ে গেল যে, লাল সর্দার বলেছিল, আমাকে ভোরবেলা বাঁশে বেঁধে পোড়ানো হবে | আমি দুর্বল হইনি বা ভয় পাইনি | কিন্তু উঠে বসলাম এবং আমার পাইপ জ্বালিয়ে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিলাম |

- "তুমি এত তাড়াতাড়ি কীসের জন্য উঠে পড়েছ, স্যাম?" বিল জিজ্ঞেস করল |

- "আমি? ওহ, আমার কাঁধে একটা ব্যথা হচ্ছে | ভাবলাম উঠে বসলে ঠিক হয়ে যাবে |"

- "তুমি একটা মিথ্যাবাদী! তুমি ভয় পেয়েছ | সূর্যোদয় হতেই তোমাকে পুড়িয়ে ফেলা হবে, এবং তুমি ভয় পেয়েছ যে সে তা করবে | সে তা করবেও, যদি কোনোমতে একটা দেশলাই কাঠি খুঁজে পেয়ে যায় | এটা কী ভয়ঙ্কর তাই না, স্যাম? তুমি কি মনে করো যে এই রকম একটা বিচ্ছুকে বাড়িতে ফিরে পেতে কেউ টাকা দেবে?"

- "অবশ্যই, এরকম একটা উচ্ছৃঙ্খল বাচ্চাই তো বাবা-মায়ের পছন্দের | এখন তুমি আর সর্দার উঠে পড়ো দিকিনি আর জলখাবারটা বানাও | আমি এই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে চারপাশটা নজর করব |"

আমি ছোট্ট পাহাড়টার চূড়ায় উঠলাম এবং এলাকাটার উপর দ্রুত চোখ বোলালাম | সামিটের দিকে গ্রামের লোক দেখতে পাবার আশা করছিলাম, ভেবেছিলাম তারা হয়তো এতক্ষণে কাস্তে এবং কাঁটাচামচ বাগিয়ে, অপহরণকারীদের জন্য গ্রামাঞ্চল চষে ফেলছে | কিন্তু যা দেখলাম তা হ'ল একটি শান্তিপূর্ণ ভূভাগের দৃশ্য – একজন লোক একটা খচ্চর দিয়ে চাষ করছে | খাঁড়িতে কেউ কোনো খোঁজাখুঁজি করছে না | কোন খবর যে নেই, উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের সে কথা জানানোর জন্য কোন বার্তাবাহক আগুপিছু ছোটাছুটিও করছে না | বরঞ্চ, অ্যালাবামার সেই গোটা অংশ জুড়ে একটা শ্লথতা আমার চোখের সামনে ধরা পড়ল |

আমি মনে মনে বলি, 'সম্ভবত তারা এখনও জানতে পারেনি যে নেকড়েরা ভেড়ার পাল থেকে ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে গেছে | হে ভগবান! নেকড়েদের সাহায্য করো!' তারপর জলখাবার খাওয়ার জন্য পাহাড় থেকে নিচে নেমে এলাম |

আমি যখন গুহায় এসে পৌঁছালাম, তখন দেখতে পেলাম বিল পিছু হটে গুহার এক পাশে সেঁটে আছে, ভারী ভারী শ্বাস নিচ্ছে | ছেলেটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, অর্ধেক নারকেলের মতো বড় একটা পাথর দিয়ে যেন সে বিলকে থেঁতলে দিতে প্রস্তুত |

- "ও আমার পিঠে আগুন-গরম একটা সেদ্ধ আলু চেপে ধরেছিল |" বিল ব্যাখ্যা করে, "তারপর ও সেটাকে পা দিয়ে চটকে দেয় | আমি ওর কানে একটা থাপ্পড় মেরেছি | তোমার কাছে বন্দুক আছে, স্যাম?"

আমি ছেলেটার কাছ থেকে পাথরটা সরিয়ে নিলাম এবং তর্কাতর্কিটা মোটামুটি থামালাম |

- "আমি তোমাকে শায়েস্তা করব" ছেলেটা বিলকে বলে, "এখনও পর্যন্ত কোন লোক লাল সর্দারকে আঘাত করে পার পায়নি | সাবধান!"

জলখাবারের পর ছেলেটা তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করল | এক টুকরো চামড়া যার চারপাশ সুতো দিয়ে মোড়ানো | সেটা খুলবার জন্য সে গুহার বাইরে গেল |

- "এখন কী মতলব ভাঁজছে ও? পালিয়ে যাবে না তো? তোমার কী মনে হয়, স্যাম?" বিল উদ্বিগ্ন হয়ে বলে |

- "সে নিয়ে কোন ভয় নেই | বাড়িতে খুব একটা বসে থাকার পাত্র বলে ওকে মনে হয় না | কিন্তু, মুক্তিপণের ব্যাপারে আমাদের একটা পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে | ও অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে সামিটের চারপাশে খুব বেশি উত্তেজনা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না | হয়তো ওরা এখনও বুঝতে পারেনি যে, ছেলেটা চলে গেছে | ওর লোকজনরা হয়তো মনে করছে ও আন্টি জেন বা প্রতিবেশীদের কারুর সাথে রাত কাটাচ্ছে | যাই হোক, আজ ওর খোঁজ পড়বে | আজ রাতে অবশ্যই আমরা ওর বাবার কাছে একটা বার্তা পাঠাব, যাতে ওকে ফেরত দেওয়ার জন্য দু'হাজার ডলার দাবি করা হবে |"

ঠিক তখনই আমরা এক ধরনের যুদ্ধের হুঙ্কার শুনতে পেলাম। চ্যাম্পিয়ন গোলিয়াথকে ধরাশায়ী করার সময় ডেভিড হয়তো এরকমই একটা চিৎকার করেছিল। লাল সর্দার তার পকেট থেকে একটা গুলতি বের করেছে। এখন সেটা সে তার মাথার চারপাশে সাঁইসাঁই করে ঘোরাচ্ছে। আমি পাশ কাটানোর জন্য গোঁত্তা মারলাম এবং দাম করে একটা প্রচণ্ড শব্দ! আর বিলের দিক থেকে এক ধরনের দীর্ঘশ্বাস শুনলাম; একটা ঘোড়া ঠিক এরকম শব্দ করে যখন কেউ তার জিন খুলে দেয়। ডিমের সমান আকারের একটা পাথর এসে বিলের বাম কানের ঠিক পিছনে আঘাত করেছে। বিলের সারা শরীর ছেড়ে দিল। সে থালা-বাসন ধোয়ার জন্য গরম জল তৈরির পাত্র বরাবর আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। আমি সেখান থেকে ওকে টেনে বের করে এনে, আধঘন্টা ধরে ওর মাথায় ঠান্ডা জল ঢালতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর বিল উঠে বসল এবং তার কানের পিছনটা অনুভব করতে লাগল। সে বলল, "স্যাম, তুমি কি জানো বাইবেলের কোন চরিত্রটা আমার প্রিয়?"

- "ব্যাপারটা হালকাভাবে নাও," আমি বললাম, "তুমি শীঘ্রই বুঝতে পারবে।"

- "রাজা হেরড।" সে বলে, "তুমি আমাকে এখানে একা রেখে চলে যাবে না তো, স্যাম?"

আমি বাইরে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে ফেললাম। তার মুখের মেচেতাগুলো অবধি খড়খড়ানো না পর্যন্ত আমি তাকে সমানে ঝাঁকিয়ে গেলাম।

- "তুমি যদি ঠিকমতো না চলো, তোমাকে আমি সোজা বাড়িতে নিয়ে যাব। বলো, এখন তুমি ভাল হয়ে থাকবে কিনা?"

- "আমি তো শুধু মজা করছিলাম। আমি বুড়ো হ্যাঙ্ককে মারতে চাইনি। কিন্তু আমাকে সে কীসের জন্য মেরেছিল? ঠিক আছে সাপচোখো, আমি ভাল হয়ে থাকতে পারি, যদি তুমি আমাকে বাড়িতে ফেরত না পাঠাও আর যদি তুমি আজ আমাকে ব্ল্যাক-স্কাউট খেলতে দাও।" সে গোমড়া মুখ করে বলে।

- "আমি ওই খেলা জানি না" ওটা তুমি আর মিস্টার বিল মিলে ঠিক কোরো। আজকের মতো সে তোমার খেলার সাথী। আমি একটা কাজের জন্য কিছু সময়ের জন্য দূরে যাচ্ছি। এখন তুমি ভিতরে এসে তার সাথে বন্ধুত্ব করো। বলো, তাকে আঘাত করার জন্য তুমি দুঃখিত। তা না বললে, তুমি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাবে।"

আমি তাকে আর বিলকে করমর্দন করালাম। তারপর বিলকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললাম যে আমি পপলার কোভে যাচ্ছি। পপলার কোভ আমাদের গুহা থেকে তিন মাইল দূরের একটা ছোট্ট গ্রাম। এই অপহরণ সম্পর্কে সামিট কী বলছে তা আমি জানতে চাইছিলাম। তাছাড়া, সেদিনই বুড়ো ডরসেটকে একটি কড়া চিঠি পাঠানো ভাল বলে আমি মনে করছিলাম। আমি মুক্তিপণ দাবি করব এবং কীভাবে তা দিতে হবে, তারও নির্দেশ দেব।

- "তুমি জানো স্যাম, আমি সবসময় তোমার পাশে দাঁড়িয়েছি। চোখের পলক না ফেলে আমি ভূমিকম্প, আগুন এবং বন্যার মুখোমুখি হয়েছি। তোমার সাথে পোকার গেম, ডিনামাইট বিস্ফোরণ, পুলিশের অভিযান, ট্রেন ডাকাতি এবং ঘূর্ণিঝড়ে সেঁটে ছিলাম। আজ অবধি আমি কখনো ভীত হইনি, যতক্ষণ না দুপায়ে রকেট বাঁধা ওই বাচ্চাটাকে আমরা অপহরণ করেছি। ও আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। তুমি আমাকে বেশিক্ষণ ওর সাথে একলা ছেড়ে যাবে না তো, স্যাম?"

- "আমি আজ বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি ছেলেটাকে হাসিখুশি আর চুপ করিয়ে রাখবে। এবার আমরা বুড়ো ডরসেটকে চিঠিটা লিখব।"

বিল আর আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে চিঠি লেখা শুরু করি। এদিকে, লাল সর্দার তার সারা গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে হেলেদুলে উপর-নীচ হাঁটতে থাকে। সে গুহার মুখ পাহারা দিচ্ছিল। মুক্তিপণ দু'হাজারের বদলে পনেরো'শ ডলার করে দেওয়ার জন্য বিল কাঁদতে কাঁদতে আমাকে মিনতি করতে থাকে। সে বলে, "সন্তানদের প্রতি বাবা-মায়ের সুপরিচিত ভালবাসার বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা আমি করছি না। কিন্তু তা খাটে মানুষের বেলায়। একটা চল্লিশ পাউন্ডের মেচেতাওয়ালা বনবিড়ালের জন্য দু'হাজার ডলার ছেড়ে দেওয়া কারো পক্ষেই মানবিক নয়। আমি পনেরো'শ ডলার চাওয়ার সুযোগ নিতে ইচ্ছুক। বাড়তিটা নাহয় তুমি আমার থেকেই নিয়ে নিও।"

অগত্যা বিলকে রেহাই দেবার জন্য আমি রাজি হয়ে গেলাম। একসাথে আমরা একটি চিঠি লিখলাম, যেটা এরকম দাঁড়াল –

"ইবেনেজার ডরসেট এস্কোয়ার,

আমরা আপনার ছেলেকে সামিট থেকে অনেক দূরে একটা

জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি | আপনার বা সেরা গোয়েন্দাদের পক্ষে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা অর্থহীন | একমাত্র শর্ত যার ভিত্তিতে আপনি তাকে ফিরে পেতে পারেন তা হ'ল আমরা তার প্রত্যাবর্তনের জন্য পনেরো'শ ডলার বড় মূল্যের নোট দাবি করি | টাকাটা আজ মধ্যরাতে একই স্থানে এবং আপনার উত্তরের সাথে একই বাক্সে রেখে যেতে হবে, যেমনটি নিচে বর্ণনা করা হয়েছে |

আপনি যদি এই শর্তাবলীতে সম্মত হন, তাহলে আজ রাত সাড়ে আটটায় একজন একক পত্রবাহকের মাধ্যমে আপনার লিখিত উত্তর পাঠান | পপলার কোভের রাস্তা ধরুন এবং আউল ক্রিক পার করুন | সেখানে আপনি প্রায় এক'শ গজ অন্তর তিনটে বড় গাছ দেখতে পাবেন | ওগুলো ডানদিকে গম-ক্ষেতের বেড়ার কাছাকাছি রয়েছে | তৃতীয় গাছের উল্টোদিকের বেড়ার খুঁটির তলায় নেমে যান | ওখানে আপনি একটি ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স পাবেন | পত্রবাহক সেই বাক্সে উত্তরটি রাখবে এবং অবিলম্বে সামিটে ফিরে যাবে | আপনি যদি কোন বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করেন বা এই চিঠির দাবি পূরণ না করেন, তবে আপনার ছেলেকে আপনি আর কোনোদিন দেখতে পাবেন না | আপনি যদি দাবি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ করেন, তাহলে তিন ঘন্টার মধ্যে তাকে নিরাপদে আপনার কাছে ফেরত দেওয়া হবে | এই শর্তাবলীই চূড়ান্ত, আপনি যদি সেগুলোর সাথে একমত না হন, তবে আমরা আর আপনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব না |

দুই বেপরোয়া পুরুষ"

চিঠিতে ডরসেটের ঠিকানা লিখলাম | তারপর সেটাকে পকেটে রাখলাম | আমি যখন চলে যেতে উদ্যত হচ্ছি, তখন ছেলেটা আমার কাছে এসে বলল, "ওঃ, সাপচোখো, তুমি যে বলেছিলে তুমি চলে গেলে আমি ব্ল্যাক স্কাউট খেলতে পারব!"

- "হ্যাঁ হ্যাঁ, খেলো | মিষ্টার বিল তোমার সাথে খেলবে | আচ্ছা, এটা কী ধরনের খেলা?"

- "আমি ব্ল্যাক স্কাউট | দুর্গের উপর চড়ে বসতি স্থাপনকারীদের সতর্ক করব যে রেড ইন্ডিয়ানরা আসছে | একা একা রেড ইন্ডিয়ান খেলতে খেলতে আমি ক্লান্ত | এবার আমি ব্ল্যাক স্কাউট হতে চাই |"

- "ঠিক আছে, এটা তো আমার কাছে একটা সোজাসাপ্টা খেলা বলেই মনে হচ্ছে | আমার ধারণা মিস্টার বিল ঠিক তোমাকে হাড়-জ্বালানো রেড ইন্ডিয়ানদের বোকা বানাতে সাহায্য করবে |"

- "তা আমাকে কী করতে হবে?" ছেলেটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বিল বলল |

- "তুমিই তো ঘোড়া | তোমার হাত আর হাঁটু মুড়ে মাটিতে নেমে এসো | ঘোড়া ছাড়া আমি দুর্গে চড়ব কীভাবে?"

আমি বললাম, "যতক্ষণ না আমরা ফন্দিটা চালু করি ততক্ষণ কিন্তু তুমি ওকে আগ্রহী করে রাখবে | আরে, একটু চাঙ্গা তো হও |"

বিল চার হাত-পায়ে নিচু হয়ে মাটিতে নেমে আসে | একটা খরগোশ ফাঁদে ধরা পড়লে তার যেমন চেহারা হয়, বিলের চোখের দৃষ্টি এখন ঠিক সেইরকম |

- "এখান থেকে দুর্গটা কত দূর হে ছোকরা?" ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জিজ্ঞেস করে বিল |

- "নব্বই মাইল | তোমাকে সেখানে সময়মতো পৌঁছানোর জন্য চলা শুরু করতে হবে | এখনই!"

ব্ল্যাক স্কাউট বিলের পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল | তারপর সে বিলের পার্শ্বদেশে তার গোড়ালি দিয়ে গভীর খোঁচা মারল |

- "ভগবানের দোহাই, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, স্যাম | যত তাড়াতাড়ি পারো | মনে হচ্ছে, মুক্তিপণটা আমাদের এক হাজারের বেশি না করাই উচিত ছিল |"

বিল ছেলেটাকে বলে, "আমায় লাথি মারা বন্ধ করো, নইলে আমি উঠে তোমার পাছায় একটা চড় মারব |"

আমি হেঁটে পপলার কোভে গেলাম এবং পোস্ট অফিস আর দোকান চত্বরে বসলাম | দোকানে জিনিস কিনতে এসেছে এমন গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললাম | একজন দাড়িওয়ালা লোক বলল যে, সে শুনেছে গোটা সামিট খুব মর্মাহত কারণ বুড়ো ইবেনেজার ডরসেটের ছেলেটা হারিয়ে গেছে বা চুরি গেছে |

এটাই আমি জানতে চাইছিলাম | আমি কিছু ধূমপানের তামাক কিনলাম এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে কালো-চোখওয়ালা মটরদানার দাম উল্লেখ করলাম | তারপর আমাদের চিঠিটা গোপনে পোস্ট করে চলে এলাম | পোস্টমাস্টার বললেন, ডাকহরকরা এক ঘন্টার মধ্যে এসে ডাক নিয়ে সামিটে যাবে |

আমি যখন গুহায় ফিরে আসলাম, বিল এবং ছেলেটা সেখানে ছিল না। গুহার চারপাশে খোঁজাখুঁজি করলাম এবং ঝুঁকি নিয়ে এক-দুবার চিৎকার করলাম, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। অতএব আমি আমার তামাকের পাইপ জ্বালালাম এবং একটা শ্যাওলাটে পাড়ে বসে কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় রইলাম।

আধঘন্টার মধ্যে ঝোপঝাড়ে খচমচ আওয়াজ শুনতে পেলাম। বিল টলমল করে গুহার সামনের ছোট্ট খোলা জায়গাটাতে বেরিয়ে এল। ছেলেটা তার পেছনেই ছিল। সে একজন যোদ্ধার মতো মৃদু পায়ে এল, মুখে তার একগাল হাসি।

বিল থামল, তার টুপি খুলে ফেলল এবং লাল রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। তার প্রায় আট ফুট পিছনে এসে ছেলেটা থেমে গেল। বিল বলল, "স্যাম, আমার মনে হয় তুমি হয়তো ভাববে আমি একটা বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু আমি এটা না করে পারলাম না। আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যার নিজেকে রক্ষা করার মনুষ্যোচিত উপায় এবং অভ্যাস রয়েছে। কিন্তু কখনো এমন কিছু সময় আসে যখন সব ধরনের অহংবোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয়। ছেলেটা চলে গেছে। আমি তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাদের সব পরিকল্পনা বরবাদ।"

বিল বলে চলে, "পুরনো যুগে শহীদরা যে ধরনের উপরি উপভোগ করত, তা ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে বরঞ্চ তারা মরে যেত। তাদের কেউ কখনো আমার মতো এমন অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য করেনি। আমি আমাদের জোচ্চুরি-জালিয়াতির নিয়ম-নীতির প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেটার সীমা ছাড়িয়ে গেল।"

- "সমস্যাটা কী, বিল?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

বিল বলল, "আমি চড়েছিলাম নব্বই মাইল দুর্গ অবধি, এক ইঞ্চিও কম নয়। তারপর, বসতি স্থাপনকারীদের উদ্ধার করা হয়ে গেলে, আমাকে ওটস খেতে দেওয়া হয়। যদিও তার বিকল্প হিসাবে বালি মোটেই সুস্বাদু ছিল না। তারপর একঘন্টা ধরে আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি গর্তগুলোর মধ্যে কেন কিছু নেই; আমি তাকে এও বলার চেষ্টা করেছি যে একটি রাস্তা কীভাবে দুদিকেই যেতে পারে এবং ঘাস কেমন করে সবুজ হয়। আমি তোমাকে বলছি স্যাম, মানুষের একটা সহ্যের সীমা আছে। আমি ওকে ওর জামার গলা ধরে টানতে টানতে পাহাড়ের নিচে নিয়ে যাই। পথে সে লাথি মেরে মেরে হাঁটু থেকে নীচ পর্যন্ত আমার পা কালচে নীল করে দিয়েছে। আর আমার হাতের দু-তিনটে কামড়েরও চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু সে চলে গেছে, বাড়ি চলে গেছে। আমি তাকে সামিটের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। আমি তাকে লাথিও মেরেছি, এক লাথিতে সেখানের প্রায় আট ফুট কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছি। আমি দুঃখিত যে আমরা মুক্তিপণ হারালাম। কিন্তু হয় সেটাই ছিল, নয়তো বিল ড্রিসকোলকে পাগলাগারে পাঠাতে হতো।"

বিল হাঁপাচ্ছে এবং ফুঁসছে। কিন্তু তার লালচে মুখে শান্তি ও ক্রমবর্ধমান তৃপ্তির একটা ছাপ ফুটে উঠেছে যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

- "বিল, তোমার পরিবারে কারো হৃদরোগ নেই, আছে কি?"

- "না, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ঘটনা ছাড়া দীর্ঘস্থায়ী কিছুই নেই। কেন?"

- "তাহলে তুমি ঘুরে দাঁড়াতে পারো। আর তোমার পিছনে একবারটি তাকাও।"

বিল পিছন ঘোরে এবং ছেলেটাকে দেখে। সে ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে। সে লক্ষ্যহীনভাবে ঘাস এবং ছোট ছোট লাঠির টুকরো কুড়াতে শুরু করে। আমার ভয় করেছিল, যে সে হয়তো পাগলই হয়ে গেছে।

আমি তাকে বললাম, "আমার ধান্দা হচ্ছে পুরো কাজটা একবারেই শেষ করা। বুড়ো ডরসেট আমাদের প্রস্তাবে রাজি হলে আমরা মুক্তিপণ পেয়ে যাব এবং সেটা নিয়ে মাঝরাতের মধ্যেই আমাদের পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলব।"

বিল অনেক সাহস সঞ্চয় করে ছেলেটাকে একটা দুর্বল হাসি দিল। সে প্রতিশ্রুতিও দিল যে যখন সে একটু ভাল বোধ করবে তখন ছেলেটার সাথে জাপানি যুদ্ধে এক রাশিয়ানের খেলাটা খেলবে।

আমার পরিকল্পনা ছিল বিরোধিতার ষড়যন্ত্রের ফাঁদে না পড়ে ওই মুক্তিপণ আদায় করা। পেশাদার অপহরণকারীদের কাছে এটা আকর্ষণীয় মনে হবে। যে গাছের নিচে চিঠির উত্তর ও টাকা রেখে যাওয়ার কথা সেটা ছিল রাস্তার বেড়ার কাছে। তার চারদিকে খালি মাঠ। যদি এমন হয় যে পুলিশ অফিসারদের দল টাকা নিতে কে আসছে তার উপর নজরদারি করছে, তাহলে অনেক দূর থেকেই তাঁরা তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু না, স্যার! সাড়ে আটটায়, আমি সেই গাছের উপর উঠে গেলাম। গেছো

ব্যাঙের মতোই গাছে ভালমতো লুকিয়ে আমি পত্রবাহকের আসার অপেক্ষা করতে থাকলাম।

ঠিক সময়ে, একটি আধ-বয়সী ছেলে সাইকেলে করে রাস্তা দিয়ে উঠে এল। বেড়ার খুঁটির পাদদেশে সে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা সনাক্ত করে। তারপরে সে একটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরো ওতে ঢুকিয়ে দেয়। এর পরে সে সামিটের দিকে প্যাডেল করে ফিরে যায়।

আমি একঘন্টা অপেক্ষা করলাম এবং বুঝলাম যে এখন কেউ আর কোন চাল চালবে না। গাছ থেকে আমি হড়কে নেমে এলাম ও চিরকুটটা পেলাম। তারপর জঙ্গলে পৌঁছানো পর্যন্ত বেড়া বরাবর পিছলে পিছলে চলতে থাকলাম। আরও আধঘন্টার মধ্যে আমি গুহায় ফিরে এলাম।

চিরকুটটা খুলে লণ্ঠনের কাছে এগিয়ে বিলের সামনে সেটা পড়লাম। খারাপ হাতের লেখায় কলম দিয়ে লেখা হয়েছে। "মহোদয়গণ,

আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মুক্তিপণের বিষয়ে আমি আজ আপনাদের চিঠি পেয়েছি। আমি মনে করি আপনাদের চাহিদা একটু বেশি। তাই আপনাদের আমি এখন একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, যা আমি বিশ্বাস করি আপনারা গ্রহণ করবেন। আপনারা জনিকে বাসায় নিয়ে আসুন এবং আমাকে আড়াই'শ ডলার নগদ দিন। আমি তখন তাকে আপনাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিতে রাজি হব। রাতে আসাই ভাল, কারণ প্রতিবেশীরা বিশ্বাস করে সে হারিয়ে গেছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে এনেছে দেখলে তারা সেই ব্যক্তিকে কী করবে, তার জন্য কিন্তু আমি দায়ী হতে পারব না। অত্যন্ত সম্মানের সাথে,

ইবেনেজার ডরসেট"

আমি বলে উঠি, "পেনজান্সের মহান জলদস্যু! সবচাইতে বেহায়া..."

কিন্তু আমি বিলের দিকে ইতস্তত আড়চোখে তাকালাম। তার চোখে এমন একটা অনুনয়ের ছাপ ছিল, যা আমি বোবা বা কথাবলা কোনো প্রাণীর মুখে কক্ষনো দেখিনি।

- "স্যাম, আড়াই'শ ডলার আর এমন কী? ও তো আমাদের আছে। এই ছেলের সঙ্গে আর এক রাত কাটাতে হলে আমাকে পাগলা গারদের বিছানায় উঠতে হবে। একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক হওয়ার পাশাপাশি, আমি মনে করি মিস্টার ডরসেট একজন কঞ্জুষ, তাই আমাদের এমন একটা উদার প্রস্তাব দিয়েছেন। তুমি নিশ্চয়ই এ সুযোগ হাতছাড়া করবে না, তাই না?"

- "সত্যি কথা বলতে কি, বিল, এই ছোট্ট ভেড়ার বাচ্চাটা আমার স্নায়ুতেও একটু চাপ ফেলেছে। আমরা ওকে বাড়িতে নিয়ে যাব এবং মুক্তিপণ পরিশোধ করব। তারপর আমরা আমাদের পালাবার ব্যবস্থা করব।"

সেই রাতেই আমরা তাকে বাড়িতে নিয়ে যাই। তাকে বলি যে, তার বাবা তার জন্য একটা রাইফেল এবং একজোড়া মোকাসিন জুতো কিনেছেন। আমরা আরও বলেছিলাম যে আমরা পরের দিন ভালুক শিকার করতে যাচ্ছি।

আমরা যখন ইবেনেজারের সদর দরজায় টোকা মারি, তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। ঠিক এই মুহূর্তে গাছের নীচের বাক্স থেকে পনেরো'শ ডলার আমার পকেটস্থ করার কথা ছিল। পরিবর্তে ডরসেটের হাতে তুলে দেবার জন্য বিল গুনছিল আড়াই'শ ডলার।

ছেলেটা যখন বুঝতে পারল যে, আমরা তাকে বাড়িতে রেখে যাচ্ছি, তখন সে পাইপ-অর্গানের মতো চিৎকার করতে শুরু করল। ছিনে জোঁকের মতো সে বিলের পা শক্ত করে চেপে ধরল। তার বাবা একটু একটু করে তাকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল, যেমনটা করা হয় ঝাঁঝরা প্লাস্টারের বেলায়।

- "আপনি ওকে কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবেন?" বিল জিজ্ঞেস করল।

- "আমি আর আগের মত শক্তিশালী নেই। কিন্তু আমার মনে হয় আমি তোমাকে দশ মিনিটের কথা দিতে পারি।" বুড়ো ডরসেট বলল।

- "যথেষ্ট, দশ মিনিটের মধ্যে আমি মধ্য, দক্ষিণ এবং মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলো ছাড়িয়ে সোজা ক্যানাডার দিকে রওনা হয়ে যাব।"

তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিল বেশ মোটা এবং আমি একজন ভাল দৌড়বীর; কিন্তু আমি তার নাগাল পাবার আগেই সে সামিট থেকে দেড় মাইল দূরে চলে গেছে।

মায়ের কোলে প্রথম যেদিন

হুসনে জাহান

"তোমার শুভ জন্মদিন ফিরে আসুক বহুবার।"

জন্মদিনে সবাই এই শুভেচ্ছা জানিয়েই গান করে। কিন্তু কারো জীবনের দিনগুলো শুভ কেটেছে কিনা তার খবর কি কেউ রেখেছে? আর ভবিষ্যতের দিনগুলো যে মঙ্গলময় হবে তার প্রতিশ্রুতিই বা কে দিতে পারে? কিন্তু তবুও সবাই বহু পুরনো এই শুভেচ্ছা বুলিই আওড়ায়। তবে শুভ কামনার মন নিয়েই নিশ্চয় সবাই এই শুভেচ্ছা জানায়। কিন্তু আসল কথা হ'ল এ সব প্রশ্নের উত্তর কারুরই নেই জানা। প্রিয়জন শুভেচ্ছা ও আনন্দ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের হিসাব তো সূর্যাস্তের সীমানারও বাইরে।

বছর কয়েক আগে দেশে নিজের ব্যক্তিগত পরিবেশে বাবা, মা, স্বামী সবাই চিরশান্তিতে। ভাই-বোন কেউ বিদেশে, কেউ প্রিয়জনের শুশ্রূষায় নিমগ্ন, কেউ চিরশান্তির শয্যায়। এ অবস্থায় এক জন্মদিনের বিকেলে স্মৃতির ভারে বিমর্ষ হয়ে নিজের মনটা হালকা করার চেষ্টায় ফোনের রিসিভার তুললাম।

- "বেলি, তুমি বাসায়?"
- "হ্যাঁ আপা আমরা সবাই বাসায়।"
- "আমি কি এখন তোমাদের কাছে আসতে পারি? আজ আমার জন্মদিন।"
- "নিশ্চয়। সে কি আবার বলতে হবে? এসে পড়ো। আমরা সবাই বাসায় আছি।"

ফোনটা নামিয়ে কাছের বেকারি থেকে আমার পছন্দের একটা চকলেট কেক, কয়েকটা সিঙ্গারা, আর প্যাটিস কিনে আমাদের দু'ফ্ল্যাট দালানের মাঝের গলিটা পার হয়ে বেলিদের বাসায় হাজির হলাম। বলাবাহুল্য, বেলি ও তার পরিবার আন্তরিকতার সাথে আমাকে আপ্যায়ন করে, কিছু উপহার হাতে দিয়ে আমার মনের বিষাদের আবরণ দূর করে দিল। কেকটা কাটলাম। নাস্তাগুলো খাবার কিছু পরে তাদের রান্না রাতের খাবারও খাওয়া হ'ল। তারপর বেলি আমার সাথে হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে আমার দালানের গেটে পৌঁছিয়ে দিল। এরকম আন্তরিকতার ঋণ কি জীবনে কখনো শোধ করা সম্ভব!

জন্মদিনের কথা আজ মনে এল কারণ আজ সেইদিন, যেদিন আমার বালিকা মা আমাকে গর্ভে লালন করে বাহ্যিক পৃথিবীর আলোছায়ার সাথে পরিচিত করেছিলেন। রাশি-গ্রন্থ হিসাবে অগাস্ট মাসে জন্মানোর কারণে আমি হলাম সিংহের দোসর। আর সূর্য হ'ল আমার গ্রহ। সিংহভায়ার সাথে আমার কখনোই বন্ধুত্ব করার শখ হয়নি এবং হবার সম্ভাবনাও নেই। আর সূর্যমামার বিষয়ে আমার মা বলতেন যে সেই মামার প্রখর তাপ থেকে আমাকে সর্বদা সুরক্ষিত রাখতেই তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ফলে আজীবন ওই মামার কিরণের প্রখরতা আমাকে বিব্রতই করেছে। আর সূর্যরাশির উগ্র, বেপরোয়া, উড়নচন্ডী বৈশিষ্ট্যের প্রভাব আমার চরিত্রে লক্ষ্যণীয় হবার সম্ভাবনাও আমার কোষ্ঠীরই বিশ্লেষণ। সে বিশ্লেষণ অনুযায়ী সূর্যের প্রখরতা আমার চরিত্রে ও জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে সে কথা আমার আশেপাশের মানুষই যথাযথ বলতে পারবে। সে যাই হোক, আজকে পরিণত বয়সে পৌঁছে এটুকু বলা যেতে পারে যে স্থান-কাল-পাত্র ও বাস্তবতার প্রভাবে মানুষের স্বভাব এবং চিন্তাধারারও প্রভূত পরিবর্তন হয়। তাই শৈশবের অবাঞ্ছিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্তিমিত হয়ে ক্রমশঃ সার্বজনীন মঙ্গলের লক্ষ্যে সম্প্রীতি ও সদিচ্ছায় পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন নিজের এবং পারিপার্শ্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে কতটা কাম্য ও বাঞ্ছনীয়, সে উপলব্ধি যার হয়েছে, সেই একমাত্র বুঝবে এ কথার মর্ম।

সৃষ্টিকর্তার বিধানে আজ আমি প্রিয় মাতৃভূমি থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আমার ছেলের পরিবারের সাথে আমার জন্মদিন পালন করার সুযোগ হয়েছে। আমাদের পারিবারিক নিয়মানুযায়ীই সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশেই এটা উদ্‌যাপন করা হয়। এরকমটাই আমাদের পারিবারিক দস্তুর; হয় নিজ বাসস্থানে নয়তো কোনো রেস্তোরাঁয়। একটা ছোট্ট মোমবাতি জ্বালিয়ে শুভেচ্ছার গান করা, কেক কাটা, জন্মদিনের মানুষের পছন্দের কিছু ভাল খাবার খাওয়া – এভাবেই আমাদের বাবা-মায়েরা সন্তানের জন্মের সময় ও অবস্থা মনে করিয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছেন তার কোনো তুলনাই হয় না। আর যার জন্মদিন? জন্মদাতার স্নেহের এমন প্রকাশ উপলব্ধি করাটাই তো সন্তানের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি। এই অনুভূতিই তার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে একাকীত্বের মোকাবিলা করতে

সাহায্য করবে।

বাবা মা চলে যাবার পরও জন্মদিনে আমরা মায়ের নিয়মে শুধু পরিবারের সাথেই আনন্দ করেছি। তাঁদের নিয়ম ও চিন্তাধারা আমাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। জন্মদিন একান্তই এক পারিবারিক ঘটনা এবং তা অত্যন্ত আপন লোকের কাছেই এক আনন্দকর স্মৃতি। অন্যান্য আত্মীয় এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবও এ উৎসবে আনন্দের সাথেই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং করেও থাকে। কিন্তু এ চিন্তাও আসে যে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালে তাদের উপর কি অযথা একটা দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় না!

সন্তানের জন্মদিনে জন্মদাত্রী মায়ের যে অগ্রাধিকার সে ব্যাপারে আমাদের কারো কখনো দ্বিমত হয়নি। কাজেই স্নেহময়ী মা যতদিন সুস্থ শরীরে বর্তমান, তাঁর সন্তানের জন্মদিন উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত অবশ্যই আমাদের শিরোধার্য। তাঁর স্নেহের দাবি অমান্য করার কোনো কারণই দেখি না।

যেদিন যে সন্তানের জন্মদিন সেদিন আমাদের মা তার জন্য তার পছন্দমতো জামাকাপড় উপহার দিতেন। তার পছন্দের খাবার নিজে হাতে রান্না করতেন আর জন্মদিনের কেকটাও নিজেই তৈরী করতেন। অন্যান্য মিষ্টি ও খাবার ইত্যাদি ভাই, বোন, মামা, কাকা, মাসি নিয়ে এলে বা কোনো উপহার দিলেও কোনো আপত্তি ছিল না। যতদিন বাবা-মা'র কাছে থেকেছি, এভাবেই উদযাপিত হয়েছে আমাদের জন্মদিন। জন্মদিনে যদি আমরা কেউ অন্য শহরে বা বিদেশে থেকেছি, তখন মা আমাদের কাছে উপহার পৌঁছে দেবার জন্য বাবাকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন। যতদিন মা সুস্থ, সবল ও চলমান ছিলেন, দেশে বা বিদেশে তাঁর সন্তান যে যেখানেই থেকেছি, কেউ মায়ের এ স্নেহের দান থেকে বঞ্চিত হইনি।

যখন স্বামী হারালাম আর সন্তান বিদেশে বসবাস শুরু করল, তখন আমার ভাই-বোনরা যতদিন কাছাকাছি থেকেছে, তারাই আমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছে।

আমাদের পার্থিব জীবন সর্বদাই পরিবর্তনশীল। ভাগ্য কখন, কোনদিকে, কীভাবে মোড় নেবে তা সবারই অজানা। যখন একাকীত্ব অসহ হয়ে উঠল তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা নিজেকেই খুঁজে নিতে হ'ল। সে সময় আমি কর্মজীবী। মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল, যা সিনেমায় দেখেছি আর বইতেও পড়া। আজকাল কর্মসংস্থানে চাকুরেদের জন্মদিনে গোপনে আকস্মিক পার্টির ব্যবস্থা করা হয়। আমরাও তো আমাদের কর্মক্ষেত্রে তেমনই করতে পারি!

যেমন ভাবা তেমন কাজ। আমি তখন আমার বিভাগীয় প্রধান। সহকর্মীরা একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করল। ব্যস, সবার জন্মতারিখ জেনে, বিদেশী কায়দায় অফিসের ফাইলে লিখে রেখে, সবার জন্য সারপ্রাইজ পার্টির ব্যবস্থা চালু করে দিলাম। তারপর থেকে প্রত্যেক সহকর্মীর জন্মতারিখে খাওয়া-দাওয়া, প্রীতি-উপহার বিনিময় সবেরই ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। যতদিন চাকুরিরত ছিলাম সেই ব্যবস্থা আমার জন্মদিনের বিষণ্ণতা অনেকটা সামলিয়ে দিয়েছে। চাকরি শেষ হবার পর আবার জন্মদিনে একাকীত্ব দূর করার নতুন পথ খুঁজতে হ'ল। বিদেশে ছেলের কাছে চলে না আসা পর্যন্ত সে সময় প্রতি জন্মদিনে বেলির পরিবারের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

জন্মদিনের কথা বলতে গিয়ে আমাদের বাবা মা ও তারও পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরা জন্মদিন পালন করেছেন কিনা সে কথা মনে এল। তাঁদের জন্মদিন পালন করতে কখনো দেখেছি বা শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। আমার ধারণা এর কারণ হ'ল যে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সাল, তারিখ জানার বিশেষ প্রয়োজন তাঁদের ছিল না। দিনের কোন সময় আর সপ্তাহের কোন দিন, কোন প্রহরে পৃথিবীতে আগমন, সেকথা মা-মাসি-পিসি-দিদিমার মুখে শুনেছি। সঠিক দিন তারিখ নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয়নি। এমনকি কারো বিবাহ বা মৃত্যুর তারিখও ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তাঁদের জানা ছিল না। তাঁরা বলতেন, "ওই, যে বছর বড় বন্যা হয়েছিল, যে বছর দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, যে বছর তুফানে বাসার বাইরের বটগাছটা ভেঙে পড়েছিল, যে বছর অমুকের জন্ম মৃত্যু বা বিবাহ হয়েছিল" ইত্যাদি। এই ধরনের স্মৃতির মাধ্যমে তাঁরা ঘটনার সময় উল্লেখ করতেন। তাছাড়া দিন তারিখের প্রয়োজন হলে বাংলা ক্যালেন্ডারই তো যথেষ্ট। সরকারী চাকুরেদের ইংরেজি দিন তারিখ ও মাসের প্রয়োজন ছিল। আমার দাদু, বাবা-মা এবং তাদের শহরে পড়াশোনা ও চাকরি করা ভাই-বোনের ইংরেজি দিন তারিখের প্রয়োজন হয়েছিল। আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার সময় জন্মতারিখ জানাবার প্রয়োজন হয়নি। শুধু চাকরিতে যোগ দেবার সময় জন্মতারিখ লেখার প্রয়োজন

হয়েছে।

আমাদের পরিবারে আমাদের বাবা ও মা প্রথম আমাদের জন্মতারিখ, মাস ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মেনে প্রতি বছর আমাদের জন্মদিন ঘরোয়াভাবে উদ্‌যাপন করেছেন। কিন্তু আমার বাবার জন্মতারিখ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে তাঁর সরকারী চাকরির পরীক্ষার জন্য আবেদন পত্রে তাঁর জন্মের তারিখ ও বছর ধার্য আনুমানিক ধরা হয় ১লা জানুয়ারী, ১৯০০ সাল। আমার মা চাকরি করার সুযোগ পাননি ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তানের দায়িত্ব পালনের কারণে। কাজেই তাদের দুজনের কারুরই ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সঠিক দিন, মাস, বছর আমাদের জানা ছিল না। সত্যিই, কী অদ্ভুত মনে হয় না এ ব্যাপারটা! হয়তো সমসাময়িক শহুরে পরিবারে দিনক্ষণ অনুযায়ী জাঁকজমক হৈহুল্লোড়ের সাথে জন্মদিন উৎসব পালন করা হয়েছে। আর এখন জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সাথে উৎসব আনন্দের মানও তাল মিলিয়ে আরো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পড়েছে।

তবে আজকাল অনেকে যেভাবে জন্মদিনের উৎসব পালন করে, সেটা আমাদের পুরনো নিয়মের চাইতে অনেক বেশি চমকপ্রদ আর খরচ সাপেক্ষ। জাঁকজমক ও ধুমধাম করার সঙ্গতি ও অবসর যাদের আছে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু তাদের দেখে অসমর্থ বাবা-মায়ের সন্তানের যদি অনুকরণ করার শখ হয় বা তাদের অসমর্থতার জন্য মনে দুঃখ হয়, সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

জন্মদিন ছাড়াও আজকাল বিত্তবান লোকজন যেরকম আড়ম্বরের সাথে অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে, তা বাকি নব্বই শতাংশ পরিবারের আর্থিক ও মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পুরনো দিনে এক সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে কনেকে সাজিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে বসিয়ে দেখানো হতো। পছন্দ হলে বিবাহের কথাবার্তা পাকা করা হতো। তারপর কনেকে কিছু উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করে বিবাহের দিন তারিখ ধার্য হতো। বিবাহ হলের প্রচলন হবার আগে কনের পিত্রালয়ে এবং প্রয়োজনে আশেপাশের পাড়াপড়শির আরো দু'একটা ঘর বা উঠোন ধার করে যে যার সঙ্গতি অনুযায়ী ঘরবাড়ি সাজিয়ে বিবাহের ভোজ ও অনুষ্ঠান সম্পন্ন করত। তারপর বৌভাতের দিন বরের বাড়িতে তাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী আরেক ভোজের আয়োজন করে বিবাহের সামাজিকতা সম্পন্ন হতো।

আর আজকাল প্রতি শহরে যত্রতত্র বিবাহের হল উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বড় বড় আন্তর্জাতিক হোটেলেরও অভাব নেই। বিত্তবান মানুষের বিত্তের ব্যবহার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি সুযোগ সৃষ্টির কোনো ত্রুটি রাখেনি। তাই দেখা যায় বিবাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের এই বিরাট খরচ সামলাবার দুশ্চিন্তায় অনেক সীমিত আয়ের পরিবারেরই দিনরাতের শান্তি ও ঘুম উধাও হয়ে যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। আজকের সমাজে সবাই সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই পছন্দ করে বা বাধ্য হয়। কেউ কারো থেকে কম যায় না প্রমাণ করার প্রয়োজন দেখা যায়। তাই এই ধরনের সামাজিক পরিবেশে বিবাহের পাশাপাশি জন্মদিন উদ্‌যাপন করাও একটা বিরাট অনুষ্ঠানের অন্তর্গত হয়ে উঠেছে।

****

{উপরোক্ত রচনাটি সম্পূর্ণরূপে আমার ব্যক্তিগত মতামত; কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উদ্দেশ্য করে বলা নয়।}

সম্পর্ক

বীরেশ্বর মিত্র

ঘড়ির দিকে তাকালাম | সাতটা বেজে গেছে | অনেকক্ষণ থেকে উঠব উঠব করছিলাম, চট করে কি ওঠা যায়, ইউনিয়নের সাথে মীটিং, ওরা আমাকে চায় | এক সপ্তাহ আগে থেকে সময় চেয়ে রেখেছি – সামনে দিওয়ালি, তাই বোনাস নিয়ে দাবি | চট করে মীমাংসা হবার নয়, সেই ভেবে এইচ আর ম্যানেজার আর ইউনিয়নের কর্তাদের বলে বেরিয়ে এলাম |

আজ সকাল থেকেই একের পর এক ঝামেলা – সকালে অফিসে আসতে না আসতেই কাস্টমারের বড় কর্তার ফোন; আমাদের প্রোডাক্টে কিছু সমস্যা দেখে দিয়েছে, যার তাড়াতাড়ি সমাধান প্রয়োজন | দলবল নিয়ে গেলাম | সব মিটিয়ে আসতে আসতে বেলা হয়ে গেল | তারপর হেড অফিসের সঙ্গে ভিডিও কল | তার ঠিক পরেই এই ইউনিয়নের সাথে মীটিং, শেষ হতেই চায় না | আজ আমার অনেক তাড়া | ক্লাবে মীটিং আটটার সময় | যেতেই হবে, সামনে দুর্গাপুজো | ক্লাবের সভাপতি হয়েছি যখন, তখনই অনেক দায়িত্ব এসে পড়েছে | যাবার সময় বাজার করে নিয়ে যেতে হবে | বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ফর্দ ধরিয়ে দিয়েছিল রঞ্জনা, না নিয়ে গেলে মুখ ভার হয়ে যাবে | কোন অজুহাতই ধোপে টিকবে না | তাই আজ বেজায় চাপ, নিজের অফিসে এসে সব গোছগাছ করে সবে বেরোতে যাব, গেট থেকে সিকিউরিটি অফিসারের ফোন, এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, খুব নাকি দরকার, না দেখা করে যাবেন না বলেছেন |

- "কাল সকালে আসতে বলুন, আজ একেবারেই সময় নেই |"
- "উনি নাছোড়বান্দা | অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন | আপনি দরকারি মীটিং-এ ছিলেন, তাই বিরক্ত করিনি |"
- "ঠিক আছে, পাঠান | বলুন পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না |"

সিকিউরিটি ওঁকে আমার অফিসে নিয়ে এল | ভদ্রলোক মাঝবয়সী, চোখে চশমা, উদভ্রান্ত চেহারা; হাঁপাচ্ছিলেন | বসতে বললাম, বুঝলাম একটা সমস্যা নিয়ে এসেছেন | একগ্লাস জল দিলাম; ঢকঢক করে খেলেন |

- "বলুন, কী বলবেন | কী এমন দরকার যে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না?"
- "স্যার, গত কয়েকদিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি, আপনার সিকিউরিটি কিছুতেই দেখা করতে দিচ্ছিল না কোন না কোন অজুহাতে | আজ আমি মরিয়া, ভাবছিলাম আপনার বেরোনোর সময় গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ব |"

বুঝলাম ব্যাপারটা গুরুতর | পুজোর মীটিং, বাড়ির বাজার সব মাথায় উঠল |

একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "নিশা, আপনার অফিসের রিসেপশনিস্ট, আমার স্ত্রী | ভালবেসে বিয়ে, বছর পাঁচেক হ'ল | তিন বছরের একটি মেয়ে আমাদের | ইদানীং কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম নিশার | বেশ কয়েকবার ফলো করেছি এবং এখন আমি সিওর | অফিস থেকে দেরি করে ফেরে, সংসারে একেবারেই মন নেই, মেয়েরও যত্ন নেয় না | কিছু বলতে গেলেই রেগে যায় | এই নিয়ে খুব অশান্তি | ছেলেটি আপনাদের অফিসেই কাজ করে, প্রোডাকসন সুপারভাইসার | নাম কিশোর | কী করি বলুন! দয়া করে সাহায্য করুন | নইলে সংসার ভেসে যাবে |"

সব শুনে বললাম, "আপনি বাড়ি যান | দেখি কী করা যায় |" ওঁকে আশ্বস্ত করে বাড়ি পাঠালাম | মাথায় একরাশ চিন্তা | অফিস, ক্লাব, আর এই এক নতুন চিন্তা যোগ হ'ল! কথা বলতে বলতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, ড্রাইভারকে বাড়ির দিকে যেতে বললাম | ক্লাব, বাজার কোনটাই হ'ল না | রঞ্জনা বুদ্ধিমতী মেয়ে, ঠিক বুঝে নেবে |

বার বার ভদ্রলোকের উদভ্রান্ত মুখটা মনে পড়ছে | খুব খারাপ লাগছিল | কেমন যেন মায়া হচ্ছিল | বুঝলাম সমস্যাটার একটা সমাধান বার করতেই হবে | রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না | নিশাকে ভালরকম চিনি | আমিই ওকে রিক্রুট করেছিলাম বছর খানেক আগে | বেশ সপ্রতিভ মেয়ে | যথেষ্ট স্মার্ট, দেখতেও বেশ সুশ্রী; ইয়ং ছেলেদের ভাল লাগা খুবই স্বাভাবিক | আর কিশোর যাদবও আমার প্রোডাকশন টিমের সেরা ছেলেদের মধ্যে অন্যতম একজন | সব কর্মীদের উপর ভাল দখল ওর | হাতে কলমে কাজ জানে | বছর তিনেক আগে জয়েন করেছে | ওর বস ওর কাজে খুব খুশি | এ বছর ওর প্রমোশন অবশ্যম্ভাবী | আমার খুব পছন্দের ছেলে | অনেক উপরে উঠবে ও |

সকাল ন'টায় অফিস | একটু আগেই পৌঁছালাম |

কেবিনে ঢুকতে না ঢুকতেই আমার সেক্রেটারি, শিল্পা এসে ঢুকল; বলল, "স্যার, নিশা অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, দেখা করতে চায়, খুবই আর্জেন্ট।"

সাধারণত এই সময় আমি ফ্যাক্টরি ভিসিটে যাই। কী আর করা। ডেকে পাঠালাম নিশাকে। এ কী চেহারা করেছে! মনে হ'ল সারারাত ঘুমোয়নি। বসতে বললাম। বসেই, কান্না শুরু করল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বুঝলাম জমে থাকা কান্না, একটু সময় লাগবে। একটু পরে ধাতস্থ হয়ে বলতে শুরু করল, "স্যার, জানি প্রসাদ (আমার স্বামী) গতকাল সন্ধ্যেবেলা আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং আমার নামে অনেক খারাপ কথা বলে নিন্দে করেছে। স্যার, এবার আমার কথা শুনুন। আমাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর আগে। হ্যাঁ, ভালবেসে বিয়ে। কলেজে পড়তাম একসাথে, সেখান থেকে আলাপ, বন্ধুত্ব, শেষ পর্যন্ত বিয়ে। প্রসাদ খুব ভাল ছেলে ছিল স্যার, সব ঠিক ছিল। ইদানীং আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে, প্রায়ই ঝগড়া হয়, প্রায়ই ড্রিঙ্ক করে ফেরে, এসেই চেঁচামেচি শুরু করে, গালিগালাজ করে, এমনকি মাঝে মধ্যে গায়েও হাত তুলেছে। স্যার, কী করি বলুন। আমার কী দোষ। হ্যাঁ, কিশোর আমার খুব বন্ধু। যেদিন আপনার বেরোতে দেরি হয়, সেদিন আমিও অপেক্ষা করি। দেরি হলে কিশোর আমাকে লিফ্ট দেয়। এ কী অপরাধ, বলুন। কোনও পুরুষ কি মেয়েদের ভাল বন্ধু হতে পারে না! ও তো আমার থেকে বয়সে ছোট, আমার ভাইয়ের বয়সী। আজকাল সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরতে ভয় হয়। জানি না, গিয়ে কী মূর্তি দেখব। স্যার, আপনি বলে দিন আমি কী করব।"

মন দিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। মাঝে মাঝে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছিলাম। চাকরি জীবনের প্রথমদিকের অনেক ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল। থাক সেসব কথা। বললাম, "যাও, কাজে মন দাও, ভেবে দেখি কী করা যায়।"

কাজে মন দেওয়া কি এতই সহজ! সহজে বলা যায় কিন্তু...

সেদিন অফিস থেকে বেরোতে অনেকটা দেরি হয়েছিল, প্রায়ই হয়। বাসস্ট্যান্ডটা অফিসের মেন গেটের কাছেই। দেখলাম সেই সন্ধ্যেবেলা নিশা একা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। কৌতূহল হচ্ছিল, তাই একটু দূরে গাড়িটা দাঁড় করালাম। একটা বাস এল দু'মিনিটের মধ্যে। নিশা বাসে উঠল না। একটু পরেই কিশোর এল মটর বাইকে। নিশা উঠল, বেশ ঘন হয়েই বসেছিল। এইরকম পরিস্থিতিতে ওদের দুজনকে এভাবে দেখলে কিছু একটা সন্দেহ হতেই পারে। তাই প্রসাদের পক্ষে সন্দেহ হওয়াটা খুবই স্বাবাভিক।

আরও কয়েকদিন পরের ঘটনা। নিশা আবার এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে যদি কিছু সুরাহা হয়। বলল, "বাড়িতে অশান্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। স্যার, কিছু একটা করুন। বেঁচে থাকতে আর ভালই লাগছে না।"

বুঝলাম ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। অবশ্যই কিছু করা দরকার। নিশা কেবিন থেকে বেরোতে না বেরোতে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন আমাদের এইচ আর ম্যানেজার মিস্টার যোশী। বেশ বিরক্ত হচ্ছিলাম ওঁর উপর। এসব তো ওঁর কাজ! প্রয়োজনমতো আমার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। এখন আমি জড়িয়ে পড়েছি! সকালে অনেক কাজের তাড়া থাকে, তার কিছুই এখনো করে উঠতে পারিনি। তিনি বসেই বলতে শুরু করলেন তাঁর মনমতো গল্প। মোদ্দা কথা, কিশোর এবং নিশাকে নিয়ে কম্পানিতে খুব আলোচনা হয়। ওদের মধ্যে একটা ভাব-ভালবাসা আছে, যেটা সবার নজরে পড়ে। উনি নাকি দুজনকেই অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কিছু ফল হয়নি। আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন ভাবছিলেন, ইতিমধ্যে এই সব ঘটনা। দেখলাম উনি প্রসাদ এবং নিশার আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে সবটাই জানেন। কিন্তু কোনও সমাধান ওঁর কাছে নেই। বুঝলাম যা করার আমাকেই করতে হবে। ওদের আপাতত আলাদা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক জানাশোনা ছিল, তাই নিশার যোগ্যতা অনুযায়ী একটা ভাল কাজ যোগাড় করতে অসুবিধা হ'ল না। মাইনে অনেকটা বেশি। নিশাকে রাজি করাতেও কোন বেগ পেতে হ'ল না। এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, বুঝতে পেরেছিল যে এটাই সবথেকে ভাল সমাধান। বলেছিলাম, "ক'দিন বাইরে কোথাও বেড়িয়ে এসো, ভাল লাগবে।" ছুটি নিল কয়েকদিন, আর পরের মাসের এক তারিখে নতুন চাকরিতে জয়েন করল। যাবার আগে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ভাল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। কান্না থামিয়ে কথা দিয়েছিল যোগাযোগ রাখবে। খবর পেলাম, এক সপ্তাহের মধ্যে কিশোরও এখানের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। দূরে কোথাও

চাকরি পেয়েছে। না, যাবার আগে ও আমার সঙ্গে দেখা করে যায়নি। হয়তো লজ্জা পেয়েছিল। দুজন ভাল স্টাফকে হারালাম এক মাসের মধ্যে, খারাপ লাগছিল ঠিকই, কিন্তু...। ভাবলাম এইভাবে যদি এই সমস্যার সমাধান হয় তো মন্দ কি! দূরে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা কম হবে, একটা সংসার বেঁচে যাবে। আর কিশোরের তো বয়স অল্প, এখন ও নেশার ঘোরে আছে, আস্তে আস্তে ঘোর কেটে যাবে। একটা আত্মতুষ্টির ভাব এল মনে। যাক, কঠিন একটা সমস্যার সমাধান হ'ল, এখন নিজের কাজে মন দেওয়া যাক, অনেক কাজ বাকি। যোশীসাহেব অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন, "স্যার, এই কাজ আর কারও পক্ষে সম্ভব হতো না।"

প্রথম প্রথম ওদের দুজনের কাছ থেকেই মেসেজ আসত। আমাকে খুব মিস করে, আমার মতো বস নাকি পাওয়াই যায় না ইত্যাদি – আরো কতরকম গুণগান! ওরা সুখে শান্তিতে আছে ভেবে আমিও নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। আস্তে আস্তে মেসেজ আসা কমতে শুরু করল। সেটাই তো স্বাভাবিক!
অনেকদিন কেটে গাছে। তা প্রায় বছর দুয়েক হবে। একদিন সকালে আমার সেক্রেটারি এসে জানাল যে নিশা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কথা বললাম। ওরা ভাল পাড়ায় মেয়ের স্কুলের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। এতদিন ভাড়া বাড়িতে ছিল। অমুক দিন গৃহপ্রবেশ। আমাকে যেতেই হবে। সবটা ডিটেল মেসেজ করে পাঠাবে। ম্যাডামকেও নিয়ে যেতে হবে। শুনে খুশি হলাম। কথা দিলাম যাব।

যথা দিনে, যথা সময়ে হাজির হলাম নিশার নতুন বাড়িতে। খবর পেয়ে দৌড়ে এল বাড়ির সবাই। নিশা আর প্রসাদ দুজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, মেয়েকে ডেকে এনে প্রণাম করাল। দুজনেরই মা-বাবা উপস্থিত ছিলেন। আলাপ করিয়ে দিল। ভাল লাগল, সুন্দর ছিমছাম সংসার। তিনতলা বাড়ির নিচের তলার ফ্ল্যাট, বাগান করার মতো এক চিলতে খোলা জায়গা আছে। ছোট ফ্ল্যাট, রুচিসম্মতভাবে সাজানো। ছাদে খাবার আয়োজন ছিল। গিয়ে দেখি অফিসের লোকজন ভর্তি। আমাকে দেখে সবাই এগিয়ে এল। আমাকে দেখতে পাবে আশা করেনি ওরা। দেখলাম সবাই খুব খুশি। শিল্পাও এসেছিল। কিশোর পরিবেশন করছে দেখে অবাক হলাম আর ভালও লাগল। নিশা ও প্রসাদকে অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলাম একটা পরিতৃপ্ত মন নিয়ে। এইটাই তো চেয়েছিলাম, একটা সুন্দর শান্তির সংসার।

আরও কিছুদিন পর – ছুটির দিনের এক পড়ন্ত বেলায় গিয়েছিলাম একটা শপিং-মলে। রঞ্জনাও সঙ্গে ছিল। হঠাৎ দেখি নিশা আর কিশোর। দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, আর কেউ সাথে নেই। ওরা আমাদের দেখতে পায়নি, আমিও দেখার চেষ্টা করিনি। প্রসাদ সঙ্গে থাকলে হয়তো করতাম। এ দৃশ্য কেন দেখলাম! না দেখলেই তো ভাল ছিল! ভারী মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। গল্পটা এখানেই শেষ করে দিলে হয়তো ভাল হতো, কিন্তু হ'ল না।

এর দু'বছর পর কোভিডের মহামারীতে অনেককিছু ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছি। জীবনযাত্রাও অনেকটা বদলে গেছে। অনেকদিন পর আমরা বেড়াতে গেলাম গোয়াতে। আমার পছন্দের জায়গা। সকাল-সন্ধ্যে বীচ-এ হাঁটতে যাই। ফিরে আসার আগের দিন হাঁটা শেষ করে রঞ্জনা ফিরে গেল ঘরে। আমি ভাবলাম আর একটু হাঁটি। গোধূলির রঙ সারা আকাশে। ঢেউয়ের আওয়াজেও কেমন যেন বিষণ্ণতা! পাখীরা দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে নিজেদের আস্তানায়। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমিও পা বাড়ালাম ঘরে ফিরে যাবার জন্য। হঠাৎ কানে এল একটি আওয়াজ – "স্যার", পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম নিশা দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে, সঙ্গে প্রসাদ। আবার নতুন করে অবাক হবার পালা। নিশা বলল যে ওরা পুনা ছেড়ে কোলাপুরে চলে গেছে কোভিডের পরেই। দুজনেই চাকরি বদলেছে। মেয়ে এঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়েছে, ফার্স্ট ইয়ার। হস্টেলে থাকে, "স্যার আপনার আশীর্বাদে আমরা খুব ভাল আছি। আর স্যার, কিশোরকে মনে আছে আপনার? ও এখন দুবাই-এ। ভাল চাকরি করছে। শুনেছি বিয়েও করেছে ওখানে। আমাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখে না।" দুজনের মুখেই পরম পরিতৃপ্তির হাসি।
- "তোমরা ভাল থেকো। যোগাযোগ রেখো।" বলে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।
আকাশে তখনও একটু লালচে আভা। ঢেউ এখন অনেকটা ধীর। স্মৃতিরা ভিড় করে আসছিল। মনও এখন শান্ত, পরিতৃপ্ত।

দাদাভাইয়ের ভূত হওয়া

রঙ্গনাথ

দাদাভাই শুনেছে, কোনভাবে একবার ভূত হতে পারলে পৃথিবী ছেড়ে আর যেতে হবে না। তাই তার একান্ত ইচ্ছা, সে ভূত হবে। সে ভূত হয়ে পৃথিবীতে থেকে যাবে। পৃথিবী তার খুব ভাল লাগে। তার মতে, পৃথিবী এত বিচিত্র যে এর সাথে অন্য কোনকিছুর তুলনা হয় না। অনেকে বিশ্বাস করে, স্বর্গে পুণ্যবানদের বাস আর নরকে পাপাচারীদের স্থান। পৃথিবী একটু অন্যরকম – এই দু'ধরনের লোকের সাথে মাঝামাঝি ধরনের যারা তাদেরও বাসস্থান এখানেই। সেই কারণে পৃথিবীকে একঘেয়েমির জায়গা বলা যায় না। মানুষের দোষ-গুণের বিচিত্রতা তাকে মুগ্ধ করে। এখান থেকে অন্য কোথাও সে যেতে চায় না। একেবারেই না। দাদাভাইয়ের চিন্তা, যেহেতু ভূতের মৃত্যু নেই, তাকে ভবিষ্যতে পৃথিবী ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না। যে বয়সে তার মৃত্যু হবে, সেই বয়সের ভূত হয়েই সে দিব্যি চলাফেরা করবে। ভূত হবার পর তার নাকি আর বয়সও বাড়বে না।

দাদাভাই মিথ্যা বলে না। সে ঘুষ খায় না। সে কাউকে ঠকায় না। কারো সাথে ঝগড়া করে না। সে কোন অন্যায় কাজ করতে চায় না বা কোন ব্যাপারে নাক গলাতে চায় না। কেউ তাকে গালিগালাজ করলে সে চুপচাপ থাকে। সে উপকার না করতে পারলেও অন্যের অপকার করে না। এমন লোককে ঈশ্বর স্বর্গে না পাঠালে কাকে সেখানে পাঠাবেন? যদি তার কোন দোষ না থাকে, ঈশ্বর কী কারণে তাকে শাস্তি পেতে নরকে পাঠাবেন? ঈশ্বর এতটা অবিচার করতে পারেন না! সে ভাবে, সে যেসব কাজ করেছে ও করছে, তাতে তার স্বর্গপ্রাপ্তি হওয়া উচিত।

দাদাভাই ভেবে দেখল, মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে কী লাভ! মোদ্দা কথা, দুঃখকষ্ট বাদ দিলে যেসব পৃথিবীতে পাওয়া যায়, সেসবই তো স্বর্গে মিলতে পারে। দুঃখকষ্ট আর কী এমন জিনিস যে তার জন্য ভূত হওয়ার সুযোগটি সে ছেড়ে দেবে? বর্তমানে সে দুঃখকষ্ট দেখে দেখে এত অভ্যস্ত যে এ ব্যাপারটা তাকে আর বিচলিত করে না। আশপাশের লোকেরাও দরিদ্র বা হতদরিদ্র লোকদের এড়িয়ে চলে। তাই ভূত হয়ে ওসব দেখায় তার আপত্তি নেই।

দাদাভাইয়ের দোষ বলতে একটাই। তার সাহস বড্ড কম। সে অনেকের কাছে শুনেছে, যতই গুণ থাকুক না কেন, যদি কারো সাহস না থাকে তাহলে তার দ্বারা সমাজের বড় একটা উপকার হয় না। তাকে ঈশ্বর পছন্দ করেন না, তার কথা শোনেন না ও তার দিকে তাকিয়েও দেখেন না। শুধু গুণ থাকলেই হয় না, যথেষ্ট সাহসও থাকতে হবে। কটু কথা বলা ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া মানুষের জন্য না হলেও চলে, তবে এটা ভূতেদের জন্য একান্ত কাম্য। অন্যায়-অবিচার দেখলে তার প্রতিবাদ করার সাহস অনেক মানুষ রাখে না। যেহেতু 'মানুষ' দাদাভাইয়ের সাহসে কিছু কমতি আছে, সেক্ষেত্রে ভূত হতে চাইলে এই দক্ষতা তাকে অর্জন করতেই হবে। দাদাভাই এটা বোঝে যে সাহস না থাকলে ভূত-পিচাশের মতো আচরণ করা যায় না। সেজন্য সে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী কাটখোট্টা এবং স্পষ্টবাদী। যেহেতু তার সাহস আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী, সে মনে করে যে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার যোগ্যতা তার দিন দিন বাড়ছে। তাই তার আশা পূরণেরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

কেন দাদাভাই ভূত হতে এত আগ্রহী? এর প্রধান কারণ মনে হয়, তার মানুষ হিসাবে কিছু জিনিসের উপর প্রভাব ফেলার চেষ্টায় ব্যর্থতা। একজন সৎ, ভদ্র, নীতিবান মানুষ হিসাবে চলতে গিয়ে সে যারপরনাই ঝামেলার মধ্যে দিন কাটিয়েছে। মানুষ তাকে নানাভাবে ঠকিয়েছে। যে কোনও কাজ করতে গেলে বার বার বাধা পেতে হয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ঘুষ দিতে হয়েছে, লোকে তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হেনস্থা করেছে। কোনও নিরীহ মানুষের হয়রানি রোধ করতে গিয়ে সে বেধড়ক মার খেয়েছে। এরকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে। তার মতো একজন ভাল মানুষের কাছে এসব মহা অন্যায়। জীবিত অবস্থায় এ ধরনের মন্দ ব্যাপারগুলোর প্রতিবাদ করা সম্ভবপর হয়নি, সেজন্য মৃত্যুর পর ভূত হয়ে কিছু একটা করতে চায়। ভূত হতে পারলে তার নাকি শক্তি বাড়বে। তার কাজে আলসেমি থাকবে না। তাকে মানুষের মতো অকাজ করে সময় নষ্ট করতে হবে না। তখন দিনরাত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তার একমাত্র কাজ হবে। সে ভাবছে সে চকিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সক্ষম হবে। এটা সম্ভব, কারণ মানুষ ভূত রূপান্তরের মাধ্যমে দেহহীন হয়ে প্রায় সবটা ওজন হারাবে। ইচ্ছামতো সবার অলক্ষে এখান থেকে সেখানে নিমেষে যেতে

পারবে।

দাদাভাই বুঝতে পারে, দেশে এখন ভূত নেই। মা-বাবারাই শুধু ভূত নামটি বাঁচিয়ে রেখেছে ছেলে-মেয়েদের একটু ভয়ে রাখার জন্য। তার মা-বাবাও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এখনও তার বিশ্বাস এককালে ভূত ছিল। ভূতেরা অন্যত্র পালিয়ে গেছে যখন মানুষ জাতি বড় বড় বৃক্ষ আর ঝোপ-জঙ্গল সাবাড় করে দিয়েছে। বলা যায় এটা যুদ্ধের সময়ে বোমাবাজির মাধ্যমে দেশ থেকে মানুষ তাড়িয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার। মানুষ যেমন শরণার্থী হয়ে অন্যত্র বাসা বাঁধে, ভূতেরাও অন্য কোথাও, যেখানে বিরাট বিরাট বৃক্ষ আছে বা পাহাড় জঙ্গল আছে সেখানে চলে গেছে। আমাদের দেশ থেকে যারা চলে গেছে তারা হয়তো বা কোনদিন ফিরবে না।

দেশে যেসব অনাচার, অত্যাচারসহ অজস্র মন্দ জিনিস মানুষ বন্ধ করতে পারছে না, দাদাভাই ভাবছে প্রতি মহল্লায় ভূত থাকলে সেসব বন্ধ করা সম্ভবপর হবে। এটা করতে পারলে ভূতের জন্য সমর্থন বেড়ে যাবে। লোকজন ভাববে দেশে ভূতের সংখ্যা বাড়ুক, যার ফলে তারা সুখ, শান্তিসহ নিরাপদে থাকতে পারবে। দাদাভাই বিশ্বাস করে দেশে ভূতের প্রয়োজন আছে।

দাদাভাই জেনেছে যে যারা অপঘাতে মারা যায়, তাদের পক্ষেই শুধু ভূত হওয়া সম্ভবপর। অপঘাতে মরণ হওয়াটা দাদাভাই পছন্দ করে না। সে স্বাভাবিক মৃত্যুর মাধ্যমে ভূত হতে চায়। এজন্য সে ঈশ্বরের কাছে আবদার করে রেখেছে এবং প্রতিদিন ঈশ্বরকে মনে করিয়ে দেয় তার যেন স্বাভাবিক মৃত্যু হয় এবং তা সত্ত্বেও সে ভূত হতে পারে। এই প্রার্থনা শুধু তার নিজের জন্য নয়; এ তার দেশ ও সমাজের জন্যও বটে। যদি ঈশ্বর এটি অনুমোদন করেন এবং চারপাশে জানাজানি হয়, তাহলে অনেকেই তখন ভূত হতে চাইবে।

আসল কথা, দাদাভাই চায় প্রতি দশ হাজার মানুষের জন্য একটি করে ভূত থাকুক। তাহলে প্রতি এক কোটি মানুষের জন্য এক হাজার ভূত দরকার হবে। ভূতেরা বিনা বেতনে কাজ করবে (বেগার খাটবে)। ভূতেরা নাকি ঘুমায় না; তাই সর্বদা সজাগ থেকে সবকিছু দেখাশোনা করবে। এরকম হলে ভূতেরা চুরি-বাটপারি-অনাচার-অবিচার-অন্যায়-দুর্নীতি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সহজে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে, যার ফলে দেশের প্রশাসনিক খরচও অনেক কমবে।

আগে উল্লেখ করেছি, ভূতেদের জন্য ঘন জঙ্গল বা বিরাট বিরাট বৃক্ষ অনেক অঞ্চলে নেই। ভূতের নিরাপত্তার জন্য এ ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার হবে। এক্ষেত্রে কেউ কিছু ব্যবস্থা না নিলে ভূতেরাই ভয় দেখিয়ে অথবা স্বপ্নাদেশ দিয়ে বাড়ি দখল ও গাছ দখল করে নিতে পারে। কিন্তু যেহেতু নতুন ভূতেরা সমাজ ও মানুষের উপকার করবে, সেই কারণেই হয়তো ভূতেদের এসব করার প্রয়োজন হবে না। ভূত ও মানুষ সমঝোতার মধ্যে বাস করতে পারলে সমাজের ভালই হবে। দাদাভাইয়ের কথা, ভূত ছাড়া আমাদের সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি, অবনতি কমানো বা নিরসন করা সম্ভব হবে না। মানুষের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা প্রতিনিয়ত কমে যাওয়াতে সমাজে ভূতের উপস্থিতি খুব জরুরী হয়ে পড়েছে।

বাবার গরু

রুমকি দাশগুপ্ত

গুজরাটের দুটি অনুন্নত গ্রাম; খাঁগেশ্রী ও পালিখদা | এখানে বিদ্যুৎ সংযোজন হয় নরেন্দ্র মোদির কৃপায় | প্রায় একশো বছর আগে শুরু হওয়া এই ঘটনাবলীর উৎস এই গ্রাম দুটি | মনকাড়া এই কাহিনীটির চরিত্রগুলি ভাষায় বাঁধতে গিয়ে বার বার ঠোক্কর খেয়েছি | বুঝেছি আরো তথ্যের প্রয়োজন | বার বার ফিরে গেছি সেই মানুষটির কাছে, যার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই গাঁথা আজ লেখার প্রচেষ্টা করছি |

মুক্তহস্তে তথ্য দিয়েছেন, আর একই কথা বার বার বলেছেন, এটা একটা অভিজ্ঞতা, ভাষায় একে বাঁধা খুব কঠিন | কিন্তু আমার নারাজ মন যুক্তি মানল না | চেষ্টা করেই ফেললাম এই কাহিনী নথিভুক্ত করার | তিন প্রজন্মব্যাপী এই গল্পের কোনও প্রধান চরিত্র নেই | এ কাহিনীতে সবার ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ |

মহাসরস্বতী নিরক্ষর | চন্দ্রকান্ত ভিয়াসের একমাত্র কন্যা | নিবাস খাঁগেশ্রী | বাপ-মায়ের আদরের দুলালী | চন্দ্রকান্ত-ভাইয়ের আরো মেয়ে সন্তান জন্মায় | কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শৈশব পার হওয়ার আগেই তারা মারা যায় | কিছু আত্মীয়-বন্ধুর মতে চন্দ্রকান্তভাই সৌভাগ্যবান | মেয়ে সন্তান মানেই তো বিবাহ পণ!

পালিখদা নিবাসী কান্টিভাই রাওয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাট্টুভাই খুব উদ্যোগী ছেলে | ইস্ট আফ্রিকার উগান্ডায় পাড়ি জমিয়ে সে জিঞ্জা নামক গ্রামে বসবাস শুরু করে | সেখানে পণ্যদ্রব্য ও পরিবহনের ব্যবসা বেশ ভালই দাঁড় করিয়েছে এই অল্প বয়সেই | পরিবহনের ব্যবসা বলতে, দুর্গম বনাঞ্চলে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করা | নাট্টুভাই ইংরেজি পড়তে পারে, হিসাবও রাখতে পারে খুব ভাল | পালিখদাতে মা-বাবাকে টাকাও পাঠায় নিয়মিত | ছেলের রোজগারের দৌলতে কান্টিভাইয়ের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য গ্রামবাসীদের তুলনায় ভাল |

কান্টিভাই নড়েচড়ে বসলেন | এবার ছেলের বিয়ে দিতে হয় | নাট্টুভাইয়ের বয়স পঁচিশ ছাড়িয়ে ছাব্বিশ ছুঁই ছুঁই | এদিকে মহাসরস্বতীর বয়স বারো পেরিয়েছে | চন্দ্রকান্ত যখন মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছেন, ঠিক তখনই সংবাদ পেলেন নাট্টুভাইয়ের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে | রাজগোর ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর পাল্টি ঘর | যথাসাধ্য যৌতুক দিতে চন্দ্রকান্ত রাজি |

এক কথায় বিয়ে হয় না | সেসবে আর গেলাম না | এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ছাব্বিশ বছরের নাট্টুভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তেরো বছর বয়স্ক মহাসরস্বতীর | চন্দ্রকান্ত মেয়ের বিয়েতে সাধ্যাতীত যৌতুক দিয়েছিলেন | বিদেশে ব্যবসারত সুপাত্র বলে কথা! শোনা যায় মহাসরস্বতীর পাওয়া যৌতুকে কান্টিভাইয়ের দুই মেয়ে পার হয়েছিল |

বিবাহ সেরে নাট্টুভাই ফিরে গেলেন জিঞ্জায় | নাট্টুভাই বিহনে ব্যবসা অরক্ষিত | বেশিদিন থাকার উপায় নেই | মহাসরস্বতী পদার্পণ করল পালিখদাতে, শ্বশুর গৃহে | টানা এক বছর শ্বশুর ঘর করল মহাসরস্বতী | শ্বশ্রূমাতার তালিমে হয়ে উঠল সংসারী, গৃহকর্ম নিপুণা, সুগৃহিনী |

সময় এল উগান্ডায় পাড়ি দেওয়ার | পরবাসে যাওয়ার আগে ছোট্ট মেয়েটির যে মা-বাবা-দাদাদের একবার দেখতে ইচ্ছে করতে পারে, সে কথা কারো মাথায় এল না | ভীত সন্ত্রস্ত মহাসরস্বতীকে জাহাজে তুলে দেওয়া হ'ল | দীর্ঘ যাত্রার পর ক্লান্ত, বিভ্রান্ত মহাসরস্বতী মুম্বাসায় এসে পৌঁছাল | সেখানে নাট্টুভাই অপেক্ষারত নববধূর জন্য | দুজনে ট্রেনে চড়ে বসল এবার | প্রায় চব্বিশ ঘন্টার মামলা, ট্রেনে করে মুম্বাসা থেকে জিঞ্জা পৌঁছাতে | গ্রেগরী আর ওয়েস্টার্ন রিফটের উপর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলল গন্তব্যের দিকে | তাতে মহাসরস্বতীর কিছুই আসল-গেল না |

স্বামীগৃহে পৌঁছে স্বামীর অধীন, বাধ্য, আজ্ঞাবাহী, মতামতহীন গৃহকর্ত্রী হয়ে উঠল | এক প্রকার গৃহবন্দী | বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ওর রাজ | বাড়ির বাইরে বেরোনোর কোনো প্রয়োজন বা প্রশ্নই ওঠে না | ভয়ানক মশার উপদ্রব এদেশে | ফি বছর ম্যালেরিয়া আর জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক জীবনের অঙ্গ | মহাসরস্বতী তার সংসার সামলায়, কোলে সন্তান আসতে শুরু হয় এক এক করে | তার প্রথম তিনটি সন্তান, একটি পুত্র ও দুটি কন্যা আড়াই বছর বয়সের মধ্যে মারা যায় | চতুর্থ এবং প্রথম জীবিত সন্তান বালমোহনভাই | বালমোহনভাই যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হতো, বা ওর পূর্বে জন্মানো ভাই বোনেদের মতো মারা যেত, তবে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, নাট্টুভাইকে বোধহয় আর একটা বিবাহ করতে হতো | মহাসরস্বতীর কোলমোছা মেয়ে সন্তানটিও আড়াই বছর

বয়সে মারা যায়। এই সন্তানের মাথার আকার ছিল কিয়দ বিকৃত; ওর সুস্থ বাচ্চাদের মাথার অর্ধেক মাপের। পরবর্তীকালে বালমোহনভাই অর্জিত বিদ্যার সমষ্টি থেকে অনুমান করে যে ছোট বোন এবং তার আগে জন্মানো তার তিন ভাইবোনের মৃত্যুর কারণ তার মায়ের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া।

মহাসরস্বতীর জীবন ও সংসার চলছে বাঁধা ছন্দে। জ্যেষ্ঠ সন্তান বালমোহনভাই তিন ক্লাস পাস করল। চার ক্লাসের বই কেনার আর্জি নিয়ে এল বাপুজীর কাছে। বাপুজীর সোজা উত্তর, পড়াশুনার কোনও প্রয়োজন নেই। ছেলে হিসেব রাখতে পারে, পড়তেও পারে খাসা। পড়াশুনায় সময় বা অর্থ ব্যয় না করে বাপের ফেঁপে ফুলেওঠা ব্যবসায় মনোনিবেশ করার সময় হয়েছে। বালমোহনভাই গোঁ ধরল চার ক্লাসে সে পড়বেই। সহায় হলেন কাকা, নাট্টুভাইয়ের এক বন্ধু। উপদেশ দিলেন ছেলেকে বই কেনার পয়সা দিয়ে দিতে। বন্ধুপুত্রকে শর্ত দিলেন ফেল করলে পড়া বন্ধ। নাট্টুভাই মেনে নিল বন্ধুর নিদান।

বাড়িতে পড়াশুনার আবহাওয়া নেই। বালমোহন-ভাইকে কখনো পড়া তৈরী করে ইস্কুলে যেতে দেখা যায়নি। মাস্টার রোজই ওকে ক্লাসের বাইরে বের করে দিতেন। কান ধরে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মাস্টারের পাঠ মন দিয়ে শুনত বালমোহনভাই। এভাবে কেমন করে যেন মোটামুটি নম্বর পেয়ে পাসও করে যেত পরীক্ষাগুলোতে। অগত্যা পিতা ফি বছর নতুন ক্লাসের বই কেনার পয়সা গোনে। আর ইস্কুল শেষে বিকেলে ছেলেকে দোকানে কাজ করতে বাধ্য করে। বড়ছেলে বলে কথা; পড়া রোগ না ছাড়ুক, ব্যবসা বুঝে না নিলে এ রাজ্যপাট কে সামলাবে নাট্টুভাই গত হবার পর!

নাট্টুভাই কয়েকবার দেশে ঘুরতে গেছে উগান্ডা থেকে। নিজের বাবা-মাকে নিয়ে এসে উগান্ডায় রেখেছে কয়েকবার। অথচ স্ত্রীর দেশে যাওয়ার কথা তার মনেও আসেনি কখনও। বালমোহনের তখন তেরো বছর বয়স; সে বাপুজীর সঙ্গে বেজায় ঝামেলা করে মাকে একবার দেশে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। বিবাহের তেইশ বছর পর এই প্রথম ও শেষবার মহাসরস্বতী পিতৃগৃহে বেড়াতে যায়। ততদিনে চন্দ্রকান্ত ও তাঁর বড়ছেলে গত হয়েছেন।

নাট্টুভাই স্বপ্ন দেখে ছেলেকে পাকাপাকিভাবে ব্যবসায় আনার। অথচ বালমোহনের মনে উঁকি দিলে দেখা যায় এক পুরোপুরি ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। সে স্বপ্ন দেখে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার; আমেরিকা বা ক্যানাডার কোনো কলেজে পড়াশুনা করার। মহাসরস্বতী ছেলের এই মনোবাঞ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ছেলে তাকে কোনোদিন সে কথা বলেনি, তবুও ছেলের মনের হদিশ সে পায়।

দেখতে দেখতে বালমোহন সিনিয়র কেম্ব্রিজের দোরগোড়ায় দন্ডায়মান। বাপুজী আদেশ দিল, অনেক হয়েছে। পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার পুরোপুরিভাবে ব্যবসায় যোগ দেওয়ার সময় আগত। সহায় হলেন আবার সেই কাকা। বললেন, "দিক পরীক্ষা। জিঞ্জানিবাসী কোনও ছেলেমেয়ে আজ অবধি সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় পাস করেনি, জানাই কথা বালমোহনও ফেল করবে। তবুও পরীক্ষায় বসার সাধটা তো মিটিয়ে নিক!"

যে মাকে দেখে বালমোহনের চিরটা কাল মনে হয়েছে যেন বাবার গোয়ালের আর একটি পোষা গরু; ওকে অবাক করে সেই মা এগিয়ে এল। ছেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল যে পরীক্ষা যখন দেবে বলেই মনস্থির করেছে, তখন যেন ঠিকমতো লেখাপড়া করেই পরীক্ষায় বসে। প্রতিশ্রুতি দিল, পাস করতে পারলে বালমোহনের কলেজে পড়ার স্বপ্ন মহাসরস্বতী মেটাবে। মায়ের কথায় বালমোহন খুব যে ভরসা পেল, তা নয়। তবুও খানিকটা মনোবল বাড়ল বৈকি।

এখানে বালমোহনভাইয়ের নাগরিকত্বের স্টেটাস নথিভুক্ত না করলে ওর জীবন কাহিনীর খেই হারিয়ে যাবে। সে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ভারতীয় বাবা-মায়ের সন্তান। জন্ম উগান্ডায়। ভারতীয় নাগরিক সে নয়। 'ডি' মার্ক পাসপোর্টধারী এক অতি নগণ্য থার্ড ক্লাস ব্রিটিশ নাগরিক। এই 'ডি' মার্ক পাসপোর্ট ওকে UK যাওয়ার ছাড়পত্র দিলেও ওদেশে পাকাপাকিভাবে বসবাসের থেকে বঞ্চিত করে। স্বভাবতই এই তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটি চিরটাকাল পরিচয় সংকটের শিকার ছিল।

কিন্তু, জিঞ্জাতে ইতিহাস লেখা হ'ল। বালমোহন সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করল। মায়ের আদেশমতো পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেওয়ায় পরীক্ষার ফলাফলও উত্তম হ'ল। আমেরিকা ও ক্যানাডার নানান উনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন পাঠানো শুরু হ'ল। নাট্টুভাই ঘোষণা করল, সে আর এ দুরাচার বরদাস্ত করবে

না | মহাসরস্বতী ফুঁসে উঠল | নাট্টুভাই স্তম্ভিত! স্ত্রীর এ কী রূপ দেখছে সে! বালমোহনভাইও অবাক | মা তো ছিল যথার্থই বাবার পোষা গরুর মতো | কিন্তু এ তো গরু নয়! এ যেন শাবকের বিপদে ফুঁসেওঠা মারমুখী সিংহী | মহাসরস্বতীর বক্তব্য, ছেলের যখন ইচ্ছা, তখন কলেজে ও পড়বেই | সংসারের অবস্থা বেগতিক | এ ফাঁপরে নাট্টুভাই আগে কখনো পড়েনি | তারই ভুল, সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষার পর ব্যবসায় কাজ করার জন্য তো ছেলেকে নাট্টুভাই-ই ক'মাস টানা মাইনে দিয়েছে | আমেরিকায় যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ২৬৮ পাউন্ড আছে বালমোহনের | একবার ওখানে পৌঁছাতে পারলে যে করেই হোক পড়ার খরচ সে জোগাড় করে নেবেই | নাট্টুভাই বেকায়দায় পড়ে স্ত্রী ও ছেলেকে বলে আমেরিকায় না গিয়ে বালমোহন যদি ভারতের কলেজে পড়ে, তাহলে ছেলের পড়ার সমস্ত খরচ বহন করতে সে রাজি | তাছাড়া মনে মনে ভাবে, বিগড়ে যাওয়া এই ছেলে আমেরিকায় গেলে না জানি আরো কত বিগড়াবে |

বালমোহন বাপুজীর কথায় রাজি হ'ল | বম্বে ইউনিভার্সিটির Saint Xavier's কলেজে মাইক্রো-বায়োলজিতে অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়তে ভর্তি হ'ল | কলেজে পড়াকালীন বালমোহনের এনসিসিতে যোগ দেবার শখ হয় | ভারতীয় নাগরিক না হওয়ায় ওর সে সাধ মেটেনি | এনসিসিতে যোগ দেবার জন্য ভারতীয় নাগরিক হতে হয় |

নাট্টুভাই কোনোদিনও এ ছেলেকে পুরোপুরি বাগ মানাতে পারেনি | এবারেও পারল না | যথাসময়ে বিএসসি পাস করে সহপাঠিনীর হাত ধরে উচ্চতর শিক্ষার্থে বালমোহন চলে গেল আমেরিকায় | সহপাঠিনীকে বিবাহ প্রস্তাব দিল | সহপাঠিনী বিবাহে রাজি, কিন্তু একটি শর্তে | সে উগান্ডায় বসবাস করতে নারাজ | এ তো বালমোহনের মনেরও কথা! পারিবারিক ঐতিহ্য আর একবার লঙ্ঘন করল বালমোহন | কোথায় জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়ে রাজগোর গুজরাটি ব্রাহ্মণ বিয়ে করবে, তা না, বিয়ে করল এই অজ্ঞাতকুলশীল দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েটিকে |

প্রসঙ্গত, অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহাসরস্বতীর প্রতিটি জীবিত সন্তান আজ উচ্চশিক্ষিত, সুপ্রতিষ্ঠিত | পাশ্চাত্যের নানা দেশের বাসিন্দা তারা |

বীতশ্রদ্ধ নাট্টুভাই পরাজিত | ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরবে ভাবছে, এমন সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত হয় | জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর মুখ দেখবে না ঠিক করেছিল | খেলার এই রাউন্ডটায় মাত করে গেল সে |

সন্তানরা পরামর্শ করে, উগান্ডার ব্যবসা বিক্রির সব টাকা মহাসরস্বতীর নামে করে দেয় | ভাগ্যিস! নইলে নাট্টুভাইয়ের কষ্টার্জিত অর্থ ইদি আমিনে তলিয়ে যেত |

মহাসরস্বতী শেষ বয়সটা সন্তানদের কাছে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেয় | আজ আশি উর্ধ্ব বয়সে বালমোহনভাই বলে তার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ইউনাইটেড কিংডমে গিয়ে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য 'জিঞ্জারত্ন' পদকে ভূষিত হওয়া |

পঞ্চাশ বছরের উপর হয়ে গেল ডাক্তার বালমোহনভাই রাওয়াল আমেরিকান নাগরিক | মনে-প্রাণে আমেরিকান এই মানুষটিকে একমাত্র এই দেশই মুক্ত আলিঙ্গনে স্বীকৃতি দিয়েছে | তাই তার বাড়ির সামনে ৪ঠা জুলাইতে প্রমাণ সাইজের পতাকা ওড়ে এক সপ্তাহ ধরে | বাড়িতে ধুমধাম করে খ্রীষ্টমাস পার্টি হয় | সেই পার্টিতে তার সন্তানরা পিয়ানো সহযোগে খ্রীষ্টমাস ক্যারল গেয়ে শোনায় অতিথিদের |

বালমোহনের বক্তব্য এক কথায় তার জীবন আজ পূর্ণতাপ্রাপ্তি পেয়েছে |

শিল্পী: শিরিন মিত্র (বয়স ১১)

বাবা, তোমার জন্য...

অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

মধ্যরাত হতে তখনও এক প্রহর বাকি | দূরের আকাশে কিছু তারা জ্বলছে আর নিভছে অনন্ত চরাচরব্যাপী এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা; তারই মধ্যে খুব শান্ত এক ঠিকানায় তিনজনের অবয়ব ফুটে উঠল| খুব চেনা, খুব কাছের... কিন্তু তাদের ছুঁতে পারলাম না| মেজদাজ্যেঠু যথারীতি গা এলিয়ে একটা বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে, বড়দাজ্যেঠু গুনগুন করে একটা প্রিয় গানের সুর ভাঁজছে... মামনি পাশে বসে ভীষণ পরিতৃপ্তি নিয়ে চোখ বন্ধ করে শুনছে গানের কথাগুলো|

"कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं
वो हजारों के आने से मिलते नहीं
उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम
वो फिर नहीं आते..."

হঠাৎই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ – ভেজানো পাল্লাগুলো ঠান্ডা হাওয়ায় খুলে গিয়ে এক ছায়ামূর্তির প্রবেশ| রোগা, ছোট্টখাটো একটা শরীর, মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় এক অদ্ভুত প্রশান্তির হাসি ঝুলে আছে ঠোঁটের ফাঁকে|

তিনজনেই সমস্বরে বলে উঠল "বাবলু এলি?"

বাবা,

অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু শব্দগুলো কান্নার মতোই গলার কাছে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে | আমি কিন্তু ভেঙে পড়িনি বাবা, চোয়াল শক্ত করে চেষ্টা করেছি তোমার শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে | এবার যখন হায়দরাবাদ এলে, তোমায় কথা দিয়েছিলাম আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে একটা ছোট মফস্বল শহরে থেকেও তোমার দেহদানের অঙ্গীকার রাখতে পারি | তোমাকে আমরা শেষবারের মতো ছুঁয়ে দেখতে পারিনি, কিন্তু যখন ভিডিও কলে তোমার মুখটা ভেসে উঠল, তোমার মুখের সেই প্রশান্তি আমার ক্ষতে শেষ অবধি মলম লাগিয়ে যাবে|

চিরকাল এক অদ্ভুত ব্যতিক্রমী জীবন কাটিয়েছ তুমি; তোমার ইচ্ছে, শখ-শৌখিনতা, মানসিকতা ছিল ভীষণ গ্লোবাল, আধুনিক; তাই চলে যেতে যেতেও তুমি আর একটা pathbreaking কাজ করে গেলে | সজ্ঞানে নশ্বর দেহের মায়া কাটানো সহজ নয়... কিন্তু তোমার জেদ ও ভাল কিছু করার খিদে ছিল সবকিছুর উর্ধ্বে | চারিদিকে কত মানুষ দাঁড়িয়ে যখন চোখের জলে বিদায় জানাচ্ছিল তোমায়, যখন বলা হচ্ছিল তোমার মহান আত্মত্যাগের কথা, তখন বুঝলাম, একজন মানুষ যখন তাঁর সব বন্ধন ছিন্ন করে পাড়ি দেয় অমৃতলোকের সন্ধানে তখন বোধহয় তাঁকে সঙ্গ দেয় শুধুমাত্র তাঁর কর্মফল| ইলেক্ট্রিক চুল্লি নয়... মেডিকেল সায়েন্সের রিসার্চ হবে তোমার রেখে যাওয়া শরীর নিয়ে, তোমার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে! আমি জানি তুমি ভীষণ শান্তি পেয়েছ বাবা | কত মানুষ তোমায় দেখতে এল, কত গল্প শুনলাম তোমার... এত বর্ণময় একটা জীবন – ভাল ব্যবহার, সহানুভূতি, আন্তরিকতা, আর ভালবাসা – কত বড় সম্পদ অর্জন করে গেলে বাবা...

সত্যি জীবনটাকে উদযাপন করতে পেরেছিলে তুমি! মানুষের পাশে দাঁড়ানো ,অবারিতভাবে দিতে পারার ক্ষমতা, স্মৃতিগুলো সযত্নে গুছিয়ে রাখা, আরো কত কী – তুমি সত্যি অনন্য ছিলে! কত অদ্ভুত মজার অভ্যেস ছিল তোমার – ডিটেলসসহ সমস্ত সিনেমার নাম লিখে রাখতে; কয়েন, ডাকটিকিট, পেপার কাটিং, ফোটোগ্রাফস এমনকি ট্রেনের টিকিটও জমিয়ে রাখতে তুমি | একটা অভ্যেস জীবনভর সমান নিষ্ঠার সাথে চালিয়ে যেতে কঠিন সংকল্প লাগে... কীভাবে এত দৃঢ়তা পেতে তুমি, বাবা? তোমার চশমাটা মুছে শেষবারের মতো খাপে ঢুকিয়ে রাখলাম, ফোনটায় চার্জ দিলাম, গামছাটা ভাঁজ করে আলমারিতে গুছিয়ে রাখলাম, তোমার মতো পরিপাটিভাবে কিছুই পারিনি তবু তুমি খুশি হবে জানি|

তোমার কাজের টেবিল, ডায়েরির হাতের লেখা, বাজারের ব্যাগ, সাইকেলের চাবি, বইয়ের আলমারি, রেডিও-রেকর্ড প্লেয়ার-ক্যাসেটের সারি, অসংখ্য ফটো অ্যালবামের ভিড়, চৌকির বসার জায়গা, আনন্দবাজারের লাইন... কোথায় নেই তুমি, বাবা? আমার সমস্ত লেখা পড়ে তুমি মতামত জানাতে হোয়াটস্-অ্যাপ করে, ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে| আজ যখন তোমায় নিয়ে এরকম এলোমেলোভাবে লিখছি তুমি পড়ছ তো? কতকিছু নিয়েই মান-অভিমান হতো, তর্ক হতো আবার ফোন করলেই বলতে, "কী খবর তুলিবাবু,বলে ফেলো"|আর তো তোমার নম্বরটা আমার স্ক্রীনে ভেসে উঠবে না – এটা মেনে নেওয়া ভীষণ কঠিন গো! মনের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যথা ঝিরিঝিরি ইলশেগুঁড়ি হয়ে অবিরত ঝরে পড়ছে; একে একে থেমে যাচ্ছে

কাছের মানুষগুলোর রিংটোন, বুক খালি করে পড়ে থাকছে শুধু তাদের গল্পগুলো।

কথা হয়তো আর হ'ল না, কিন্তু তোমার সাজানো বাগানে দাঁড়িয়ে সকালের রোদের সাথে প্রণাম পাঠিয়েছি। তোমার ফোটানো ফুল, বইয়ের পঙক্তি, নারকেল তেলের গন্ধে তোমাকে খুঁজে নিয়েছি। এভাবে খুঁজে নেওয়ার পথটা তুমিই শিখিয়ে দিয়েছিলে, তাই তো আর হারানোর ভয় পাই না। "ওষুধগুলো সময়মতো খেয়ো" বলার প্রয়োজন আর নেই। আমি জানি তুমি ভাল আছ।

এক অতুল স্নেহের ঋর্ণার উৎসমুখ শুকিয়ে যাওয়া বড়ই যন্ত্রণার, আবদার করার জন্য কাউকে কাছে না পাওয়াটা ভীষণ শূন্যতার; তবু মাঝে মাঝে খুব দেখতে ইচ্ছে করলে স্বপ্নে দেখা দিও বাবা, মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিও। আগলে রেখো এভাবেই। আবার দেখা হবে বাবা। ততক্ষণ সেই দূরের ঠিকানায় অপেক্ষা কোরো।

শ্রী অসিত কুমার রায়
জন্ম তারিখ - ১৭/১০/১৯৪৪
প্রয়াণ দিবস - ১৯/১১/২০২১

N - পাঞ্চাল

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

সন্তানদের নিয়ে জীবনের অনেক ঘটনাই ভোলা যায় না। আর যদি সেইসব ঘটনা সন্তানদের কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানকে ঘিরে হয়, তাহলে সে ঘটনা চিরদিনের জন্য মনে গেঁথে থাকে।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের বড় ছেলে, ঋজুর (ছেলেকে আমরা ওই নামে ডাকতাম) অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয় আমাদের গ্রামের বাড়ী, হুগলী জেলার শান্তিপুরে। তখন আমরা গুজরাটের আঙ্কলেশ্বরে থাকতাম। ওর ছোটবেলার মুহূর্তগুলো ধরে রাখার জন্য আমরা Kodak Kroma বলে একটা ক্যামেরা কিনেছিলাম। তখনও ডিজিট্যাল ছবির যুগ শুরু হয়নি। Kodak-এর film লোড করে, ছবি তুলে সেগুলো Kodak Lab-এ প্রিন্ট করাতে হতো। একটা film থেকে প্রায় ৩৫ থেকে ৩৬টা ছবি প্রিন্ট হয়ে আসত, এবং ছবির গুণগত মান বেশ ভালই হতো। ঋজুর অন্নপ্রাশনের সব ছবি তুললাম সেই Kodak Kroma ক্যামেরাতে। একটা নতুন film-roll শেষ হয়ে গেল।

ঋজুর অন্নপ্রাশনের পর আমরা আঙ্কলেশ্বরে ফিরলাম; সঙ্গে exposed film-roll ও ক্যামেরা। আঙ্কলেশ্বরে Kodak-এর দোকান থেকে প্রিন্ট করাব ভেবে ফিল্মটা অফিসে নিয়ে গেলাম। আমি তখন United Phosphorus Ltd. (UPL)-এ R&D-তে Sr. Process Engineer, সবেমাত্র কয়েক মাস হয়েছে join করেছি। সেই lab-এ অনেক Scientists-রা বরোদা বা সুরাট থেকে দৈনিক আসা-যাওয়া করত; আঙ্কলেশ্বরের অনেক কিছুর সঙ্গেই নতুন পরিচিতি হচ্ছে। Colleague-দের জিজ্ঞেস করলাম আঙ্কলেশ্বরের কোথায় Kodak film প্রিন্ট করা যাবে। নবীন পাঞ্চাল বলে আমার এক colleague বরোদা থেকে আসত; সে বলল তাকে ফিল্মটা দিতে, কারণ তার বাড়ীর পাশেই নাকি Kodak-এর ল্যাবরেটরি। আমি আর চিন্তা না করেই নবীনকে ফিল্মটা দিয়ে দিলাম। ভাবলাম ভালই হ'ল, আঙ্কলেশ্বরের থেকে বরোদা অনেক বড় শহর, কাজেই ছবির মান আরও ভাল হবে। বাড়ী ফিরে বললাম সেই কথা।

সপ্তাহখানেক পর নবীনকে জিজ্ঞেস করলাম ছবি কবে পাব। সে বলল বাড়ীর কিছু কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত আছে, দু-এক দিনের মধ্যেই lab-এ দেবে। পরের সপ্তাহে আবার জিজ্ঞেস করাতে, নবীনের একই উত্তর পেলাম। এরকম করে যখন প্রায় মাসখানেক অতিক্রান্ত, বাড়ীতে আমরা ছবি দেখব বলে রীতিমতো উদগ্রীব হয়ে আছি, তখন একটু রাগের সঙ্গেই ওকে আবার ফিল্মটার কথা জিজ্ঞেস করলাম। এরপর ও যা বলল, তা শোনার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। ও বলল, ফিল্মটা কোথায় রেখেছে সেটা নাকি আর খুঁজেই পাচ্ছে না। উত্তরে আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। ঋজুর অন্নপ্রাশন আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অনুষ্ঠান। তার সব ছবি দেখব বলে অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষায় আছি – আর সে বলে কিনা ফিল্মটা খুঁজেই পাচ্ছে না! বুঝতে পারছি আমার চোখ মুখের অভিব্যক্তি দেখে নবীন একটু অস্বস্তিতে পড়েছে; বলল, বাড়ী গিয়ে আবার ভাল করে খুঁজবে। কিন্তু সে সেই ফিল্মটা আর খুঁজেই পেল না!

আমরা আফশোষ করা ছেড়ে নিজেদের দুর্ভাগ্য বলেই সব মেনে নিয়েছিলাম। তার কিছুদিন পর, সম্ভবত ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে নবীন UPL ছেড়ে নতুন চাকরি নিয়ে বরোদায় ফিরে গেল। আর আমরা ১৯৯৮ সালের জুন মাসে আঙ্কলেশ্বর ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলাম, Nicco Projects Ltd.-এ নতুন চাকরি নিয়ে।

তার পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে, গুজরাটের ভারুচে শহরে (আঙ্কলেশ্বর আর বরোদার মাঝামাঝি আরেক industrial শহর) গেলাম কয়েক মাসের জন্য। Birla Copper-এর Phosphoric Acid প্ল্যান্ট commissioning-এর কাজ।

Control Room-এ সেই প্ল্যান্টের এক operator, অতুল আমায় একদিন জিজ্ঞেস করল আমি নবীন পাঞ্চাল বলে UPL-এর কাউকে চিনি কিনা। নবীনের নাম শুনেই মাথার মধ্যে একরাশ রাগ-মিশ্রিত দুঃখ ও বিরক্তি ফিরে এল। আমি "হ্যাঁ চিনি" বলে সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলাম। সে আমার হাবভাব ভ্রূক্ষেপ না করে বলেই চলল যে নবীন Birla Copper-এর Laboratory-তে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছে কিছুদিন হ'ল। আমি প্ল্যান্ট commissioning-এর কাজে সেখানে এসেছি জেনে, আমার খোঁজ নিয়েছে। আমি "ও, আচ্ছা" বলে, Control Room থেকে বেরিয়ে গেলাম।

আবার ক'দিন পর অতুল বলল নবীন নাকি এবার আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমি সেকথা শুনে আবারও নিরুত্তাপ! মনে মনে ভাবছি – সে যতই হন্যে হয়ে আমায় খুঁজুক, আমার তার সাথে দেখা করার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই। তিন বছর আগেকার সেই অব্যক্ত দুঃখ আর মনে করতে চাই না; একেবারেই না।

পরের সপ্তাহে অতুল একটা প্যাকেট আমার হাতে দিয়ে বলল ওটা নাকি নবীন আমায় দিয়ে গেছে। আমি একটু তাচ্ছিল্যভরেই সেই প্যাকেটটা নিয়ে অফিসের ব্যাগে রেখে দিলাম। প্ল্যান্ট থেকে গেস্ট হাউসে ফিরে, কী মনে হ'ল প্যাকেটটা খুললাম। খুলে দেখি কিছু printed ছবি। একটু ভাল করে দেখে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ! দেখি সেই তিন বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ঋজুর অন্নপ্রাশনের সব ছবি! এক অপূর্ব আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনায় মন ভরে রইল। গুনে দেখলাম ৩৬-টা ছবিই print হয়ে এসেছে।

পরের দিন প্ল্যান্টে নবীনের lab-এ গিয়ে মহানন্দে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার কৃতজ্ঞতার কথা জানালাম। ওর চোখে-মুখে তখন দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার প্রায়শ্চিত্তের প্রশান্তি। ফিল্মটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাতে ও জানালো ওদের নতুন বাড়ীতে shift করার সময় ও প্রায় ৫-৬টা পুরনো exposed ফিল্ম খুঁজে পায় এবং সবগুলোই lab-এ print করাতে দেয়। প্রিন্টেড ছবি বাড়ীতে এনে দেখতে গিয়ে একটা প্যাকেটের অচেনা অজানা ছবি দেখে ওর মনে পড়ে আমার দেওয়া সেই হারিয়ে যাওয়া ফিল্মের কথা। আর আমি একই প্ল্যান্টে commissioning-এ এসেছি জেনে, হারানো ছবি ফিরিয়ে দেবার সুযোগ ছাড়তে চায়নি ও। ছবি print করানোর খরচ দিতে চাওয়ায় ও কোনভাবেই তা গ্রহণ করল না।

মনে মনে ভাবলাম জীবনে ভাল-লাগার স্মৃতি কখনোই হারায় না। সময় সময় সেগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে আবার বাস্তবে ফিরেও আসে।

প্লিজ আমাকে একটা পাপি এনে দাও

মৃণাল চৌধুরী

অতীশ ও কুন্তলার ছোট ছিমছাম সাজানো সংসার | অতীশ শান্তশিষ্ট গোবেচারা ধরনের | কুন্তলা একেবারেই উল্টো | সংসারটা মোটামুটি কুন্তলার হাতের মুঠোয় | সেখানে আছে তাদের একমাত্র কন্যা দিয়া | ডাকে মোমো বলে | ফুটফুটে | বয়স ছয় | অতীশের ভালবাসামাখা গভীর চোখদুটি মেয়ে পেয়েছে | আর মা কুন্তলার রূপের ছোঁয়া তার শিশু শরীরে ছাপ ফেলতে শুরু করেছে |

বাবা-মেয়ের প্রতিটি মুহূর্তে অতীশ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে সে কী চায় | বাবার গলা জড়িয়ে মাঝে মাঝে বলেও দেয় মেয়ে | অতীশ জানায় বউকে | কুন্তলা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় | বউয়ের ব্যক্তিত্বকে সে কোনদিনই ম্যানেজ করতে পারেনি | ইউনিভার্সিটিতে দু'বছরের জুনিয়র দাপুটে, রূপসী কুন্তলা হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা সব ছেলেদের বুকের ওপর দিয়ে হার্টব্রেক এক্সপ্রেস চালিয়ে কেন তার হাত ধরেছিল সে রহস্য বিয়ের অনেক পরে বোধগম্য হয়েছে | পরস্পরের কাছে ওরা কুন্তী ও অতি | দুজনেই চাকরি করে | ততদিনে মোমো পৃথিবীতে আসার লক্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কুন্তলার শরীরে | সৌম্য দর্শন, শান্ত অতীশকেই দরকার ছিল নিয়ন্ত্রণ পিপাসী কুন্তীর | রহস্য আবিষ্কারের আনন্দে ওদের রসায়নে নিয়মের বিরল ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বউকে চুমু খেয়েছিল অতীশ |

স্কুল থেকে ফিরে অনেকটা সময় মোমোকে একলা কাটাতে হয় | বিকেলও প্রায় সঙ্গীবিহীন | মাইনে করা সঙ্গী অবশ্য একজন আছে, সারাদিনের কাজের বউটি | তার ছেলেপুলে হয়নি | সেও থেকে থেকে মনমরা হয়ে থাকে | মোমোর তখন কিচ্ছু ভাল লাগে না | সে যা চায় বাবাকে বলেছে অনেকবার, মাকে বলতে পারেনি | মাকে সে ভয় পায় | মোমো জানে, নিজের কানে শুনেছে তার আবদার নিয়ে বাবা মাকে বলছে, "প্লিজ কুন্তী, তুমিও তো জানো মেয়েটা কত একলা!"

ছোট মোমো বোঝে বাবাও তার চাহিদার ভাগীদার | চাহিদা একটা ছোট্ট ভাই বা বোন | কিন্তু মা নারাজ | তাতে নাকি বিস্তর ঝামেলা |

পুজো আসছে | মা শপিং শুরু করবে | বাবাকে শুনিয়ে যাচ্ছে তালিকা | বাবা চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনে যাচ্ছে | হয়তো বা শুনছেও না | কারণ বাবা জানে এসব নিয়ম রক্ষার খাতিরে তাকে শোনানো | মা যেমন সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে শেষ কথা |

হঠাৎ মায়ের চোখ পড়ে মেয়ের দিকে | মেয়ের মুখটা শুকনো, ঈষৎ বিষাদময় | কুন্তী আত্মজাকে কাছে টেনে নেয় | চুমু খায় | আদর করে খানিকটা সময় নিয়ে | তারপর মেয়েকে মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করে, "আমার মোমো সোনা, কী হয়েছে তোমার! মায়ের ওপর রাগ!"

মেয়ে চোখ সরিয়ে নেয় | কুন্তী বলে, "সোনা, বল আমায় কী হয়েছে, কী চাই তোর!"

মোমো এবার একদৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকায় | তাকিয়েই থাকে; গভীর চোখদুটো জলে ভরে উঠতে থাকে | সে শুধু ভেজা গলায় বলে, "প্লিজ মা, আমাকে একটা পাপি এনে দাও | আমি ওর সাথে খেলা করব | কুকুর আমার খুব ভাল লাগে |"

এর বেশি আর কিছু বলতে পারে না সে | তার গলা ডুবে যায় বুক উপছানো কান্নায় |

রীল কী বাত

কল্যাণী মিত্র ঘোষ

"আজকাল আর ফেসবুকে ঢুকতে ইচ্ছে করে না রে", বলল সুপ্রভা। বন্দনা অবাক হয়ে বলে, "ওমা, কেন রে? আমার তো সকাল বিকেল ঢুঁ না মারলে চলেই না, সবসময় আপ-টু-ডেট থাকি। খবরের কাগজ পড়ার দরকারই পড়ে না, সব খবর এমনিই হাওয়ায় উড়তে উড়তে এসে নাকের ডগায় ঝুলতে থাকে। কী ভাল! নইলে খবরের কাগজ কেনো রে, টিভির চ্যানেল ঘোরাও রে, গুগল করে জানো রে, হাজার হ্যাঙ্গামা!"

সুপ্রভা অর্থাৎ সুপি বলে ওঠে, "আরে, ওই রীলের উৎপাতেই তো আমি ফেসবুকে ঢোকা বন্ধ করেছি! ভগবান জানে কবে কী কুক্ষণে কোনো একটা রীল হয়তো দু'মিনিটের একটু বেশী দেখে ফেলেছি, অমনি একী কান্ড, আমি নাকি তার ফলোয়ার হয়ে গেছি! একদিন আমার নিজের প্রোফাইল ডিটেইলস ঘেঁটে দেখি আমি নাকি পাঁচশো জনকে ফলো করি! আরে, আমি তাদের চিনিও না, ও মাগো, সেই লিস্টে দেখি কেয়াবৌদিও রয়েছে! ছি ছি ছি, লজ্জায় মাথা কাটা যায় আর কী!"

- "বলিস কীরে, শেষে কেয়াবৌদি? হ্যাঁ?"

- "আরে, কোনো বন্ধু বোধহয় আমাকে মেসেঞ্জারে ওর বিখ্যাত ভিডিওটা ফরোয়ার্ড করেছিল; আর আমিও সেটা কৌতূহল-বশত ক্লিক করে ফেলেছিলাম, সেই থেকেই হবে হয়তো!"

সত্যি বাবা, এই রীলের জন্য মানুষ আর বই পড়ছে না, লেখালেখি প্রায় উঠেই যাচ্ছে, ভয়ানক মেকআপ করছে মেয়েরা, ছেলেরা হাতের গুলি পাকিয়েই চলেছে, আর হ্যাঁ, সকলেই কম-বিস্তর রীল বানিয়ে ফেলছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে তো এই রীল উপার্জনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর কী সব বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি, ধারণাই করা যায় না। কারোর চানঘর থেকে আরেকজনের রান্নাঘর। সেলিব্রিটি কারোর বিয়ে হ'ল তো সেই নিয়েই চর্চা চলল দু'সপ্তাহ। আর কেউ মারা গেলে শ্মশানে তাঁদের মৃতদেহের ক্লোজ-আপ ও প্রিয়জনের হাহাকারে হাজার হাজার লাইক। মানুষ সবতাতেই খুঁজছে এন্টারটেইনমেন্ট। কোনো কিছুই আর গোপন বা একান্ত নিজস্ব নেই।

সুপ্রভাদের ছেলেমেয়েরা আবার ফেসবুক করে না, বলে ওটা 'ওল্ড পিপলদের জন্য।' ওরা করে স্ন্যাপ চ্যাট, সেখানে পরস্পরকে করা মেসেজ আপনি আপনি উধাও হয়ে যায়। মা-বাবার হাতে ফোন চলে গেলেও ধরা পড়ার ভয় নেই। ওদের দুজনের মেয়েই ক্যালিফোর্নিয়ার একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ছে। দুই মা-ই জানতে উদগ্রীব মেয়েরা প্রেম -টেম করছে কিনা। কেউ কারোর মেয়ের সম্পর্কে এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলেই অন্যকে জানিয়ে দিতে পরস্পরের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

সুপ্রভার মেয়ে রিমি আর বন্দনার মেয়ে আদ্রিতা। ওদেরও খুব ভাব। ভারতীয় খুব একটা নেই ওদের স্কুলে, তাই একে অন্যের ঢাল হয়ে রয়ে গেছে ওরা। ওদের দেখে অনেকেই মেক্সিকান বলে ভুল করে, আর ওরাও ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। ভেতরের খবরটা হ'ল দুজনের কারোরই বয়ফ্রেন্ড নেই আর তেমন ইচ্ছেও নেই। রিমি বলে, "উফ এই প্রেম নিয়ে সব কী ন্যাকামোটাই না করে, আবার দুদিন পরে দেখ ব্রেক-আপ, অ্যান্ড অ্যানাদার বয়ফ্রেন্ড!"

আদ্রিতা বলে, "বয়েজ আর ক্রেজি! আমার তো মনে হয় সবাই উইয়ার্ড!"

হাহা করে হাসে দুজনে। ওদের বন্ধুত্ব খুব মজবুত। পড়াশোনাতেও বেশ ভাল দুজনেই। এবার সিনিয়র ইয়ার শেষ করে আগামী বছর ওরা কলেজে ভর্তি হবে। কে জানে, কে কোন কলেজে সুযোগ পাবে। রিমি ভলিবল খেলে আর আদ্রিতা স্পোর্টসের ধারে কাছে নেই, তবে কইয়ে বলিয়ে। এখন, ওরা বয়ফ্রেন্ড করতে না চাইলে কী হবে, বয়রা তো ওদের ফ্রেন্ড হতে চায়। সে ওরাও ছেলেদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে ঠিকই কিন্তু এরচেয়ে বেশী কিছু নয়।

সারা স্কুলে এই দুই শ্যামলা মেয়ে আর তাদের ঘন কালো রেশমের মতো চুল বেশ বিখ্যাত। কিছুদিন হ'ল ওদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একটা গেম খেলবে ঠিক করল। যারা যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে চায় তারা সকলে দশ ডলার করে চাঁদা দিল, প্রায় হাজার ডলার মতো চাঁদা উঠল। খেলার নিয়ম হ'ল, প্রত্যেকে একটা করে জল ছোঁড়ার পিচকিরি কিনবে, আর হাতে পরে থাকার জন্য এক ধরনের হাওয়াভরা টিউব বা ফ্লোটিস। কেউ যদি অন্যকে ফ্লোটিস না পরে থাকা অবস্থায় জল ছুঁড়ে মারে তাহলে সে মরে যাবে অর্থাৎ আউট হয়ে যাবে। এইভাবে

আউট হতে হতে যে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে সে ওই হাজার ডলার জিতে নেবে।

দু'সপ্তাহের মধ্যে ফটাফট অনেক ছেলেমেয়ে আউট হয়ে গেছে। একেকজন তো টার্গেটদের বাড়ি অবধি ধাওয়া করছে। তিনদিন আগে বন্দনা বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দেখে পাশের ঝোপটা কেমন নড়ছে। একটু ভয়ই পেয়েছিল সে, এদেশে তো দুমদাম গুলিগোলা চলে, ও যখন "হু ইজ দেয়ার" বলে চেঁচিয়ে উঠেছে, তখন ঝোপ থেকে দুজন সোনালী চুলের কিশোর উঠে দাঁড়ায়, দুজনের হাতেই জলের বন্দুক। প্রথমে চমকে গিয়েছিল বন্দনা, তারপর জোরে হেসে ফেলে, "গ্যারি, হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার?"

গ্যারি বলে, "উই আর হিয়ার টু কিল আড্রিটা!"

কোনোরকমে হাসি চেপে বন্দনা বলে, "কিন্তু আমি তো তোমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারব না!"

- "প্লীজ ম্যাম!"

- "আরে আমার মেয়েকে তোমরা মারবে, আর আমি তোমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেব, তা তো হবে না!"

এই খেলার নিয়মে আবার জোর করে কারোর বাড়িতে ঢোকা যাবে না, অভিভাবককে পটিয়ে অথবা না জেনে যদি তাদের বাড়িতে ঢুকিয়ে দেন তখনই তারা বাড়ির ভেতর ঢুকে টার্গেটকে মারতে পারবে। সেদিন প্রায় ঘন্টাখানেক ছেলেদুটো ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করে করে শেষে হতাশ হয়ে বাড়ি চলে গেল।

বন্দনার কেমন যেন মনে হ'ল গ্যারির আদ্রিতার প্রতি একটু দুর্বলতা আছে। আহা এই তো বয়স। মেয়েকে কতবার জিজ্ঞেস করেছে, "হ্যাঁরে, কেউ প্রপোজ টপোজ করল? বলিস কিন্তু!" মেয়ে তো রেগে কাঁই!

সেদিনের সেই জলের বন্দুকধারীদের হামলার পর থেকে বন্দনার মনে খুব সাধ জাগল, সে এই বিষয়ের ওপর একটা রীল বানাবে। মানুষ কাঁহাতক আর অমুক বৌদির রান্না করা, তমুক মেয়ের গোগ্রাসে খাওয়া আর ধাঁই ধপাধপ নাচ দেখবে! এটা অভিনব হতে বাধ্য। ব্যাপারটা মোটামুটি ছকে ফেলেই ও সুপ্রভাকে ফোনটা করে ফেলে।

সুপ্রভা বলে, "তুইও শেষে রীল বানাবি? হা ইশ্বর!

- "আরে বাবা, দেখই না। শোন তোকেই ভিডিওটা করতে হবে, আমি ওদের ফলো করব, আর তুই ক্যামেরা হাতে, ভিডিও চালু করে আমাকে ফলো করবি। বুঝলি?"

নিমরাজি হয়ে গেল সুপ্রভা। রোজ স্কুল ছুটি হওয়ার আগে দুই মা কালো জামা, কালো প্যান্ট আর কালো সানগ্লাসেস পরে গাড়ি চালিয়ে স্কুলের পার্কিং-লটে অপেক্ষা করতে লাগল। কে কখন বাইরে আসে, তখন কে কার টার্গেট, কে কাকে মেরে ফেলে এইসব রেকর্ড করবে। ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে পা টিপে টিপে ক্যাম্পাসে অন্যপাশের জিমের দিকে এগোচ্ছে, ওদিকটায় একটু আড়াল আছে। অমনি পেছন থেকে জলদ গম্ভীর গলায়, "এক্সকিউজ মি, ইওর আই ডি প্লীজ!"

ওরা চমকে গিয়ে দেখে ক্যাম্পাস সিকিউরিটি, তার হাতে ওয়াকিটকি। ওয়াকিটকির মারফত ততক্ষণে স্কুলের জন্য বহাল পুলিশ অফিসারের কাছেও পৌঁছে গেছে দুই অনুপ্রবেশকারীর আগমনবার্তা! সে তো রীতিমত বন্দুক তাক করে রয়েছে দুই বন্ধুর দিকে, এ বন্দুকে রয়েছে আসল গুলি। যেভাবে এদেশে স্কুলে ঢুকে কচি নিরপরাধ প্রাণগুলোকে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা হয় তা কিছুটা হলেও আটকানোর জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ ভীষণ কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। কেন যে বন্দনা কালো জামা-প্যান্ট পরতে গেল! ইতিমধ্যে প্রিন্সিপ্যাল এসে গেছেন অকুস্থলে, আর পাঁচ মিনিটেই স্কুল ছুটির ঘন্টা পড়বে। হে ভগবান এবার যদি এসব কথা কন্যাদ্বয়ের কানে পৌঁছায় তো আর রক্ষে থাকবে না! কাঁচুমাচু মুখ করে দুজনেই কালো চশমা খুলে প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকিয়ে করুণ হাসি হাসে। আর উনি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে বলেন, "ওহ মাই গড, লেডিজ, হোয়াট ইজ গোইং অন!"

ওরা দুজনেই আমতা আমতা করে, "নো নো, নাথিং!"

সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, যখন পেছন থেকে আরেক জন মহিলা অভিভাবক পুরো ঘটনাটি ভিডিও করেছেন বলে জানান। উনি পার্কিং-লটে বন্দনাদের পেছনের গাড়িতে বসে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আর তখনই এই বন্দনা আর সুপ্রভাকে চুপিসাড়ে ক্যাম্পাসের দিকে যেতে দেখে সত্যিই ভেবেছিলেন আসলে কোনো হত্যাকারী ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েছে বোধহয়। পুরো ব্যাপারটাই উনি ফেসবুক লাইভ করেছেন, ভাইরাল হতে কে-ই বা না চায়!

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪৩০ (2023)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word-**এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর এক মাস আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

মা
শুভ বিজয়া